দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের দর্শন চর্চা

পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মোহাম্মদ আলমাস আলী খান
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

DIGITIZED

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের দর্শন চর্চা

পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

498722

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

আগস্ট, ২০১৬

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড.আনিসুজ্জামান
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গবেষক

মোহাম্মদ আলমাস আলী খান
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচ.ডি.
নিবন্ধন নং- ১৭৭
শিক্ষাবর্ষ-২০১৫-২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

RB
B
371.10092
KHD
C. 1

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, এ অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব গবেষণার ফসল। এ অভিসন্দর্ভে যে সব গ্রন্থ ও জার্নাল থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে সেগুলো তথ্য নির্দেশিকায় উল্লেখ করেছি। আমি এ সাথে এটাও ঘোষণা করছি যে, এই অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশবিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে পিএইচ.ডি. বা অন্য কোন উচ্চতর ডিগ্রীর জন জমা দেওয়া হয় নি।

তত্ত্বাবধায়ক
ড. আনিসুজ্জামান ২৮/৬/২০২৬
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গবেষক
২৮/০৬/২০২৬
মোহাম্মদ আলমাস আলী খান
পিএইচ.ডি. গবেষক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব মোহাম্মদ আলমাস আলী খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে, আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে **"দেওয়া মোহাম্মদ আজরফের দর্শন চর্চা"** শীর্ষক পিএইচ.ডি. গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করেছেন। এ অভিসন্দর্ভটি তাঁর নিজস্ব গবেষণার ফষল। অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্তের উৎস যথাস্থানে নির্দেশ করা হয়েছে। আমার জানামতে তিনি এ গবেষণার কর্মটি অথবা এর অংশ বিশেষ অন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপন করেন নি। আমি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. প্রাপ্তির জন্য থিসিসটি যথাযথ নিয়মে জমাদানের জন্য অনুমোদন করছি।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

২৮/৮/২০২১

ড. আনিসুজ্জামান
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই সৃষ্টিকর্তার দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি যিনি আমাকে গবেষণা করার কাজটি সমাপ্ত করার তৌফিক দান করেছেন। তারপর গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান স্যারের প্রতি যিনি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আমার অভিসন্দর্ভটি জমা দেয়ার এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। এরপর আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বিভাগীয় শিক্ষক প্রফেসর ড. আব্দুল মতীন, প্রফেসর ড. আমিনুল ইসলাম, মরহুম প্রফেসর ড. আব্দুল জলিল মিয়া, প্রফেসর ড. নীরু কুমার চাকমা, প্রফেসর আয়েশা সুলতানা, প্রফেসর ড. হাসনা বেগম, প্রফেসর ড. রওশন আরা, প্রফেসর হোসনে আরা আলম, প্রফেসর ড. কাজী নুরুল ইসলাম, প্রফেসর ড. গালিব আহসান খান, প্রফেসর ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম, প্রফেসর লতিফা বেগম, প্রফেসর রাশিদা আখতার খানম, প্রফেসর ড. মো: সাজাহান মিয়া, প্রফেসর ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী, প্রফেসর ড. একেএম হারুনার রশীদ, প্রফেসর ড. এম. মতিউর রহমানের প্রতি যাঁদের পায়ের নীচে বসে আমার দর্শনের পাঠ গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিলো। প্রথমে আমি ড. এ. কিউ. ফজলুল ওয়াহিদ স্যারের অধীনে গবেষণার কাজটি শুরু করি। গবেষণার শেষ পর্যায়ে স্যারের মৃত্যুর পর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান। আমি ড. ফজলুল ওয়াহিদ স্যারের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই ও তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. প্রদীপ কুমার রায় এবং বিভাগের সিনিয়র এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার বাবু পানু গোপাল পাল নানাভাবে আমাকে সাহায্য করে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

এর পর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার মায়ের প্রতি যিনি আমার জন্য সব সময় দু'আ করছেন। আমার স্ত্রী মিসেস লাকি আক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই যিনি ছোট ছোট চারটি বাচ্চা নিয়ে অনেক কষ্ট করে আমাকে গবেষণার কাজে সাহায্য করেছেন। তারপর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার তিন কন্যা ও এক ছেলের প্রতি যারা তাদের বাবার স্নেহ থেকে সাময়িকভাবে বঞ্চিত হয়েছে। এরপর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার বড় ভাই মোঃ কামরুল হাসান, শ্বশুর, মামা শ্বশুর, মামী শ্বাশুড়ির প্রতি যাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং পারিবারিক কাজে সাহায্য করেছেন। এরপর আমার কলেজের ঐ সব শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই যাঁরা আমাকে গবেষণার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং বই পুস্তক দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তাছাড়া আমার ঐ সব বন্ধুদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই যাঁরা আমাকে বিভিন্ন সময় উৎসাহ প্রদান করেছেন যেমন, সর্বজনাব শাহ মো: আবদুল্লাহ, গোলাম আবুল হোসেন, খান ইফতেখার আল ফারুকি, আব্দুল জলিল, শহিদুল ইসলাম বুলবুল প্রমুখ। এসাথে আমার কলেজের প্রাক্তন হিসাবরক্ষক মিলন সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই যিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিরত অবস্থায় ব্যস্ততার মাঝেও টেলিফোন করে আমাকে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

এছাড়া আমাকে উৎসাহ প্রদান করেছেন আমার কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী মানবেন্দ্র দত্ত এবং উপাধ্যক্ষ জনাব মো: আনোয়ার হোসেন। এজন্য এ দু'জনের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার ঐ সব ছাত্রদের প্রতি যাদের সহযোগিতা না পেলে আমার গবেষণার থিসিসটি তৈরি করা কঠিন হতো। এদের একজন হচ্ছে জুয়েল মাহমুদ, আরেকজন হচ্ছে তানভীর আহ্মেদ।

হাফেজ আব্দুল কাদের, নবাবগঞ্জ পাইলট গার্লস কলেজের প্রভাষক জনাব মো: আহ্সানউল্লাহ আমাকে নানাভাবে পরামর্শ এবং উৎসাহ দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আমাকে একাজে বহু পূর্বে থেকেই উৎসাহ প্রদান করেছেন আমার চাচা বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব আব্দুস সাত্তার প্রধান ও আমার ছোট বেলার শিক্ষক জনাব মরহুম মোন্তাজ উদ্দিন তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ছোট মেয়ে মিসেস সাদিয়া চৌধুরী পরাগ, ছোট ছেলে জনাব আবু সাইদ জুবেরী, ভাগিনা জনাব ফরহাদ রাজা চৌধুরী এবং মরমী সাধক হাছন রাজার প্রপৌত্র জনাব ইস্কান্দার রাজা চৌধুরী (শুভোখ রাজা) আমার গবেষণার কাজে বই পুস্তক, অনেক তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রতিও আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। নবাবগঞ্জ (ঢাকা)-এর বিশিষ্ট কবি ও বহুমাত্রিক লেখক দেওয়ান শামসুল হক, কাজী মোশারফ (চিনু কাজী) ও মহব্বতপুরের আওলাদ মাষ্টার সাহেবদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এঁদের মধ্যে জনাব চিনু কাজীর একটি কথা আমাকে সব সময় অনুপ্রাণিত করেছে। সে কথাটি হলো: দেওয়ান আজরফকে আগে আপনার ভিতরে আনতে হবে, তা'না হলে আপনার গবেষণার কাজ সম্পন্ন করা কঠিন হবে। এছাড়া নবাবগঞ্জ উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান আমার প্রথম জীবনের ছাত্র জনাব মহসিন রহমান আকবর এবং ছাত্রী মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মিসেস মরিয়ম জালাল শিমু আমাকে নানাভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তাছাড়া কাশিমপুরের সালাউদ্দিন ভাই, ইব্রাহিম ভাই, পনির ভাই, জনাব আজম খান, হাফেজ মো: হাবিবুল্লাহ, রজ্জব আলী মেম্বার, বাজার কমিটির সভাপতি শাহজাহান (চুন্নু) সহ যাঁরাই আমার গবেষণার কথা শুনেছেন তাঁরা সবাই আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। এঁদের সবার প্রতিই আমি কৃতজ্ঞ।

আমি আমার এ গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আরও যাঁদের/যে সব প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি তাঁদের/সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন/হচ্ছে ড. মো: রফিকুল ইসলাম (যিনি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ধর্ম দর্শনের উপর এম.ফিল. করেছেন), রকমারি ডট কম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, জাতীয় গ্রন্থাগার শাহবাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, ঢাকা, হাছন রাজা স্মৃতি জাদুঘর, সুনামগঞ্জ এবং দৈনিক ইনকিলাব, দেনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক নয়াদিগন্ত পত্রিকা। এসব প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকার সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতিও আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

তারিখ: ২৮/৮/২০১৬

মোহাম্মদ আলমাস আলী খান
দর্শন বিভাগ
দোহার-নবাবগঞ্জ কলেজ, নবাবগঞ্জ, ঢাকা-১৩২০।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ক্র.নং		পৃষ্ঠা নং
০১.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ	২
০২.	ঘোষণা পত্র	৩
০৩.	প্রত্যয়নপত্র	৪
০৪.	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৫-৬
০৫.	সূচিপত্র	৭
০৬.	ভূমিকা	৮-১০
০৭.	প্রথম অধ্যায়- দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জীবন, শিক্ষা, পরিবেশ ও প্রাথমিক স্তরের পরিচয়	১১-৩৩
০৮.	দ্বিতীয় অধ্যায়- দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের দর্শন-ভাবনাঃ ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা	৩৪-৬১
০৯.	তৃতীয় অধ্যায়- দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের রাজনৈতিক ভাবনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ	৬২-১১৫
১০.	চতুর্থ অধ্যায়- দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের অর্থনৈতিক চিন্তার ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন	১১৬-১৪১
১১.	পঞ্চম অধ্যায়- দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ধর্মীয় চিন্তাধারাঃ ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন	১৪২-১৮৬
১২.	ষষ্ঠ অধ্যায়- দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের চিন্তাধারার সামগ্রিক বিচার, মূল্যায়ন ও প্রভাব নির্ণয়	১৮৭-২১৫
১৩.	গ্রন্থপঞ্জি	২১৬-২২০

ভূমিকা

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের দর্শন চর্চা গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা করার মাধ্যমে আমার জীবনের একটি মহৎ উদ্দেশ্য পূরণ হতে চলেছে। তাঁর উপর গবেষণা করতে গিয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে; মনে হয়েছে এরকম একজন ব্যক্তিত্বের উপর অনেক আগেই সামগ্রিকভাবে গবেষণা হওয়া উচিত ছিল। আমার জানামতে তাঁর কর্মের উপরে দু'টো আংশিক গবেষণা হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি তাঁর ধর্ম ও দর্শন এবং অপরটি জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে। আমিই প্রথম দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের কর্মজীবনের সামগ্রিক দিক নিয়ে গবেষণা করার চেষ্টা করেছি। তবে এই মহৎ ব্যক্তির সুদীর্ঘ জীবন (১৯০৬-১৯৯৯) নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমাকে অনেক হিমসিম খেতে হয়েছে, কারণ তাঁর জীবন তিনটি আমলে বিভক্ত যথা: ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তানী আমল এবং বাংলাদেশী আমল। তিনি ব্রিটিশ আমল থেকে লেখালেখি শুরু করেছেন। তিনি প্রায় একশত পুস্তক এবং সহস্রাধিক প্রবন্ধ, ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, রম্য সাহিত্য ইত্যাদি রচনা করেছেন। তাঁর অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ যেগুলো ব্রিটিশ আমল ও পাকিস্তানী আমলে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এসব ক্ষেত্রে তাঁকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁর যাঁরা ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর সেই সব পুস্তক ও প্রবন্ধগুলো যাঁরা পড়েছেন তাদের লেখালেখি থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

মোহাম্মদ আজরফের দীর্ঘ সংগ্রামী জীবন ও কর্মতৎপরতা ছিল বৈচিত্র্যময়। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, কর্মক্ষমতা, ব্যক্তিত্ববোধ, বুদ্ধিজাত মণীষা, সহজ-সরল, আড়ম্বরহীন, নিরহংকার ও লোভ-লালসাহীন জীবন-যাপন পদ্ধতি প্রভৃতির মাধ্যেমে খ্যাতি অর্জন করে তিনি জাতীয় অধ্যাপকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। উপরে উল্লেখ করেছি যে, বিভিন্ন গল্প উপন্যাস, রম্য রচনা ছাড়াও দর্শন, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর পদচারণা ছিল। এককথায় জ্ঞান জগতের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ ছিল। মানবতাবাদী, সাম্যবাদী জীবন সাধনা, সুন্দর ও কল্যাণময় সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলস চেষ্টা এবং দুনিয়ার দু:খ-দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের সমস্যা সমাধান করে সমাজে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করার অদম্য বাসনা তাঁকে জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও পরিচিতি এনে দিয়েছে। মানবতাবাদী দার্শনিক হিসেবে তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জীবন শুধুমাত্র জ্ঞান চর্চা ও লেখালেখির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য তিনি সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছেন এবং জেল খেটেছেন। জমিদারের ঘরে জন্মগ্রহণ করার পরও নানকারদের পক্ষাবলম্বন করে তিনি প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলন করেছেন। তিনি সিলেট অঞ্চলে ভাষা আন্দোলনকে সংঘটিত ও নেতৃত্ব দিতে গিয়ে চাকুরিচ্যুত হয়েছেন। সাপ্তাহিক 'নও বেলাল' এর সম্পাদক হিসেবে তিনি ভাষা আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করেছেন। তিনি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম আদি সংগঠন 'পাকিস্তান তমুদ্দন মজলিস' এর আজীবন সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ দর্শন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সভা সেমিনারে যোগদানের মাধ্যমে জগৎবাসীর সামনে বাংলাদেশ দর্শনকে তুলে ধরেছেন। সর্বোপরি, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও তাঁর আদর্শ, বিশ্বাস ও জীবনের মূল্যবোধ থেকে কখনও পিছপা হননি। তিনি মার্কসীয় দর্শন, ধনতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সমষ্টিবাদ, টলস্টয়েরমতবাদ, গান্ধীবাদ, নাস্তিক্যবাদ ও সেক্যুলারিজম তথা প্রাশ্চ্য ও পাশ্চাত্যের সব মতবাদের উদ্ভব ও ইতিহাস ঐতিহ্য পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ করে সর্বশেষে চূড়ান্ত মতবাদরূপে মানবতার শ্রেষ্ঠ সনদ হিসেবে ইসলামি সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর বাস্তব জীবনে ইসলামকে চর্চা করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, পরিপূর্ণভাবে ইসলামি জীবন যাপন করেও দর্শন চর্চা করা সম্ভব। আমি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের সামগ্রিক জীবন দর্শনকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি অধ্যায়গুলো হলো: প্রথম অধ্যায়: দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জীবন, শিক্ষা, পরিবেশ ও চিন্তাধারার প্রাথমিক স্তরের পরিচয়। দ্বিতীয় অধ্যায়: দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের দর্শন-ভাবনা: ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা। তৃতীয় অধ্যায়: দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের রাজনৈতিক ভাবনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। চতুর্থ অধ্যায়: দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের অর্থনৈতিক চিন্তার ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। পঞ্চম অধ্যায়:

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ধর্মীয় চিন্তাধারার ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের চিন্তাধারার সামগ্রিক বিচার মূল্যায়ন ও প্রভাব নির্ণয়।

উপরের ছয়টি অধ্যায়ে আমি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জীবন দর্শনের সামগ্রিক দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তিনি একাধারে গণতন্ত্রমনা, মানবতাবাদী ও সাম্যবাদী দার্শনিক। তাঁর সারা জীবন মানব কল্যাণে ব্যয় করেছেন। এর প্রমাণস্বরূপ আমি নিজে তাঁর গ্রামের বাড়ি দোহালিয়া, সুনামগঞ্জ এ গিয়ে নিজ চোখে দেখেছি তাঁর নিজস্ব জমিদারীভুক্ত জায়গাগুলোতে তিনি নিজ খরচে নানকারদের ঘর-বাড়ি তুলে দিয়েছেন এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য এক অথবা দুই কোয়া (এক কোয়া এক বিঘা পরিমাণ) করে জমি দান করেছেন। জীবন সায়াহ্নে তাঁর নিজস্ব কোনো সম্পত্তি ছিলনা- তিনি সবই মানুষকে বিলিয়ে দিয়ে সারাজীবন তথা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভাড়াটিয়া বাসায় থেকেছেন। তিনি নিজস্ব জমির উপর দুটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। একটি বর্তমানে দোহালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং অপরটি জুনিয়র হাই স্কুল। তাছাড়া ঢাকা শহরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আবু জর গিফারী কলেজ এখনও তাঁর স্মৃতি বহন করে চলছে। তাঁর রচনাবলি থেকে একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের আপাময় জনতার আকীদা বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও বিবেক বুদ্ধির জীবন্ত দৃষ্টান্ত শতাব্দীর সাক্ষী এই মনীষীর অবদান বাঙালি জাতির জন্য এক অমূল্য সম্পদ। আমাদের জাতীয় সমস্যা এবং বিশ্ব সংকটসমূহ নিরসনে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মনীষা যে দিশারীস্বরূপ সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। জাতি-ধর্ম-দল-মত নির্বিশেষে আবাল বৃদ্ধ বনিতার প্রিয় মানুষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের চিন্তা চেতনা ও জীবন দর্শন রুচিশীল জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশে যে অত্যন্ত সৃজনশীল অবদান রাখতে সক্ষম সেকথা জোর দিয়েই বলা যায়। তাই তাঁর প্রায় শতবর্ষের সৃজনশীল প্রতিভার সাক্ষর তাঁর সমস্ত লেখাগুলো প্রকাশিত হলে বাঙালি জাতি উপকৃত ও দিক নির্দেশনা পাবে বলে আমার বিশ্বাস। পরিশেষে, বাস্তবধর্মী মহামনীষীর আদর্শ আমরা যেন জীবন চলার পথে অনুসরণ করতে পারি সেই আশা ব্যক্ত করে শেষ করছি।

মোহাম্মদ আলমাস আলী খান

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জীবন, শিক্ষা, পরিবেশ ও চিন্তাধারার প্রাথমিক স্তরের পরিচয়

বাংলাদেশের মনীষীদের মধ্যে যে'কজন আপন ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যে স্বজাতির হৃদয়ে আসন দখল করে আছেন জাতীয় অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন শতাব্দীর সাক্ষী এবং বহু প্রতিভার অধিকারী।

জন্ম: তিনি ১৯০৬ সনের ২৫শে অক্টোবর, বাংলা ১৩১৩, ৯ই কার্তিক রোজ শুক্রবার সুনামগঞ্জ শহরের অন্তর্গত লক্ষণছড়ি মৌজায় তেঘরিয়া গ্রামস্থ মাতামহ মরমী কবি হাছন রাজার (১৮৫৪-১৯২২) বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা দোহালিয়ার জমিদার মুসলিম জাতীয়বাদী নেতা দেওয়ান মোহাম্মদ আসফ চৌধুরী। মাতা রওশন হুসন বানু। তিনি ১লা নভেম্বর ১৯৯৯, ১৭ই কার্তিক ১৪০৬ বঙ্গাব্দ। সোমবার দিবাগত রাত (১১টা ৩০ মিনিট) জাতীয় হৃদরোগ ইনিস্টিটিউট (সোহরাওয়ার্দী হাসপাল), ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

শিক্ষাজীবন: দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ যে পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন, সেটি অনেক পূর্ব থেকেই শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়ে সচেতন ছিলেন। তাঁর পিতাও ছিলেন একজন সুশিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তি। তাই জমিদার পরিবারে জন্ম গ্রহন করলেও তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। প্রথমে পারিবারিক পরিবেশেই তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। ১৯১২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে নিজেদের পরিচালিত গ্রামের স্কুলে ভর্তি করা হয়। পরে তিনি সুনামগঞ্জ জুবিলি হাই স্কুলে ভর্তি হন এবং এখান থেকেই ১৯২৫ সালে ফার্সি বিষয়ে লেটার মার্কসসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অত্যন্ত সুনামের সাথে স্কুলের গন্ডিপেরিয়ে তিনি ১৯২৫ সালে সিলেট এম.সি (মুরারী চাঁদ) কলেজে ভর্তি হন এবং উচ্চ মধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগ প্রাপ্ত হয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৩০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিস্টিংশনসহ বি.এ এবং ১৯৩২ সালে দর্শন বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে এম.এ পাশ করেন। ছাত্র হিসেবে দেওয়ান আজরফ অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তাঁর স্মরণশক্তিও ছিল অত্যন্ত প্রখর। তাঁর পড়াশোনা বিশেষ বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

ছাত্র জীবন এবং শিক্ষা জীবন শেষে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বিভিন্ন প্রকার দর্শন ছাড়াও বিশ্বসাহিত্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব ও বিভিন্ন চিন্তাবিদদের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেছেন। ফলে তাঁর জ্ঞান ভান্ডার বেশ সমৃদ্ধ ছিল। আর এ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তিনি প্রচুর লিখেছেন। প্রায় এক শতক গ্রন্থ ও কয়েক সহস্র প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন এবং এগুলোকে বাস্তব জীবনে কাজে লাগিয়ে তিনি সফলতার শীর্ষে আরোহণ করতে পেরেছিলেন।

শিক্ষা জীবন শেষ করে কর্মজীবনে যাওয়ার পরও পড়াশোনার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। তার প্রমাণ আমরা পাই তাঁর বড় ভাই মৃত্যুর পর জমিদারী দেখাশুনা করার জন্য কলেজের চাকরি বাদ দিয়ে যখন বাড়িতে আসলেন, তখনও তিনি তাঁর জ্ঞানার্জনের স্পৃহাকে জাগ্রত রাখলেন। দেওয়ান আজরফের নিজের ভাষায়ঃ

> বাড়িতে এসে স্থায়ীভাবে বসার আগে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদের প্রতিষ্ঠা করেছিলুম। সে সংসদের লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা হলে তা থেকেই প্রত্যেক মাসেই আমি অনেকগুলো বই এনে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পড়তুম- আল্ ইসলাহ সম্পাদক মৌলবী নুরুল হক সংসদের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত থেকে আল ইস্লাহকে সংসদের মুখপত্র বলে ঘোষণা করেন। বাড়িতে থাকার সময়ও আমি রীতিমত আল ইসলাহে প্রবন্ধ ও গল্প লিখতুম। কাজেই চাকরি ছাড়ার ফলে সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে আমার যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি। [১]

[১] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, **অতীত জীবনের স্মৃতি**, ঢাকা: নওরোজ কিতাব স্থান, ১৯৯৭, পৃ. ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান আজরফের জ্ঞান সাধনার প্রতি এতই আকর্ষণ ছিল যে, আসামের শিলচর জেলে থাকা অবস্থায়ও তিনি একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে পড়াশোনা করে কাটিয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন:

> জেলে বসে দিন গুণি আর পত্রিকা পড়ি। পেইন সাহেবের দেওয়া গাদা গাদা বই ও গোগ্রাসে গিলি, আল্‌ডুস্‌ হাকসলির 'Those Barren Leaves', মেরি স্টোপসের 'The Enduring Passion', রোমা রোলার 'The Summer Series', তা ছাড়া অন্নদা শংকর রায়ের 'যার যেথা দেশ' বা বাদল সুধী উজ্জয়িনী সিরিজ একেবারে বেমালুম হজম করেও আশা মিটে না। আরও মানসিক খাদ্য চাই। একদিন জেলের লাইব্রেরীতে আবিষ্কার করলুম এক চমৎকার রসায়ন। বনফুলের জ্যামিতিক গল্প। ক,খ গ'য়ের গল্পটি লাগলো চমৎকার। [২]

ছাত্র জীবন থেকেই দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প ও প্রবন্ধ লিখতেন এবং সেগুলোর জন্য অনেক উচ্চ মহলে প্রশংসিতও হয়েছেন। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের নিজের ভাষায়:

> ১৯৩২ সালে কার্জন হলে বিশেষ শান-শওকতের সঙ্গে সাহিত্য সমাজের অধিবেশন হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা দারোগা বাড়ির সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মরহুম সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী। এতে আমি 'ধর্ম ও নৈতিকতা' শীর্ষক একটা প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম। কবি মোহিত লাল মজুমদার ও মরহুম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আতিকুর রহমান সাহেব উচ্ছসিত প্রশংসা করেছিলেন প্রবন্ধটির। শেষে আমাদের বন্ধু নাজিরুল ইসলাম (মিঞা মোহাম্মদ সুফিয়ান) সম্পাদিত 'ছায়া বিথীতে' কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। [৩]

দেওয়ান আজরফের লেখালেখির দক্ষতা সম্পর্কে অধ্যাপক শাহেদ আলী বলেন:

> একটি ছোট কোঠায় তাঁর বই পুস্তক, পত্র-পত্রিকা পরিবৃত হয়ে বাস করেন। তাঁর বিছানার উপরে ছড়ানো থাকে তাঁর বই পুস্তক। কেউ কোন লেখার জন্য অনুরোধ করলে তিনি অপেক্ষা করেন না। বসে হাঁটুর উপর কাগজ রেখে একটানে ঘস ঘস করে লিখতে শুরু করেন। আমি একদিন তাকে বললাম, আমি অনেক গল্প লিখেছি। আপনাকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে বাকি আছে। গল্পের নাম দেব ঊর্ণনাভ। তিনি মিটি মিটি হাসলেন। আমি বললাম ঊর্ণনাভ মানে মাকড়সা। তার নাভী থেকে

---

[২] প্রাগুক্ত,পৃ. ১৩৭
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

সুতো বের হয়। আপনাকে কেউ লেখার জন্য অনুরোধ করলে আপনার চিন্তা করতে হয় না। উর্ণনাভের সুতোর মতই আপনার লেখা বের হতে থাকে। [৪]

ভাষা জ্ঞান: দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ভাষা জ্ঞান ছিল বেশ সমৃদ্ধ। তিনি বাংলা, ইংরেজি, আরবি ও উর্দু ভাষায় লিখতে, পড়তে ও বলতে পারতেন। হিন্দি এবং ফরাসি ও সংস্কৃতি ভাষায় শুধুমাত্র লিখতে পারতেন ।

গবেষণা: দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল ডক্টরেট ডিগ্রী নিবেন। কিন্তু তাঁর কর্মবহুল জীবনে ব্যস্ততার জন্য সুযোগ হয়ে উঠে নি। অবশেষে নরসিংদী কলেজে থাকাকালীন (১৯৫৭ ইং) মোহাম্মদ আজরফ গবেষণামূলক কর্মে মনোযোগ দেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবের তত্ত্বাবধানে 'Access to Reality'শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনায় নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বকে গবেষণা পরিসমাপ্তি করে ডিগ্রি অর্জন করতে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালো রাত্রিতে ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব নিহত হওয়ায় এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের কাজ অসমাপ্ত থাকে। পরে এটি সমাপ্ত করলেও একাডেমিক ডিগ্রির জন্য কোথাও উপস্থাপন করেন নি ।

কর্মজীবন: দেওয়ান আজফের জীবন ছিল কর্মবহুল। কেবল তাত্ত্বিক পড়াশোনার মধ্যেই তিনি তাঁর সব মেধা ও কর্মক্ষমতাকে নিঃশেষিত করেন নি। পড়াশোনা ও লেখালেখির পাশাপাশি বিভিন্ন জনহিতকর কর্ম , সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ও সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দাবী- দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৯৩৭ সালে তিনি সিলেটের গোলাপগঞ্জে অবস্থিত মোহাম্মদ চৌধুরী একাডেমীতে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি সিলেট মুরারী

---

[৪] শাহেদ আলী- 'সর্বজন প্রিয় সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ' দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সম্বর্ধনা গ্রন্থ, ঢাকা: দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সম্বর্ধনা কমিটি, ১৯৯৭, পৃ. ৩-৪

চাঁদ (এম.সি) কলেজে সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালের ২০ নভেম্বর তিনি সুনামগঞ্জ কলেজে যোগদান করেন। উক্ত কলেজে তিনি অধ্যাপক, উপাধ্যক্ষ এবং সবশেষে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এ কলেজটি পরে একটি প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী কলেজ হিসেবে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। ১৯৫৭ সালে তিনি নরসিংদী কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় কলেজটি একটি উন্নতমানের কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৬৫ সালে তিনি মতলব কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। দুই বৎসর সুনামের সাথে কলেজটি পরিচালনার পর ১৯৬৭ সালে তিনি রাসূলে করিমের অন্যতম সাহাবী হযরত আবুজর গিফারীর নামানুসারে ঢাকায় 'আবুজর গিফারী কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে আবুজর গিফারী কলেজটি একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ হিসেবে গড়ে তোলেন। মানুষের কর্মদক্ষতা বা প্রকৃত যোগ্যতা তাকে সঠিক স্থানে নিয়ে যায়। দেওয়ান আজরফের জীবনেও সে রকমটি ঘটে। ১৯৭১ সালে পাক-বাহিনী ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবকে নির্মমভাবে হত্যা করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে সাময়িক ভাবে শিক্ষক সংকট দেখা দেয়। তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেওয়ান আজরফের একাডেমিক যোগ্যতা এবং জ্ঞানের পরিধি বিচার বিশ্লেষণ করে, তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দানের জন্য মনস্থ করলে; কেউ কেউ স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সম্পর্কে বলেন:

> আমি তাঁর সাথে 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন করেছি, আসামে গণভোটের সময় কাজ করেছি, ভাষা আন্দোলনের সময় কাজ করেছি। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এবং মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে সংঘঠিত বহু ঘটনার সাক্ষী আমি নিজেই। কাজেই আমি তাঁর লেখাপড়া , জীবন-যাপন, রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা এবং দার্শনিক প্রজ্ঞা সম্পর্কে যা জানি তোমরা তা জান না। অতএব তাঁকে নিয়োগ দিয়ে দাও। তিনি ড. গোবিন্দ দেবের অভাব পূর্ণ করতে পারবেন'। [৫]

[৫] দেওয়ান শামসুল হক, (জন্ম:১৯৪০-   ) লেখক, গবেষক ও সংগঠক, গবেষকের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে একথা বলেন।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে উল্লেখ্য যে দেওয়ান আজরফ ড. দেবের তত্ত্বাবধানে তাঁর পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ 'Access to Reality' তৈরী করে ছিলেন। ড. গোবিন্দদেব এবং দেওয়ান আজরফ একই অঞ্চল (সিলেট)এর মানুষ ছিলেন। দেওয়ান আজরফ ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি আর দশজন সাধারণ অধ্যাপকদের মতো কেবল দার্শনিকদের বুলি আওড়ানো পছন্দ করতেন না। তিনি বিভিন্ন দার্শনিকদের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করে সে সব চিন্তার ভুল- ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা তুলে ধরতেন এবং সেগুলোকে সামগ্রিক জীবন-দর্শনের আলোকে (বিশেষ করে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে) ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ যোগ্যতা যাচাই করে পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাঁকে সে বিভাগে খন্ডকালিন অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দান করেন। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রেই অবদান ছিল না বরং তাঁর জীবন ছিল বহুমুখী কর্মসাধনায় ভরপুর।

দেওয়ান আজরফের কর্মজীবন সর্ম্পকে বাংলাদেশ দর্শন সমিতির সাবেক সভাপতি প্রয়াত অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান বলেন:

> আমার বিশ্বাস-জীবনের সফলতা বিচার হবে তারই নিরিখে যে কে কতটা অবদান রেখেছে মানুষের কলাণে, সেবায়। আমাদের সমাজে মানুষের মধ্যে জ্ঞানের, পরোপকারের মানষিকতা বিরল দেখা যায়। আমাদের কোন ত্যাগ নাই বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা কেবল কল্যাণের কথা বলি, কিন্তু বাস্তবে কোন কাজ করি না। কবির কথায় বলতে হয়-
>
> 'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে।
> সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।'
>
> বর্তমান সমাজের স্বার্থপরতা দেখে বেদনা জাগে। আমরা খুব কম সংখ্যক লোকই অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে চেষ্টা করি। এক্ষেত্রে দেওয়ান আজরফ কথা ও কাজে অনুসরণ যোগ্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। [৬]

---

[৬] সাইদুর রহমান, 'দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফঃ কিছু কথা', **প্রাগুক্ত,** সম্বর্ধনা গ্রন্থ, পৃ. ৬

অধ্যাপক সাইদুর রহমানের কথার প্রমাণ আমরা পাই দেওয়ান আজরফের ব্যক্তিগত কর্ম-কাণ্ড বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তিনি প্রথম জীবনে তাঁদের পারিবারিক যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছিলেন সেটার নাম ছিল টোল। সেখানে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করানো হতো। হিন্দু-মুসলমান উভয় জমিদাদেরই টার্গেট ছিল তাদের সন্তানেরাই কেবল উচ্চশিক্ষা অর্জন করবে। সাধারণ মানুষ অর্থাৎ প্রজাদের সন্তান- সন্ততি যদি বেশি শিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে তাদের চোখ-কান খুলে যাবে, তারা জমিদারদের মানবে না। তাই অন্যদের ছোট করে রাখার জন্য তারা (জমিদারেরা) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন নি বরং তুলতে গেলে বাধাঁর সৃষ্টি করতেন। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাদের সেই বাঁধাবিপত্তিকে উপেক্ষা করে সেই টোলকে দোহালিয়া মাইনর স্কুলে পরিণত করেন (বর্তমানে দোহালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়)। এ কারণে দেওয়ান আজরফ প্রথমে জমিদারদের বাঁধার সন্মুখীন হলেন এবং জমিদারেরা তাঁর সাথে পেরে না উঠায় তাঁর সাথে হিংসাত্মক আচরণ শুরু করেন।এ ছাড়া তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পরামর্শে বড় ছেলে নুরুজ্জামান তাঁর নিজস্ব জমির উপর 'দোহালিয়া প্রগতি বিদ্যালয়' নামে আর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি বেশ কয়েক বিঘা জমি উক্ত স্কুলের নামে লিখে দেন।

> দেওয়ান আজরফ জমিদার থাকা কালীন নিজের টাকা-পয়সা খরচ করে প্রায় এক হাজার নানকারদের নিজের জমিতে ঘর তুলে দিয়েছেন এবং যারা অসচ্ছল তাদের চাষাবাদ করার জন্য এক কোয়া (এক বিঘার মত) করে জমিও দান করেছেন । এর প্রমাণ তাঁর নিজস্ব জমির উপর এখনও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও নানকারদের ঘর-বাড়ি রয়েছে। তাঁর নিজের এক ছেলে ডাক্তার হিসেবে অত্র অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের চিকিৎসা-সেবা করতেন। তিনি কিছুদিন পূর্বে (২০১৫ইং) ইন্তেকাল করেছেন। যে পারতো তার নিকট থেকে টাকা নিতেন ,আর যে না পারতো তাকে তিনি পয়সা ছাড়াই ঔষধ দিতেন। ফলশ্রুতিতে, যেখানে জমিদারী ধ্বংস হবার পর অনেক জমিদারকে তাদের প্রজারা অত্যাচার ও অসন্মান করে, সেখানে দেওয়ান আজরফ এবং তাঁর সন্তানদের উপরি উক্ত গুণাবলীর কারণে তাদের কেউ অসম্মান করে না বরং এখনও দেওয়ান

Dhaka University Institutional Repository

আজরফের সন্তানেরা দেশ- বিদেশ থেকে দোহালিয়া গ্রামে গেলে আপামর জনসাধারণ দেওয়ান বাড়ির লোক হিসেবে তাদের অনেক সম্মান করে। [৭]

সাংগঠনিক কার্যাবলি: দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ পড়াশোনা ও লেখালেখির পাশাপাশি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের কর্ম সম্পাদনের দক্ষতার সৃষ্টি হয়েছে। তাই বিভিন্ন সংগঠন তাঁকে তাদের সদস্য হিসেবে নির্বাচন করেছে; যেমন, তিনি সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন, তেমনি তিনি ঢাকা ওয়ার্ম হার্ট এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৮১-১৯৯০ এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক ১৯৯০-আমৃত্যু), আবুজর গিফারী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও কলেজের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডের অন্যতম সহযোগী সদস্য, সুনামগঞ্জ কলেজে বিভিন্নমুখী শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কার্যে অংশগ্রহণ। নরসিংদী কলেজে স্নাতক কোর্স এবং বিজ্ঞান শিক্ষা কোর্স প্রবর্তনের একনিষ্ঠ অনুরাগী ও সহযোগী সদস্য, তমদ্দুন মজলিস, ইকবাল সংসদ, ঢাকা-এর প্রাক্তন সভাপতি ও সম্মানিত সদস্য, কায়কোবাদ সাহিত্য মজলিসের অন্যতম উপদেষ্টা, বাংলাদেশ দর্শন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, পৃষ্ঠপোষক, একনিষ্ট ও নিবেদিত সংগঠক এবং উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, পূর্ণিমা বাসরের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, নজরুল একাডেমী কার্যকরী সংসদের সম্মানিত সদস্য, বাংলাদেশ সংস্কৃতি পরিষদ, ঢাকা-এর অন্যতম সদস্য ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রধান উপদেষ্টা, পাকিস্তান ফিলোসফিক্যাল কংগ্রেস-এর সদস্য, পাকিস্তান লিটারেরি সোসাইটি-এর সদস্য ও সম্পাদক, বাংলা একাডেমীর ফেলো, নজরুল ইনস্টিটিউটের জীবন সদস্য, নজরুল একাডেমীর সভাপতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য, জালালাবাদ এসোসিয়েশন (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৪৮)-এর জীবন সদস্য, সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৩৬), আবুজর গিফারী সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সভাপতি।

[৭] এ তথ্যটি আমি (গবেষক) সুনামগঞ্জ গিয়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ছোট ছেলে, আবু সাইদ জুবেরী ও হাছন রাজার প্রৌপুত্র, ইস্কান্দার রাজা চৌধুরীর নিকট থেকে সংগ্রহ করেছি।

গ্রন্থ (প্রকাশিত): দীর্ঘ জীবনে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ প্রায় এক শ' গ্রন্থ ও কয়েক হাজার প্রবন্ধ লিখেছেন। দর্শনের বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও তিনি ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস, কবিতা, রম্যরচনা, ভ্রমনকাহিনী, ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়াবলি নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ, জীবনী গ্রন্থ প্রভৃতি রচনা করেছেন। নিম্নে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর নাম দেওয়া হলো ঃ

তমুদ্দনের বিকাশ, তমদ্দুন মজলিস, সিলেট, প্রকাশকাল: ১৯৪৯; **সত্যের সৈনিক আবুজর গিফারী,** তমদ্দুন মজলিস, ঢাকা, প্রকাশকাল: ১৯৫১; **ইতিহাসের ধারা,** পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, ঢাকা, প্রকাশকাল: ১৯৫২; **মরমী কবি হাসন রাজা,** ঢাকা, মঞ্জিল প্রকাশনী, প্রকাশকাল: ১৩৬৬ (১ম সংস্করণ); **জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম,** ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ১৯৫৯, ২য় মুদ্রণ: জুন ১৯৭০ ইসলামিক একাডেমী; **নতুন সূর্য** (গল্পগ্রন্থ), ঢাকা, পূর্বাচল প্রকাশনী, নিউ মার্কেট, প্রকাশকাল: ১৯৫৯; বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:, ঢাকা, প্রকাশকাল: দ্বিতীয় সংস্করণ: আগষ্ট ১৯৯৬; **ব্যক্তিত্বের বিকাশ** (অনুবাদ), প্রকাশনা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৫, দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৯৬৯; **মুক্তির ডাক** (সম্পাদিত গ্রন্থ), প্রকাশনায়: পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪/সফর ১৩৮৭; **ইতিহাসে উপেক্ষিত একটি চরিত্র** (যুগ্মভাবে),দেওয়ান আজরফ ও এ.জেড.এম সামসুল আলম, প্রকাশনায়: আবুজর গিফারী সোসাইটি, ঢাকা, প্রকাশকাল: ১৩৭৫; **আমাদের আজাদী আন্দোলনের তিন অধ্যায়,** জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢাকা, প্রকাশকাল, ১৯৭১; দর্শন (সম্পাদনা), ঢাকা, প্রথম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা, প্রকাশকাল: মাঘ ১৩৭৯/ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি। **দর্শনের নানা প্রসঙ্গ,** ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৭৭, মুক্তধারা; **ইসলাম : মনীষার আলোকে** (সম্পাদিত গ্রন্থ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৮; **সন্ধানী দৃষ্টিতে ইসলাম,** প্রকাশকাল: জানুয়ারি ১৯৮০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা; **ইসলামি আন্দোলন যুগে যুগে,** প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৮০, বৈশাখ ১৩৮৭/জমাদিউল আউয়াল ১৪০০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা; **ইসলাম ও মানবতাবাদ,** প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ১৯৮০; দ্বিতীয় প্রকাশ: জুন ১৯৯৫/আষাঢ় ১৪০২/

জিলহজ্জ ১৪১৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা; **জীবন দর্শনের পুনর্গঠন**, প্রথম সংস্করণ: আগস্ট ১৯৮০/ ভাদ্র ১৩৮৭/শাওয়াল ১৪০০, ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম; **লিও টলস্টয়,** ঢাকা, মুক্তধারা প্রকাশনী; টলস্টয়ের ধর্ম, ঢাকা, মুক্তধারা প্রকাশনী; **ধর্ম ও দর্শন**, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী; বিজ্ঞান ও দর্শন (১ম খন্ড) ১৯৮৪, (২য় খন্ড) ১৯৮৫, ঢাকা; 'বিজ্ঞান, দর্শন' (বক্তৃতা ১৯৮৫), দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; **অতীত জীবনের স্মৃতি,** ঢাকা, প্রকাশনা : নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ১৯৮৭; হাসন রাজা (জীবনীমূলক গ্রন্থ), ঢাকা, প্রকাশকাল : ১৯৯০, বাংলা একাডেমী; **সিলেটে ইসলাম,** ঢাকা, প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৪০২/মে ১৯৯৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; নয়া জিন্দেগী (উপন্যাস) ১ম ও ২য় খন্ড, প্রকাশক , বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ১৯৮৭, ভাদ্র ১৩৯৪; **আমাদের জাতীয়তাবাদ,** ঢাকা, প্রকাশনা : জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা ১৯৮৬; হযরত **আবুজর গিফারী (রঃ),** ঢাকা, প্রকাশনা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; শেষ প্রতিরোধ (নাটক), ঢাকা, ১৯৮০; **ভাববাদ যুগে যুগে**, ঢাকা, প্রকাশক : তাসলিমা আক্তার, হিমি বুকস এন্ড বুকস, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৪; **জীবন নদীর শেষ বাঁকে**, ঢাকা, প্রকাশনা, উৎস প্রকাশন, ১২৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা), শাহবাগ, প্রথম প্রকাশ , ২০০৫; **নির্বাচিত প্রবন্ধ,** প্রকাশক , আবু তাহের, গাউছিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ৪৫/খ/২ রজনী চৌধুরী রোড, গেন্ডরিয়া ঢাকা-১২০৪, প্রকাশকাল , সেপ্টেম্বর ২০০৪; **কবির দর্শন**, ঢাকা, প্রকাশক, জিনিয়াস পাবলিকেশন্স, ৩৮ বাংলাবাজার, ১১০০, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৯; **ব্যক্তিত্বের বিকাশ,** প্রকাশ, ঝিনুক প্রকাশনী ৩৮/২ক, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ,২০০৯; **পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস,** ঢাকা প্রকাশকাল: ১৯৫২; প্রথম প্রকাশ, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢাকা; পরবর্তী প্রকাশনা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা; **Science and Revelation,** Islamic Cultural Centre, 1980, Dhaka; **Philosophy of History,** Islamic Cultural Centre, Islamic Foundation Bangladesh,

Dhaka University Institutional Repository

1981, Dhaka; **Hazrat Abu Darr Ghifari (R.),** Islamic Foundation Bangladesh, 1982, Dhaka; **Marami Kabi Hasan Raja,** Dhaka, published by Mrs. Nur Jahan Islam, Manzil Prakashani, 6 Navadiva Prosad Lane; **The Background of The Culture of Muslim Bengal,** Dhaka, Islamic Movement, Lalon Shah & Darshan, etc.

বিদেশ সফর: দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন দার্শনিক ও ইসলামি চিন্তাবিদ। ফলে তাঁকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে দর্শন ও ইসলামকে উপস্থাপন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান দর্শন সমিতির প্রতিনিধি হয়ে নিখিল ভারত দর্শন সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত মাদ্রাজের আন্না মালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধিবেশনে যোগ দিয়ে Philosophy of History বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ করেন এবং Process of Revolution বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন । তিনি ১৯৬১ সালে পাকিস্তান দর্শন সমিতির প্রতিনিধি হয়ে দিল্লীতে পাক-ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগ দেন এবং সেখানে Education of Morality বিষয়ে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ১৯৬২ সালে ইরাক সরকারের আমন্ত্রণে তিনি বাগদাদ নগরীর সহস্রতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এবং দার্শনিক আলকিন্দির জন্ম সহস্র বার্ষিকীতে যোগ দেন। আলকিন্দির জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে তিনি আলকিন্দির উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯৮১ সালে ভারত সরকার আমন্ত্রণে তিনি শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রব্বানী' দর্শনের উপর একটি বক্তৃতা করেন। তিনি ১৯৮৪ সালে সিউলে একটি ধর্ম সম্মেলনে Faith and Reason বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯৮৫ সালে রোমের ধর্ম সম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি Holiness in Islam শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯৮৬ সালে ইরান সরকারের আমন্ত্রণে তিনি ইরানের বিপ্লব বার্ষিকীতে যোগ দান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক জীবন: ভারত বিভক্তির পূর্বে অর্থাৎ ইংরেজ আমলে ইংরেজরা বিভিন্নভাবে ভারতবর্ষের মানুষদের উপর অত্যাচার করতো; হিন্দু প্রধান অঞ্চলে মুসলমান জমিদার এবং মুসলমান প্রধান অঞ্চলে হিন্দু জমিদারদের দিয়ে তারা শাসনকার্য পরিচালনা করতো। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান হিন্দুদের দ্বারা এবং হিন্দু মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত হতো। তাছাড়া ইংরেজরা উভয় জাতির মানুষদের অত্যাচার করতো।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তরুণ বয়স থেকেই ছিলেন খুবই সাহসী, মানুষ মুখী ও অনুভূতি প্রবণ। ইংরেজদের এই সব উৎপীড়ন, অনাচার ও অত্যাচার তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতেন। তাই তিনি শুধু শিক্ষকতার মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারলেন না। তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। ভারত বিভক্তির পূর্বকালে তিনি বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন ও কারাবন্দী হয়েছেন। তিনি প্রজাদের খুব কাছে থেকে দেখায় চেষ্টা করেছেন; তাদের দু:খ দুর্দশা ঘোচানোর জন্য জমিদার পরিবারের সদস্য হয়েও তিনি ১৯৪৮ সালে নানকারদের পক্ষালম্বন করে আন্দোলনকে সংগঠিত করেছেন এবং সর্বদা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। পঞ্চাশের দশকে তিনি সিলেটে ভাষা আন্দোলনকে (১৯৫২) সংগঠিত করেছেন এবং জোরালো নেতৃত্ব দিয়েছেন।

মানব জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। ভাষার মাধ্যমে মানব মনন প্রকাশিত হয়; সমাজ ও সভ্যতা বিকশিত হয় এবং টিকে থাকে। এ কথা হৃদয়ে অনুধাবন করে তিনি ভাষা আন্দোলনে শরীক হন। সাপ্তাহিক 'নও বেলাল' এর প্রধান সম্পাদক রূপে তিনি ভাষা আন্দোলনের পক্ষে ব্যাপক জনমত গঠন করেন। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠন পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও সংগঠনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রেখেছেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বদেশী আন্দোলন তথা স্বাধীনতা সংগ্রামেও (১৯৭১) সালে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর চতুর্থ পুত্র দেওয়ান আসাদুজ্জামান

Dhaka University Institutional Repository

(যিনি সুনামগঞ্জের সীমান্ত অঞ্চল বালাঘাট এলাকায় যোদ্ধাদের সংগঠিত করেছেন ও যুদ্ধ করেছেন) এবং কনিষ্ঠ পুত্র দেওয়ান আবু সাইদ জুবেরী (যিনি কৈলাশ্বর ও প্রীতম পাশা এলাকায় যুদ্ধ করেছেন) কে মহান মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে শত বাধা বিপত্তি, বিশৃঙ্খলা, অত্যাচার ও হতাশার মুহূর্তেও তিনি স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। এমনকি জাতীয় জীবনের গভীর সংকট ও বিপর্যয়ের মুহূর্তেও তিনি তার লেখনীকে অব্যাহত রেখেছেন এবং সংকট নিরসনের লক্ষ্যে নির্দেশনা দিয়েছেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের কর্মজীবন ও রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনায় তাঁর নিজের সাক্ষাৎ কারের অংশ বিশেষ তুলে ধরছি। এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন;

> আমি ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসেত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসাম উচ্চ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হই। এই সালেরই এপ্রিল মাসের ৯ তারিখে মুসলমান কর্তৃক লাহোর প্রস্তাবকে তৎকালীন সরকার সংশোধিত আকারে গ্রহণ করে। মে ১৯৪৭ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এর আহ্বানে আসামের কংগ্রেস সরকার কর্তৃক 'বঙ্গাল খেদা' অভিযানের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করি এবং দেওয়ান আব্দুল বাসেদকে সাথে নিয়ে আমি কামরুপ, দড়ঙ্গ জেলার খাড়পুনিয়া, ঝেলনি, কালাইগাঁও, বরপেটা প্রভৃতি স্থানে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে সরকার ঘোষিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করি। আমাকে লক্ষ করে গুলি করা হয়। কিন্তু অল্পের জন্য আমি প্রাণে বেঁচে যাই। বাঙালদিের ওপর এসব নানাবিধ জুলুম ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করায় আমি আসামের শিলচরে ১ মাস ৬ দিন কারাবাস ভোগ করি। ১৯৪৮ সালে আমি সাপ্তাহিক 'নও বেলাল' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক রূপে দায়িত্ব পালন করি এবং ভাষা আন্দোলনের সপক্ষে বেশ কিছু নিবন্ধ লিখি। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় আমি সুনামগঞ্জ কলেজে কর্মরত থাকা কালীন আমার বাসা থেকেই মরহুম আবদুল হকের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনের মিছিল সংগঠিত করা হয়। ফলে আমি পাকিস্তান সরকারের কোপানলে পড়ি এবং ১৯৫৭ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পরে যখন কেন্দ্রীয় সরকার সেই পরিষদকে বাতিল করে ৯৩ ধারা প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হস্তান্তর করে, ঠিক এ সময় আমাকে কলেজের প্রিন্সিপালের পদ থেকে অপসারিত করা হয়। [৮]

[৮] মকুল চৌধুরী, বিশেষ সাক্ষাৎকার, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ঢাকাঃ রাগীব রাবেয়া সাহিত্য পুরস্কার স্মারকগ্রন্থ, ১৯৯৮, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালে পকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে সিলেট অঞ্চলকে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। তিনি এই অন্তর্ভূক্তির আন্দোলনে মাওলানা ভাসানীর নেতৃতে শেখ মুজিবের(জাতির জনক বঙ্গবন্ধু) সাথে দিন-রাত একসাথে কাজ করেছেন। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' আন্দোলনেরও তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক কর্মী। পাকিস্তান ভারত বিভক্তিতে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদারের (কুখ্যাত লাইন প্রথা) ঘোষণায় সিলেট জেলাকে তৎকালীন আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করা হলে তিনি এর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করেন। এজন্য সিলেটে 'গণভোট' অনুষ্ঠিত হলে তাঁর এবং উপমহাদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টায় খন্ডিত সিলেট জেলা তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং র‍্যাডক্লিফ এর একতরফা ঘোষণা অকার্যকর বলে বিবেচিত হয়। আসামে 'বঙ্গাল খেদা আন্দোলন' থেকে শুরু করে পরবর্তী সব আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন।

বিপন্ন মানুষের সেবা ও ত্রাণ কাজে সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন এবং সমাজ সেবামূলক বিভিন্ন কর্মসূচীতে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। সত্যিকার অর্থে প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন গণমুখী রাজনীতিবিদ। রাজনীতিকে তিনি কখনও ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন নি। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ-সাধন ও মুক্তি প্রদানই ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মূল ব্রত। গণমানুষের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি কারাবরণকেও সহাস্যচিত্তে গ্রহণ করেছেন। জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করলেও মানুষের কল্যাণ কামনায় তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছোট বেলা থেকেই অত্যধিক সাহসী ছিলেন। তিনি যখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা করেন সেই সময়ে স্কুলের পরিদর্শক স্কুল পরিদর্শন করতে আসলে কোন ছাত্রছাত্রী যখন তার সামনে গিয়ে দরখাস্ত দিতে সাহস করছিল না, তখন হেডমাষ্টার তাঁকে পাঠিয়েছিলেন পরিদর্শকের নিকট। ঘটনাটি দেওয়ান আজরফ নিজে বর্ণনা করেন:

Dhaka University Institutional Repository

> 'ছোট বেলা থেকেই আমার একটু অতিরিক্ত সাহস ছিল । এজন্য আব্বা খুব তিরস্কার করলেও আমার সম্বন্ধে একটু আশাও পোষণ করতেন। হেডমাষ্টার বোধহয় তা অবগত ছিলেন। তাই তাঁর ইশারায় ওরা এসে আমাকে পাকড়াও করলেন। যাক, কুচ পরোয়া নেই, মনে মনে আল্লাহর স্মরণ করে এগিয়ে গেলাম তার সামনে। তখন তিনি মাইনর স্কুলের সামনে খোলা জায়গায় বসে খুব উঁচু একটি ফরসী হুকোয় কাশীর অম্বুরী তামাক সেবন করছেন। দীর্ঘ আদাব দিয়ে তার হস্ত মোবারকে দরখাস্ত তুলে দিতেই তিনি আমায় প্রশ্ন করেন, 'তুমি কি পড়ো? তখন মাইনর স্কুলের সঙ্গে ওয়ান, টু অর্থাৎ পাঠশালায় তিনটি শ্রেণি যুক্ত ছিলো। বললাম ক্লাশ টুতে। তিনি আমাকে সান্ত্বনা বানান করার জন্য আদেশ করেন। ঠিকঠাক বানান করার পর তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে আমায় কোলে তুলে নিয়ে বলেন 'মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা কর, খুব বড় হতে পারবে।' [৯]

সেই পরিদর্শকের আর্শিবাদ বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। তিনি বড় মাপের দার্শনিক এবং ইসলামিক চিন্তাবিদ হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেন। ফলে তিনি ইতালীর রোমে আন্তজার্তিক সেমিনারে অংশ গ্রহনের জন্য পোপ কর্তৃক আমন্ত্রিত হন। সেখানে তিনি বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় তাঁর অসম সাহসিকতা, সংগ্রামী মনোভাব এবং প্রতিবাদস্পৃহা প্রমাণ করতে সক্ষম হন। এ প্রসংগে তাঁর ইতালীর রোমে ১৯৮৫ সালে 'International Colloquium on the Holyness of Islam and Chirstianity' শীর্ষক একটি আন্তজর্তিক সেমিনারে অংশ গ্রহণের পর সংঘটিত ঘটনাটি ড. কাজী নুরুল ইসলাম বর্ণনা করেন।

> . . . সেমিনার শেষ হবার পরের দিন আর একটি ঘটনা ঘটলো। পোপের গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হলো। পোপের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা। সবাই বসেবসেই কথা বলছিলেন। এক পর্যায়ে আজরফ স্যার উঠে দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ১০/১২ মিনিট বক্তব্য রাখলেন। তাঁর বক্তব্যের সার কথা হলো, পোপ মহোদয় মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের নিয়ে সংলাপ করছেন। আর ঠিক সে সময়ে লেবাননে মুসলমান খ্রিষ্টানগণ যুদ্ধে লিপ্ত। এখানে পোপ মহাদয়ের কি কিছুই করণীয় নেই? যদি না থাকে, তা হলে এ দু'সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে আলোচনা করা আই ওয়াশ আর ভনিতা ছাড়া কিছুই নয়। সবাই নীরব।

[৯] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, সোনাঝরা দিনগুলি, ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ২০০৪, পৃ.১৯

Dhaka University Institutional Repository

> পোপ মহাদয়ের নূরানী চেহারায় হঠাৎ করে কালো ছাপ দেখা গেলো। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি ধীর ও শান্ত কণ্ঠে বললেন, I have been doing my best and I shall continue that. পরের দিন Dr C.W.Troll ও Dr. Francisco Zannini খবরের কাগজ নিয়ে এলেন। প্রথম পাতার প্রথম কলামে খবর বেরোলো, বাংলাদেশের অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফসহ অনেক মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তির অনুরোধে যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেয়ার জন্য পোপ মহোদয় লেবাননের প্রেসিডেন্টের কাছে টেলিগ্রাফ পাঠিয়েছেন। ইটালিয় ভাষায় ছাপা এ খবরটি অনুবাদ করে সবাইকে শোনালেন Dr. Zannini. আজরফ স্যারের জন্য গর্বে বুক ভরে উঠলো। [১০]

উপরোল্লিখিত ঘটনার পূর্বেও দেওয়ান আজরফের সাক্ষাৎকারে আমরা লক্ষ করি 'বঙাল খেদা' আন্দোলনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের কারণে তৎকালীন আন্দোলন দমনে নিয়োজিত আসাম রাইফেলস এর এক সদস্য তাঁকে লক্ষ করে গুলি করে, তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান এবং শিক ড্রাইভার তাঁকে মন্দিরে নিয়ে বলি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এ সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন:

> বহিরাগত ভাইদের প্রায় দুই হাজার লোকের নিহত হওয়ার সূচনায় পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট সামসুদ্দিন হাজারিকার নির্দেশে রক্ষা পেয়েছিলাম। পরে শিলচরে আবার ১৪৪ ধারা অমান্য করে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট সুধীন্দ্র দত্তের আদেশে অমানুষিকভাবে অত্যাচারিত অপমানিত দর্শক মন্ডলির সঙ্গে হয়ত ঘাড়ের উপরে অবস্থিত মাথাটাও ফেলতাম, যদি না সেদিন মৌলবী বাজারের পুলিশ ইন্সপেক্টর ফরিদ খান আমার মাথাটা রাইফেলের আঘাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেন। শিলচর জেল থেকে বেরিয়ে এসে সিলেট জেলার স্বার্থ রক্ষা করতে যেয়ে জান বিপন্ন করে, তেরখানা স্মারকলিপি তৈরী করে দাখিল করার দিন রক্ত পিপাসু শিক ড্রাইভারের কবল থেকে আমি ও আমার খালাত ভাই অহিদুর রেজা অতি কষ্টেসৃষ্টে রেহাই পেয়ে ভেলভেডিয়ারে কোনমতে উপস্থিত হয়ে কর্তব্য সম্পাদন করে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেছিলাম। [১১]

---

[১০] ড. কাজী নুরুল ইসলাম, 'দেশের বাইরে আজরফ সাহেবকে যেভাবে দেখেছি', **আজরফ সম্বর্ধনা গ্রন্থ**, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০

[১১] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রাগুক্ত, **সোনাঝরা দিনগুলি**, পৃ. ২২৮-২২৯

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে জীবন বাজি রেখে তিনি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে গেছেন; কিন্তু তিনি রাজনীতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ না করে অর্থাৎ রাজনীতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে জীবন নির্বাহ না করে অধ্যাপনাকেই জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে সক্রিয় রাজনীতি করার ফলে অধ্যক্ষের পদ হারাতে হয় এবং কারাবরণসহ বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হতে হয়। তাই তিনি চিন্তা করলেন গণমানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য যে রাজনীতি তিনি করেছিলেন তার দ্বারা মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন করতে হলে প্রথমে তার আত্মিক উন্নতি করা দরকার।

মানুষের মননের উন্নতি না হলে কিসের রাজনীতি আর কিসের অর্থনীতি, আর কিসেরই বা সমাজনীতি! এদের কোনটিই ভালভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনা, অধ্যাপনা ও লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি লেখালেখি, শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে মানুষের আত্মিক উন্নতি বা মনন বিকাশের চেষ্টা করেন। তাঁর ধারণা মননের বিকাশ না হলে মানুষ পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারবে না, তার ভিতরে মানবতাবোধ জাগ্রত হবে না। আর যদি কোন মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ বা মানুষের জন্য মমত্ববোধ জাগ্রত না হয়, তাহলে সে মানুষটির দ্বারা কোনভাবেই মানুষের কল্যাণ করা সম্ভব নয়। তাই তিনি মনে করেন শিক্ষা এবং লেখনীর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মনুষত্ববোধ জাগ্রত করে ঐ মানুষকে স্রষ্টার খলিফা বা তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার উপযুক্ত করে গড়তে হবে। যদি কোন মানুষ সেরূপ যোগ্যতার অধিকারী হয় তবে তার দ্বারাই সঠিক নেতৃত্ব আসবে এবং অন্যান্য মানুষ সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করতে পারবে। সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা সামনে রেখে তিনি লেখালেখি শুরু করেন। তিনি ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, সংস্কৃতি-সাহিত্য, উপন্যাস, ছোট গল্প, রাজনীতি ও আত্মজীবনীমূলক রচনা অর্থাৎ মানুষের জীবনকে বিকাশের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রায় শতাধিক পুস্তক রচনা করেছেন এবং জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর লেখনীর ধারা অব্যাহত ছিল।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্ববোধ। তিনি ছিলেন জাতি ধর্ম-বর্ণ, নির্বিশেষে জ্ঞানী-গুণী, রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, ইসলামি চিন্তাবিদ, হিন্দু, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ নির্বিশেষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তিত্ব।

এ সম্পর্কে অধ্যাপক শাহেদ আলী বলেন:

> একজন সত্যিকার মুমিন, তাঁর চিন্তা কর্মে আচরণে সকল সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে দুনিয়ার সকল মানুষকে তার আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে পারেন বলে তিনি সকলের প্রিয়, সবার শ্রদ্ধেয়। তাঁর ইসলাম তাকে সংকীর্ণতার খোলসে আবদ্ধ করতে পারে নাই। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন ইসলাম ও রব্বানী দর্শনের ব্যাখ্যাতা, ইসলামী তমদ্দুনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তিনি অবিরাম কাজ করে চলেছেন, তা সত্ত্বেও হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানদের সাংস্কৃতিক ও দর্শন সমাবেশে তিনি আমন্ত্রিত হন। হিন্দুরা যেমন তাঁর বক্তব্য শুনবার জন্য আগ্রহী, তেমনি বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানরাও তাঁর বক্তব্য শুনতে চান, ইসলামের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও নিষ্ঠার কারণে তিনি কারও কাছে অগ্রহনীয় নন। কারণ তাঁর ইসলাম মানুষের ফিতরাতের ধর্ম, মানুষের প্রকৃতির ধর্ম, যা তাকে সকল মানুষের কাছে প্রিয় করে তুলেছে। [১২]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ড. কাজী নুরুল ইসলামের ভাষ্যে জনৈক খ্রিষ্টান ধর্ম যাজকের অভিমত নিচে উল্লেখ করছি:

১৯৮৫ সালে ড. কাজী নুরুল ইসলাম এবং দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ইতালির রোমে পূর্বে উল্লিখিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা হোটেলে অবস্থান না করে খ্রিষ্টান ফাদারদের ওল্ড হোমে ছিলেন। সেখানকার ঘটনা সম্পর্কে ড. কাজী নুরুল ইসলাম বলেন:

> স্যারের রুম মেট তার চেয়েও বেশি বয়সী একজন অবসরপ্রাপ্ত ধর্মপ্রচারক। জীবনের শেষ সীমায় এসে পৌছেছেন আর আমার রোমমেট তুলনামূলক ভাবে কম বয়সী। আমরা ভিন্ন বিল্ডিংয়ে থাকি। প্রত্যেকদিন স্যার রুমে গিয়ে দেখেন তাঁর জামা কাপড় মোজাসহ ধুয়ে ইস্ত্রি করে রেখেছেন তাঁর রুম মেট।

---

[১২] অধ্যাপক শাহেদ আলী, প্রাগুক্ত, **সম্বর্ধনা গ্রন্থ**, পৃ. ১-২

Dhaka University Institutional Repository

> ঘুম থেকে ওঠার আগেই দেখেন জুতা পালিশও করে রেখেছেন। নিজে চা তৈরি করে খাওয়াচ্ছেন, প্রতিদিন বিছানা ঠিক করে দিচ্ছেন। আজরফ স্যার তাঁর প্রশংসায় গদ্‌গদ। তিনি বললেন, আমার রুম মেট মানুষ নন, ফেরেশতা। যেদিন আমরা বিদায় নেব, সেদিন স্যারের রুম মেটের সাথে আমার প্রথম দেখা। তিনি স্যারের সামনেই বললেন, 'Prof Azraf is a superman, an angel. I express my gratitude to God for giving me this opportunity to share my room with a man like him. [১৩]

সুতরাং উপরোক্ত ঘটনায় দেখা যায় বৃদ্ধ ধর্মযাজক দেওয়ান আজরফকে ফেরেশতার সাথে তুলনা করেছেন, তাঁর সাথে অবস্থান করতে পারায় নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। তাই বলা যায় তিনি এমন গুণের অধিকারী ছিলেন যার ফলে তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দেশ-বিদেশের সর্বস্তরের মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন।

এখন আমরা দেওয়ান আজরফ সম্পর্কে জাতির জনক বঙ্গ বন্ধুর অভিমত উল্লেখ করবো: পাবনা সাহাজাদপুরের আব্দুল লতিফ চৌধুরী, যিনি সাহাজাদপুর হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং আওয়ামীলীগের জাদরেল নেতা ছিলেন, তাঁর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই লতিফ চৌধুরীর মেয়ে খুরশিদ জাহান চৌধুরীর সাথে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের চতুর্থ ছেলে দেওয়ান আসাদুজ্জামান (পূর্বে উল্লিখিত, যিনি সুনামগঞ্জের সীমান্ত অঞ্চল বালাঘাট এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেছেন) এর সাথে বিয়ে হয়। সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু উপস্থিত ছিলেন। বিয়ের শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব লতিফ চৌধুরীকে বলেছিলেন:

> ছেলে সম্পর্কে আমার জানা নেই, তবে তার বাবা সম্পর্কে বলি, জীবনে একজন ভাল মানুষের সাথে আত্মীয়তা করলে। আর তার মেয়ে খুরশিদ জাহানের পিঠে হাত দিয়ে বঙ্গবন্ধু দোয়া করে বললেন, 'চিন্তা কর না স্বামীর বাড়িতে তুমি সুখে থাকবে'। এখানে উল্লেখ্য যে দেওয়ান আসাদুজ্জামান মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু খুরশিদ জাহান চৌধুরী এখনও জীবিত আছেন।[১৪] এ তথ্য আমি (গবেষক) নিজে সুনামগঞ্জে গিয়ে সংগ্রহ করেছি; দেওয়ান আজরফের ছোট মেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

সাদিয়া চৌধুরী পরাগ এবং দেওয়ান আজরফের নাতি মোহাম্মদ ফরহাদ রাজা চৌধুরী, চেয়ারম্যান ২ নং রংগার চর ইউনিয়ন, সুনামগঞ্জ সদর-এদের নিকট থেকে।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ব্যক্তিগত আচার-আচরণ ঃ

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মানুষের সাথে খুবই ভালো আচরণ করতেন। অধিকাংশ মানুষের সাথে আসেন-বসেন সম্বোধন করে বাক্যালাপ করতেন। তাঁর ছোট ছেলে আবু সাঈদ জুবেরি একদিন তাঁকে নিয়ে রামপুরা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন। তিনি বারবার রিকশাওয়ালাদের জিজ্ঞাসা করছেন তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে কিনা? রিকশাওয়ালারা রাজি না হওয়ায় একটু কর্কশ ভাষা ব্যবহার করে তিনি রিকশাওয়ালাকে যেতে বাধ্য করায় দেওয়ান আজরফ ছেলের প্রতি খুব নাখোশ হয়ে বললেন, 'তুমি রিকশা চালকের সাথে এরকম আচরণ নাও করতে পারতে'। জুবেরী বললেন, 'রিকশাওয়ালারা তো যেতে চায়না'। আজরফ স্যার বললেন, 'না গেলে না গেলো, তাই বলে কি তুমি তাদের সাথে খারাপ আচরণ করবে'? তিনি খাবার টেবিলে বসার আগে কাজের লোকদের খাবার দেওয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করতেন। আগে তাদের খাবার দেওয়ার পর তিনি খাবার খেতেন। খাবার টেবিলে বসে সন্তানদের সাথে তিনি জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতেন এবং সন্তানদের সামনে আদর্শ মানুষের উদাহরণ দিতেন যাতে সন্তানেরা আদর্শবান হিসেবে গড়ে উঠে। তবে তাঁর জীবনের সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক হলো তিনি কখনো নিজের ব্যাপারে এবং সন্তান-সন্ততির চাকুরি বা ব্যবসা বানিজ্যের ক্ষেত্রে কারো নিকট কোনো সুপারিশ করা পছন্দ করতেন না। কিন্তু তিনি মানুষের জন্য ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। কোনো ছাত্র বা অন্য মানুষ তার নিকট কোন দরকারে আসলে তিনি চিঠি লিখে অথবা নিজে হাজির হয়ে তাদের জন্য সুপারিশ করতেন। ছেলে মেয়েদের বলতেন, 'আমি চাকুরির ব্যাপারে কারো সুপারিশ গ্রহণ করিনি, সুতরাং তোমাদের জন্যও কোনো সুপারিশ করব না। তোমাদের কে নিজের পায়ে দাড়াঁতে হবে'। তিনি কোনো কিছু দান করে কারো নিকট প্রকাশ করা পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন: 'বাতাসের যেমন শব্দ নেই, দান করলেও এরকম কোন শব্দ করা যাবে না'।

[১৪] গবেষকের সাথে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত তাঁদের বক্তব্য।

এটার প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর লাশ যখন গ্রামে আনা হলো তখন দেখা গেল এক অন্ধ লোক চায়ের দোকানে বসে কাঁদছে এবং বলছে একজন ভালো মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলো। তাঁর কাছে গেলে তিনি 'আমাকে অনেক সাহায্য করতেন এবং কারো কাছে বলতে নিষেধ করতেন।' তাঁর ব্যক্তিগত আমল ছিল খুবই ভালো। তিনি খুব কম সময়ই তাহাজ্জুদ নামায কাজা করেছেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পাবন্দি করতেন। বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান থাকলেও তিনি রাত দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তেন এবং বলতেন: 'তোমরা কাজকর্ম কর, আমার তো শেষ রাত্রে উঠতে হবে'। তিনি আরও বলতেন: 'আল্লাহ রাত দিয়েছেন ঘুম এবং ইবাদত বন্দেগীর জন্য'। তিনি রাতের বেলায় সাধারণত লেখালেখি বা লেখাপড়া কম করতেন। সকালে এবং দুপুরে খাবার খেয়ে সামান্য আরাম করার পর তিনি লেখালেখি বা পড়াশোনা করতেন। পরিশেষে, তাঁর সম্পর্কে বলতে হয় মানুষ তাঁকে এতই ভালোবাসতেন যে সর্বমোট ছয়টি স্থানে তাঁর জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁদের পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর মায়ের কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। [১৫]

পুরস্কার ও সম্মাননাঃ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ জীবনভর নিরবছিন্নভাবে কাজ করে গেছেন। কাজ করলে অবশ্যই তার পুরস্কার পাওয়া যায়। এটা আজরফের জীবনে বাস্তবভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। তিনি জীবদ্দশায় অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এবং মরণের পরও বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কার ও সম্মাননাগুলো হচ্ছে: স্বাধীনতা পুরস্কার (Independent Day Prize), ১৯৮১; জিগীষা সাংস্কৃতিক সংসদ (চট্টগ্রাম) কর্তৃক সংবর্ধনা, ১৯৮২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পুরস্কার (সমাজ বিজ্ঞান), ১৯৮৩; বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও ফেলো নির্বাচিত, ১৯৮৪; নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক, ১৯৮৪; বাংলাদেশ মুসলিম ওয়েলফেয়ার মিশন পুরস্কার, ১৯৮৫; আন্তর্জাতিক ধর্ম ও শান্তি পুরস্কার, (মুসলিম সংহতি পুরস্কার), ১৯৮৬; কোরানিক সোসাইটি পুরস্কার, ১৯৮৭; শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপংকর পুরস্কার, ১৯৮৮; মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ স্বর্ণপদক, ১৯৮৮; ছাত্র-যুব সম্মেলন সংবর্ধনা, ১৯৮৯; বাংলাদেশ জাতীয় সাহিত্য সংসদ স্বর্ণপদক, ১৯৮৯; জ্যোতিষী হাওলাদার পুরস্কার, ১৯৮৯; জ্ঞান তাপস ড.মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ স্বর্ণ পদক ১৯৮৯/১৯৩৫ বঙ্গাব্দ;

[১৫] এসব তথ্য, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ছোট ছেলে, দেওয়ান আবু সাঈদ জুবেরির নিকট থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ স্বর্ণপদক, ১৯৯০; খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ স্বর্ণপদক, ১৯৯০; নাট্যালোক সংবর্ধনা, সিলেট, ১৯৯০; জালালাবাদ যুব ফোরাম পুরস্কার, ১৯৯০; বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল, দুবাই (সংযুক্ত আরব আমিরাত),সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯১; ঢাকা রোটারি প্রাইজ, ১৯৯১; বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার, ১৯৯১; কবি মোজাম্মেল হক পুরস্কার, ১৯৯১; মৌলভীবাজার পৌরসভা (মিউনিসিপ্যালিটি) নাগরিক সংবর্ধনা, ১৯৯২; বিশ্বনাথ ছাত্র-কল্যাণ সমিতি সংবর্ধনা, ১৯৯২; একুশে পদক, (রাষ্ট্রীয় পুরস্কার), ১৯৯২; স্যার জগদীশ চন্দ্রবসু পুরস্কার, ১৯৯২; ভোলা জাতীয় মঙ্গল সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯২; জাতীয় অধ্যাপক (বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক) সংবর্ধনা (ঢাকা), ১৯৯৩; জালালাবাদ এসোসিয়েশন বিশেষ সংবর্ধনা (ঢাকা), ১৯৯৩; শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্বর্ণপদক (প্রাপ্তি: ২৬ অক্টোবর ১৯৯৪); সিলেট লোক সংস্কৃতি পরিষদ সংবর্ধনা, ১৯৯৪; জালালাবাদ এসোসিয়েশন স্বর্ণপদক, ১৯৯৪; মওলানা ভাসানী পুরস্কার, ১৯৯৫; সুনামগঞ্জ জেলা উন্নয়ন সংস্থা সংবর্ধনা, ১৯৯৫; সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ সংবর্ধনা, ১৯৯৬; মানবাধিকার স্বর্ণপদক, ১৯৯৬, (প্রাপ্তি: ৪ এপ্রিল ১৯৯৭); বাংলাদেশ নাগরিক সমিতি কর্তৃক জাতীয় সংবর্ধনা ও পুরস্কার, ১৯৯৭; সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ সংবর্ধনা, ১৯৯৮; Bangladesh National Student Award, England (BNSA, লন্ডনভিত্তিক সামাজিক সংগঠন), ১৯৯৮; রাগীব ও রাবেয়া সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯৯; বাংলা একাডেমী ফেলো আমৃত্যু (১৯৯৯ সালের ১ নভেম্বর পর্যন্ত); মাতৃভাষা পদক, ২০০০; নন্দিনী সাহিত্য ও পাঠচক্র কর্তৃক শ্রেষ্ঠ নন্দিনী পুরস্কার, ২০০১; বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্বর্ণপদক (প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত), ২০০২; ইত্যাদি।

জ্ঞান হচ্ছে শক্তি। জ্ঞানী ও গুণীজনই যে পৃথিবীর সর্বত্র সম্মানিত হন এবং তাঁদের জ্ঞানের শক্তির মাধ্যমে প্রকৃত সত্যটি তুলে ধরতে পারেন তার প্রমাণ আমরা দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জীবনে লক্ষ করি। ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের উদ্যোগে ১৯৫৬ সালের ১৯ শে ডিসেম্বর মাদ্রাজের আন্না মালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় সেখানে দেওয়ান

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ আজরফ পাকিস্তান দর্শন কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেন। সেখানে তাঁকে যে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে তিনি বলেন:

> আন্না মালাই নগর পৌছে দেখতে পেলুম, ভাষারও একটা মূল্য আছে। আমি বাংলা ভাষাভাষী বলে বাংলাভাষী সকলেই আমাকে পাকিস্তান দার্শনিক কংগ্রেসের খাঁটি প্রতিনিধি বলে গ্রহণ করতে চান। অপরদিকে উর্দু বা হিন্দি ভাষাভাষীগণ ড. হামিদউদ্দিনকে প্রাধান্য দিতে চান। শেষ পর্যন্ত উভয় দলের টানা হেঁচড়াতে সাব্যস্ত হল ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের Philosphical Basis of Social Revolution নামক সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করার জন্য আমাকেই সুযোগ দেওয়া হবে। ড. হামিদ উদ্দিনকে অপর একটি বিষয়ে আলাপ করতে দেওয়া হবে। Philosphical Basis of Social Revolution নামক সিম্পোজিয়ামের প্রধান বক্তা ছিলেন ড. ডি.এম. দত্ত। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বিপ্লবের মধ্যে থাকে একটা চরম আদর্শ। তাই বিপ্লব সব সময়ই নিয়ন্ত্রিত। তার প্রতিবাদে আমি বলেছিলাম উদ্দেশ্য বা আদর্শ যতই মহান বা মহৎ হউক না কেন, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিপ্লব বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। তার প্রমাণস্বরূপ আমি বলেছিলাম ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় মার্কসবাদের যে ভূমিকা ছিল, ১৯১৭ সালের রাশিয়ার বিপ্লবে মার্কসবাদ সে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নি। সে অন্যরূপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। [১৬]

পরিশেষে, বলা যায় দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি এবং রাজনীতিবিদ। তিনি রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেও স্বেচ্ছায় সাধারণ মানুষের কাতারে নেমে আসেন এবং বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের প্রকৃত রূপটি তাঁর ব্যাপক লেখালেখি ও বক্তৃতা-আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি ইসলামের আসল রূপটি শুধু লেখনী এবং বক্তৃতার মাধ্যমেই প্রকাশ করেন নি বরং সেটিকে বাস্তব জীবনে ধারণ করে তদনুযায়ী জীবন যাপন করেছেন। ফলে জীবনে এত সফলতার পরেও তাঁর ঢাকায় কোন নিজস্ব বাড়ী ছিল না। মরণ পর্যন্ত তিনি ছোট ছেলে আবু সাইদ জুবেরীর সাথে একটি ভাড়া করা বাসায় বসবাস করেছেন।

[১৬] প্রাগুক্ত, অতীত জীবনের স্মৃতি, পৃ. ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের দর্শন-ভাবনাঃ ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আমরা এ অধ্যায়ে তাঁর দার্শনিক চিন্তার ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা করব। তবে আমরা মনে করি তাঁর দর্শন উপলব্ধি ও পর্যালোচনা করার আগে সংক্ষেপে তাঁর জীবনালেখ্য তুলে ধরা দরকার। এর কারণ কোন মানুষই তাঁর পরিবার ও পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয় - তাঁর চিন্তা ও কর্মের উপর তাঁর শিক্ষা ও পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থাকে। একজন দার্শনিক সম্বন্ধেও একথা সত্যি। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের দর্শন উপলব্ধি ও পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে এখানে আরও একটি কথা বলা দরকার, সেটি হলো পাশ্চাত্য দর্শনে কোন অবস্থানের পক্ষে যেভাবে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়, আজরফের লেখার সব জায়গায় ঠিক সে পদ্ধতি অবলম্বিত হয়নি। তিনি মূলত: বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। সেজন্য তাঁর দার্শনিক অবস্থান ব্যাখ্যা করার সময় দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন। বস্তুত ঐ বর্ণনার মধ্যেই তাঁর দার্শনিক অবস্থান বিশ্লেষিত, এর সংক্ষেপণ করা হলে মূল দার্শনিক বক্তব্য ম্লান হয়ে যায়। তাই আমার এ অভিসন্দর্ভের প্রায় সর্বত্রই আমি দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করব।

দেওয়ান আজরফের মতে, প্রকৃতির বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে, প্রাণপনে সংগ্রাম করে নিজের ঠাঁই করে নেবার পর থেকেই; মানুষ পৃথিবীতে তার স্থান ও বিশ্বের আদিরূপ সম্বন্ধে নানাভাবে চিন্তা করে আসছে। আর এই চিন্তার অন্যতম বিষয় হচ্ছে, আমি কোথা থেকে এলাম? কোথায় ছিলাম, আবার কোথায় ফিরে যাব? এই দুনিয়ার এমন কোন দেশ নেই- যে দেশের মানুষ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট অথবা অস্পষ্টভাবে চিন্তাভাবনা করে না।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে দর্শনের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ পেশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন জীবন-জিজ্ঞাসা থেকে দর্শনের উৎপত্তি। আবার কেউ কেউ যেমন- মহামতি প্লেটোর ধারণা ছিল, বিস্ময় থেকেই দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি। বিভিন্ন নক্ষত্র খচিত সুনীল আকাশ, বিশাল সমুদ্রের রূপ থেকে মানব-মানসে যে বিস্ময়ের উৎপত্তি হয়। তা থেকেই এ বিশ্বের আদিরূপ জানার জন্য মানুষ উন্মুখ হয়ে পড়ে। এ কথা আংশিকভাবে সত্য। অন্য কথায়, বিস্ময়ই এ জাগতিক অনুসন্ধিৎসার একমাত্র কারণ নয়। অন্যান্য কারণ থেকেও মানব-মনে এ প্রবৃত্তির উৎপত্তি হতে পাবে। দর্শনের উৎপত্তিতে সন্দেহ যে বিশেষভাবে কার্যকর তা কিছুতেই অস্বীকার করার উপায় নেই। কেবল পঞ্চইন্দ্রিয় লব্ধ অভিজ্ঞতাকে সত্য বলে স্বীকার করলে দার্শনিক অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন থাকতো না। আমাদের মনে এ জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয় বলেই আমরা পরীক্ষা করে দেখতে চাই। কারণ দার্শনিকরা অন্যের মুখে ঝাল খাওয়া পছন্দ করেন না।

আধুনিক দর্শনের জনক রেনে ডেকার্ট, দর্শনের ক্ষেত্রে কিভাবে সন্দেহ থেকে মানব মানসে সন্দেহাতীত বিষয়ের ধারণা উপস্থিত হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পদ্ধতি হিসেবে সন্দেহকে স্বীকার করলে অবশ্য এক ধরনের বিরোধের সৃষ্টি হয়। সন্দেহাতীত কোন বিষয়ের সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে আমরা কোন কিছুকে সন্দেহ করতে পারি না। তাই ডেকার্টের মনেও সন্দেহাতীত বিষয় সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল এবং তার উপর ভিত্তি করেই তিনি আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞানকে অস্বীকার করেন। তিনি চিন্তা করলেন যে, সবকিছুকে অস্বীকার করা যায় কিন্তু নিজের সন্দেহ বা সংশয়কে অস্বীকার করা যায় না। তাই তিনি বলেছিলেন, আমি 'চিন্তা করি বলেই আমার অস্তিত্ব সত্য (Cagito, Ergo sum)। [১]

---

[১] দেখুন, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, দর্শনের নানা প্রসঙ্গ, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৭, পৃ. ১৬৪-৬৫

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান আজরফ মনে করেন, বিস্ময় অথবা সংশয় ছাড়া মানব মননের স্বাভাবিক জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি থেকেও কোন কোন ক্ষেত্রে অনুসন্ধিৎসা দেখা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, বিস্ময়, সংশয়-যা থেকেই মানুষ আদি সত্তার অনুসন্ধানে উৎসাহিত হোক না কেন- নানাবিধ সন্দেহের মধ্য থেকে তাকে কয়েকটি স্বত:সিদ্ধ নীতি প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে হয়।

এর কারণ আমরা সবকিছুকে অস্বীকার করলেও আমাদের স্বীয় অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারি না। আর এ জাতীয় জ্ঞান যে সহজ সাধ্য নয়, সেটা আমাদেরকে স্বীকার করেই অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করতে হয়। দার্শনিক কান্ট যে বিশ্বসত্তাকে অজ্ঞেয় অথবা দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার বিশ্বসত্তাকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলে যে মত পেশ করেছেন, সেগুলোকে দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁদের উপলব্ধির ফল রূপেই গ্রহণ করতে হবে। অনুসন্ধানের গোড়াতেই যদি আমরা তাঁদের সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নেই তাহলে আমাদের দর্শনের ক্ষেত্রে একটুও অগ্রসর হতে পারবো না।

দেওয়ান আজরফের মতে, এ বিশ্বের সব মানুষের মনেই আদি সত্তা সম্পর্কে জানার আগ্রহ দেখা দেয়। কিন্তু অনুকূল সমাজ ব্যবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতির বৈরিতার কারণে সব দেশে দার্শনিক জ্ঞান সমভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে না। বিখ্যাত অস্তিত্ববাদী জার্মান দার্শনিক কার্ল জেসপার্স এর ধারণা খ্রিষ্টপূর্ব আটশত থেকে দু'শ বছরের মধ্যে চীন, ভারত, এশিয়া মাইনর ও গ্রিসে জগৎ-সত্তা সম্বন্ধে নানাবিধ অনুমান ও ধারণার সৃষ্টি হয় এবং এ ধারণাগুলোই বিভিন্ন আবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে দার্শনিক মতবাদ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সময়ের চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনা করলে বিভিন্ন দেশের দার্শনিকদের চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিক ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গ্রিসের দার্শনিক চিন্তা ধারার মূল লক্ষ্য ছিল সত্যিকারের জ্ঞানলাভ করা। অপরদিকে ভারতীয় চিন্তাধারার মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের মোক্ষ বা মুক্তি লাভ। মানবাত্মাকে ভারতীয় চিন্তাবিদেরা সুদূর অতীত কাল

Dhaka University Institutional Repository

থেকে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ বলে ধারণা করেছেন। কিভাবে আত্মা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে ভারতীয় আস্তিক্যবাদী দর্শনে রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা। পক্ষান্তরে, চার্বাক দর্শন নামক নাস্তিক্যবাদী দর্শনে এ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যতিক্রম দেখা যায়। চার্বাকরা জড়বাদকে সমর্থন করে আত্মার অমরত্বকে অস্বীকার করেছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কেন বিভিন্ন দেশে দার্শনিকদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়? এর উত্তরে জার্মান দার্শনিক হারডার বলেছেন যে, "পরিবেশের তারতম্যের ফলেই দার্শনিক মতবাদে এ ভিন্নতা দেখা যায়। তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশ কালে আরও বলেছেন, 'গ্রিস দেশের দার্শনিক মতবাদের উৎপত্তি চীন দেশে সম্ভবপর হত না"। [২]

দেওয়ান আজরফ মনে করেন, দার্শনিক হারডার এর মত আংশিক সত্য। কারণ দর্শনের উৎপত্তি হয় কোন দেশের বা অঞ্চলের পরিবেশের প্রতিক্রিয়া হিসেবে। কোন পরিবেশে যেমন ভৌগোলিক উপাদান থাকে, তেমনি পূর্ব-পুরুষদের সঞ্চিত জ্ঞান বই-পুস্তকের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়।

তবে এক্ষেত্রে ভাববার বিষয় হলো-একই পরিবেশে উৎপত্তি হলেও মানসিকতার পার্থক্যের ফলে এর উপলব্ধি ক্ষমতা ভিন্ন হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জার্মান দার্শনিক হেগেল পরবর্তী সময়ে যে সব দার্শনিক মতবাদ দেখা দেয় একদিকে তাতে কেউ কেউ হেগেলের পরমসত্তাকে সচেতন সত্তা বলে স্বীকার করেন; অপরদিকে কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস প্রভৃতি দার্শনিকগণ সে পরমসত্তাকে জড় বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এক্ষেত্রে পরিবেশের ঐক্য থাকলেও ভাষ্যকারের মানসিকতার ভিন্নতার কারণে ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে।

---

[২] ঐ, পৃ. ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

দর্শনের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, এতে তিনটি যুগ রয়েছে; যথা, (১) প্রাচীন যুগ, (২) মধ্যযুগ এবং (৩) আধুনিক যুগ;

প্রাচীন যুগ: প্রাচীনযুগে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এ বিশ্বের আদি সত্তার অনুসন্ধান করে নি:সন্দেহে ও নি:শঙ্ক চিত্তে তাদের মনোভাব প্রকাশ করেছে। গ্রিক দর্শনে তার পরিচয় সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। গ্রিক দর্শনের জনক থেলিস যে চিন্তাধারার পথ ধরে সূচনা করেছিলেন সে চিন্তা ধারার পথ ধরে এক পর্যায়ে ক্রমে তার পরিপূর্ণতা দেখা দিয়েছে দার্শনিক প্লেটোর দর্শনে।

বিশ্বের আদিসত্তাকে প্রথমে জলরূপে, তারপর বায়ু, অগ্নি, জড় সমপদার্থরূপে অর্থাৎ নানাবিধ স্থুল পদার্থরূপে ধারণা করার ফলে তাঁদের মধ্যে চিন্তা ধারার বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতি প্রকাশ পায়।

এর ফলে ক্রমশ জড় থেকে অজড়, স্থুল থেকে সুক্ষ, মূর্ত থেকে বিমূর্ত ধারণার মধ্য দিয়ে মানব-মন অগ্রসর হয়েছে। তবে থেলিস থেকে প্লেটো পর্যন্ত পৌঁছার মাঝখানে আবার সোফিস্ট নামক এক দার্শনিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। তাঁরা সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, চিরন্তন সত্য বলে কিছু নেই- যা আমার কাছে সত্য বলে মনে হয়, তা অন্যের কাছে সত্য নাও মনে হতে পারে। তাঁদের মতে সত্য হচ্ছে আপেক্ষিক। এভাবে মানব জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাঁদের সাথে দার্শনিক সক্রেটিসের মত বিরোধের ফলে বিমূর্ত ধারণা আরও সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছে।

প্লেটোর দার্শনিক তত্ত্বে পূর্ববর্তী চিন্তাবিদদের ধারণাগুলো যথাযথভাবে গৃহীত হয়ে নূতনরূপ লাভ করেছে সত্য, তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, তিনি জ্ঞানের মূল্য নির্ধারণে পক্ষপাতিত্ব করে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে অবভাস (মায়া) বলে উপেক্ষা করেছেন। এরপর প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটল ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করলেও স্বজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পর্কে কোন আলোচনা করেননি। ফলে গুরুশিষ্য উভয়ের মতবাদ তৎকালীন

Dhaka University Institutional Repository

মনীষীদের নিকট পরিপূর্ণভাবে গৃহীত হলেও আধুনিক দার্শনিকদের নিকট পরিপূর্ণভাবে গৃহীত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে প্লেটো ও এরিস্টটলের সময়ে স্বজ্ঞা সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হয়নি। তেমনি মধ্যযুগে উদ্ভূত ইতিহাস দর্শন সম্পর্কেও কোন আলোচনা বা গবেষণা হয়নি। সে জন্যই যুক্তিলব্ধ জ্ঞান হিসেবে এ দর্শন প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও তাকে সার্বজনীন দর্শন বলে আধুনিক কালে গণ্য করা যায় না। গ্রিক দর্শনের ভাঙনের সময় প্লোটিনাস স্বজ্ঞাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলেও তাঁর চিন্তাধারা দর্শন থেকে বিচ্যুত হয়ে ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে।

মধ্যযুগ: দেওয়ান আজরফের মতে, মধ্যযুগের শুরুতে বিশ্বাসেরই প্রাধান্য ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে দার্শনিক-নীতিগুলোকে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার ফলে যুক্তির স্থান স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাসের নীচে নেমে যায়। অন্যদিকে, বিশুদ্ধ চিন্তা বা বুদ্ধির মাধ্যমে সত্যকে উপলব্ধি করা সাধ্যাতীত বলে, মধ্যযুগের শেষের দিকে যুক্তির সাথে বিশ্বাসের সাহায্যে তাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়। তবে যুক্তি এমন এক প্রক্রিয়া ষা একবার মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করলে তাকে আর রোধ করা যায় না। তাই ইতিহাস থেকে জানা যায় সেই অবরুদ্ধ যুক্তিই ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে শেষে রেনেসাঁতে পরিণত হয়, এবং মানুষ আপ্তবাক্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করে। এছাড়া পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালিয় রেনেসাঁতে, ষষ্ঠদশ শতাব্দীর জার্মানীর রিফরমেশন-চিন্তার জগতে ব্যক্তি-স্বাধীনতার নীতি গৃহীত হয়। তারই চরম পরিণতিতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে রাষ্ট্র বিপ্লব দেখা দেয়। এর ফলে কেবল চিন্তাজগতে পরিবর্তন আসেনি, রাজনৈতিক জীবনেও ব্যক্তি-স্বাধীনতার নীতি ঘোষণা করা হয়।

আধুনিক যুগ: আধুনিক যুগের সূচনা হয় দার্শনিক বেকনের (১৫৬১-১৬২৬) মতবাদ থেকে। আধুনিক দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে মধ্যযুগের ন্যায় আপ্তবাক্যের কোন স্থান নেই। প্রাচীন যুগের চিন্তাধারার মত এ যুগেও ব্যক্তি মননের স্বাধীনতা পূর্ণভাবে স্বীকৃত হয়েছে। ব্যক্তির ধারণাকে ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। আর এজন্য আধুনিক যুগে দর্শনের পরিসর পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান আজরফের মতে, আধুনিক যুগের শুরু থেকেই দার্শনিক চিন্তা মূলত দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। (১) প্রয়োগবাদীরা অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করেছেন। অন্যদিকে, যুক্তিবাদীরা অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানকে অসার ও অলীক বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করেছেন। এদের আলোচনা ও সমালোচনা দ্বারা দীর্ঘসময় গত হলেও দার্শনিক স্পিনোজা ব্যতীত অন্য কোন দার্শনিক স্বজ্ঞা সম্পর্কে উল্লেখ করেন নাই। স্পিনোজাও স্বজ্ঞার মাধ্যমে তাঁর দার্শনিক ভিত্তি গড়ে তোলেননি; তবে তিনি স্বজ্ঞার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মান দার্শনিক কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) সর্বপ্রথম ইন্দ্রিয়জ্ঞান (অভিজ্ঞতা) ও যুক্তিলব্ধ জ্ঞানের (বুদ্ধির) যথাযথ অবস্থান নির্দেশ করেন এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের কতটুকু অবদান রয়েছে তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেন। স্পিনোজার পরে, তিনি স্বজ্ঞার অবদান বা কার্যকারিতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ করে জ্ঞানের রাজ্যে স্বজ্ঞার স্থান নির্দেশ করেন।

দেওয়ান আজরফের মতে, আধুনিক কালের দর্শনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে বার্গসোঁর (১৮৫৯-১৯৪১) আবির্ভাবের পরে। তিনি সর্বপ্রথম স্বজ্ঞাকে জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে জীবন ধারণের জন্য টিকে থাকার এক অস্ত্র হচ্ছে বুদ্ধি । তবে বুদ্ধি ব্যতিরেকেও সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমে ইতর প্রাণী ভালভাবে টিকে থাকতে পারে। জীবন ধারণের ক্ষেত্রে বুদ্ধির মাধ্যমে মানুষ টিকে থাকলেও বুদ্ধিই মানুষের একমাত্র জ্ঞানের মাধ্যম নয়। বুদ্ধির মাধ্যমে মানুষ কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। বুদ্ধি বাইরে থেকে বিষয়কে বিশ্লেষণ করে দেখাতে পারে। কেবলমাত্র স্বজ্ঞার মাধ্যমে মানুষ আদি সত্তার মূলে প্রবেশ করতে পারে এবং স্বজ্ঞার দ্বারা বিষয় (বস্তুগত জ্ঞান) ও বিষয়ী (আত্মগত জ্ঞান) একাকার হয়ে যায়।

বার্গসোঁর সমসাময়িক চিন্তাবিদদের মধ্যে আবার মূল্যমান অর্থাৎ নীতি দর্শন সম্বন্ধে চিন্তা করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। ফলে আমরা ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ প্রভৃতি যে সব ধারণা প্রয়োগ

Dhaka University Institutional Repository

করে বিচার করি সেগুলো সম্পূর্ণভাবে আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়। তাদেরও মূল্য রয়েছে, এ সত্য নির্ধারণের জন্য নীতি দর্শন বা মূল্যমান দর্শনের উৎপত্তি।

দেওয়ান আজরফের মতে, অতি আধুনিক কালে লজিক্যাল পজিটিভিজম আমাদের ধারণাগুলোকে যাচাই করে তাদের সত্যাসত্য নির্ণয়ে ব্যাপৃত রয়েছে। দর্শনের বিশেষত্ব হিসেবে সাম্প্রতিক কালে দর্শনের আরো দু'টো শাখার উদ্ভব হয়েছে। তার মধ্যে অস্তিত্ববাদ ও ইতিহাস-দর্শন বিশেষভাবে দার্শনিক মহলে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে।

পূর্ববর্তী যুগের দার্শনিকেরা যেভাবে অভিজ্ঞতা অথবা বুদ্ধির আলোকে সত্য নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন, অস্তিত্ববাদীদের মতে সে পদ্ধ তি সঠিক নয়। তাঁদের মতে, পূর্ববর্তী দার্শনিকদের দৃষ্টিতে মানুষের বা সারসত্তাই ছিল মূল বিষয়। কিন্তু অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মতে সারসত্তা নয় অস্তিত্বই হচ্ছে মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠতর বিষয়।

সুতরাং তারই আলোকে বিশ্ব সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য। এ ছাড়াও অতি আধুনিক কালে আবার ইতিহাস দর্শনের শাখা গড়ে উঠেছে এবং রাসেল ও ট্রোয়েনবির মত চিন্তাবিদগণ ইতিহাস পাঠ করে তার মাধ্যমে সত্য আবিষ্কার করাকে সমর্থন করেছেন।

তাই এ সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, "...দর্শনের ক্ষেত্র ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। ভূয়োদর্শন, যুক্তি, স্বজ্ঞা, মূল্যমান, বিজ্ঞান ও ইতিহাস পাঠ থেকে নানাবিধ উপকরণ ও নীতি গ্রহণ করে মানুষ এখন সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। এসব ক্ষেত্র থেকে যে সব ধারণা মানুষ পাচ্ছে তাকে লজিক্যাল পজিটিভিজমের আলোকে যাচাই করে দেখতে পারে"। [৩]

---

[৩] ঐ, পৃ. ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান আজরফ মনে করেন, আমাদেরকে একটি বিশেষ স্থান থেকে যাত্রা শুরু করতে হবে যাতে আমাদের দার্শনিক মতবাদ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারে। তাই দেওয়ান আজরফ দার্শনিক ক্রোচের (১৮৬৬-১৯৫২) মতবাদকেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করেন। দেওয়ান আজরফ মন্তব্য করেছেন এভাবে:

> দর্শনের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর করতে হবে। কেননা অভিজ্ঞতাকে ব্যাপকরূপে গ্রহণ করলে, তার বাইরে অন্য কোন কিছুই থাকেনা। তবুও অভিজ্ঞতা বলতে তিনি ভূয়োদর্শন, বুদ্ধি ও স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞানকেই গ্রহণ করেছেন। আমরা অভিজ্ঞতা বলতে ভূয়োদর্শন, স্বজ্ঞা, যুক্তি, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রসূত ফল, ইতিহাসের পাঠ থেকে আহরিত জ্ঞান, মূল্যমানের বিচারজাত জ্ঞান অর্থাৎ সোজা কথায় মানব-জ্ঞানের সব শাখার সমন্বিত জ্ঞানকেই বুঝবো। এসব জ্ঞানের ভিত্তিতেই আমাদের জীবন-দর্শন গড়ে তোলাই হইবে এ যুগে আমাদের কর্তব্য।[৪]

তবে দেওয়ান আজরফ মনে করেন দার্শনিকদের বা প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁদের সমসাময়িক সামাজিক পরিবেশ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ধর্মীয় অবস্থা প্রভাব বিস্তার করে। তাই চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। যেমন- বার্ট্র্যান্ড রাসেল কয়েকবার তাঁর চিন্তার পরিবর্তন করেছেন। আবার দার্শনিক ইকবালের জীবনেও চিন্তার ক্ষেত্রে কয়েকবার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তেমনিভাবে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রেও কয়েকবার পরিবর্তন ঘটেছে।

তিনি প্রথম জীবনে বামপন্থী রাজনৈতিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর চিন্তার পরিবর্তন হয় এবং তিনি একজন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর মতে স্থান-কাল, পরিবেশ, ধর্ম প্রভৃতির ভিন্নতার কারণে দর্শনের গতিধারাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ লাভ করে।

---

[৪] ঐ, পৃ. ১৭১

Dhaka University Institutional Repository

সেজন্য তিনি প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে সমসাময়িক কাল পর্যন্ত দর্শনের বিভিন্ন ধারা আলোচনা করার পর দর্শন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মত পেশ করেছেন।

দার্শনিকদের উপর তাঁদের সামাজিক পরিবেশ, রাজনীতি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থাকে দেওয়ান আজরফের এ ধারার চিন্তা আমরা বিখ্যাত দার্শনিক বারট্র্যান্ড রাসেলের মধ্যেও দেখতে পাই। । এখানে তার লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি দেবো। রাসেল বলেন:

...philosophers are both effects and causes : effects of their social circumstances and of the politics and institutions of their time ; causes (if they are fortunate) of beliefs which mould the politics and institutions of later ages. [৫]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জন্মগ্রহণ, বেড়ে ওঠা, শিক্ষা অর্জন, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং তদজাত প্রভাব থেকে তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা গড়ে উঠা প্রসঙ্গে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এর ব্যাখ্যা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি লিখেছেন:

> দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ... সুনামগঞ্জ শহরে মাতামহ বিশ্ববিখ্যাত মরমী কবি জমিদার হাসন রাজার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সোনার চামচ মুখে দিয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং জন্মসূত্রেই সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি এরিষ্টটল কর্তৃক চিহ্নিত দর্শন চর্চার দু'টো পূর্বশর্ত প্রাচুর্য বা সচ্ছলতা এবং অবসর পূরণ করেছেন। দার্শনিক হওয়ার জন্য অন্যতম একটি গুণ হচ্ছে প্রখর স্মরণ শক্তি। এটাও দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ছিলো। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তাঁর স্মরণ শক্তিও ছিল বিস্ময়কর। তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে বাংলা, উর্দু, ফার্সি, সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্য হতে উদ্ধৃতি দিয়ে যেতে পারতেন। বিশেষ বিষয়ের মধ্যে তাঁর পড়াশুনা সীমাবদ্ধ ছিল না।

[৫] Russell, Bertrand, **A History of Westren Philosophy,** London : George Allen and Unwin Ltd., New Edition, 1962, p.7

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বিভিন্ন প্রকার দর্শন ছাড়াও তিনি বিশ্ব সাহিত্য, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব ও বিভিন্ন চিন্তাবিদদের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেছেন। কেবল তাত্ত্বিক পড়াশুনার মধ্যেই তিনি তাঁর সব মেধা ও কর্মক্ষমতাকে নিঃশেষিত করেননি। পড়াশোনার ও লেখালেখির পাশাপাশি বিভিন্ন জনহিতকর কর্ম, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ও সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। এর চেয়েও বড় কথা, দর্শন চর্চার জন্য যে বিশেষ ধরণের জিজ্ঞাসু মন প্রয়োজন, ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে সেটি পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ বড়লোকদের ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে সামন্তবাদী অবস্থায়, সেসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন- ভোগবাদী হওয়া, গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া, শোষণমূলক মনোবৃত্তির অধিকারী হওয়া, বংশগৌরব বোধ করা, সাধারণ মানুষদের মানুষ হিসেবে গণ্য না করা, পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে অহংকার বোধ করা ও অন্যান্যদের হেয় ও ছোট মনে করা, নৈতিক দিক দিয়ে শিথিল হওয়া, মূল ও যথার্থ ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হয়ে বাহ্যিক ধর্মীয় আড়ম্বর ও অনুষ্ঠান সর্বস্ব হওয়া, আন্তরিক না হয়ে প্রদর্শন সর্বস্ব হওয়া ইত্যাদি–এসব থেকে তিনি আশ্চর্যজনকভাবে মুক্ত ছিলেন। এসবের পরিণতিতে স্বাভাবিকভাবেই তাই তাঁর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কর্ম–সম্পাদনের দক্ষতার সৃষ্টি হয় এবং তিনি নানাবিধ গুণাবলির অধিকারী হন।... দীর্ঘজীবনে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ অসংখ্য সেমিনার ও আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেছেন। তিনি প্রচুর লিখেছেন। তিনি প্রায় পৌনে একশতক গ্রন্থ ও কয়েক সহস্র প্রবন্ধের রচয়িতা। দর্শনের বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও তিনি ছোট গল্প, নাটক, উপন্যাস, কবিতা, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনী, ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়াবলি নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ, জীবনীগ্রন্থ প্রভৃতি রচনা করেছেন। বলাবাহুল্য সব রচনার মধ্যেই তাঁর জীবনবোধ ও বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। [৬]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের চিন্তাদর্শন আলোচনা করার ক্ষেত্রে আরো দুটো বিষয় মনে রাখা দরকার। ১. তিনি আশি বছরের বেশি সময় ধরে লিখেছেন। বৃটিশ আমল, পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশ আমল এই তিন আমলের নানা রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে তাঁর অনেক লেখা বর্তমানে সহজলভ্য নয়।

[৬] আনিসুজ্জামান, 'দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ', সম্বর্ধনা গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩

১৯৪৭ সালের আগ পর্যন্ত সিলেট জেলা ছিল আসামের অন্তর্ভুক্ত। যে কারণে তাঁর ঐ সময়কার অনেক লেখার ব্যাপারে আমাদের দ্বৈত উৎসের উপরে অথবা তাঁর উপরে যারা লেখালেখি করেছেন, তাদের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। ২. যেহেতু দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের উপরে যারা লেখালেখি করেছেন, তারা তা বেশিরভাগই বাংলা ভাষায় করেছেন এবং সেসব ব্যক্তিবর্গ তাঁর সাথে সরাসরি পরিচিত অথবা তাঁর লেখার সাথে পরিচিত আমাদের অঞ্চলেরই লোক।

মানুষ বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। প্রকৃতির সাথে লড়াই করে তাকে পৃথিবীতে টিকে থাকতে হয়। পৃথিবীতে সুন্দর ও সফলভাবে জীবন যাপন করার জন্য তাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হয়। মানুষ সাধারণ প্রাণীদের মত কেবল নিজের অস্তিত্ব রক্ষা ও বংশবিস্তার করেই ক্ষান্ত হয়না, সে স্থায়িত্ব লাভ করতে চায়। পার্থিব জগতে এটি সম্ভব নয় দেখে তার মধ্যে অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। মানুষের মধ্যে কেবল ইচ্ছা ও কর্মশক্তি নয়, তার মধ্যে রয়েছে চিন্তাশক্তি। এ চিন্তাশক্তির প্রকাশ বিভিন্নভাবে ঘটে। মানুষ যেমন বাঁচতে চায়, তেমনি সে জীবনের অর্থ ও তাৎপর্যও বুঝতে চায়। তার এ প্রয়াস থেকেই মূলত দর্শনের উদ্ভব। প্রকৃতি সম্বন্ধে জানার আগ্রহ, নিজের অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে চিন্তাশীল করে তোলে। এরই পরিশীলিত ও বিকশিত রূপই দর্শন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ধারণা সুদূর অতীতকাল থেকেই সব দেশের চিন্তাশীল মানুষেরা জগৎ ও জীবনের মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করেছেন। আমাদের বাংলাদেশ সহ ভারতবর্ষের এ ভূখন্ডও এর ব্যতিক্রম নয়। আমাদের দেশের চিন্তাশীল মানুষেরাও জগৎ ও জীবনের রহস্য সম্বন্ধে ভেবেছেন এবং এসব রহস্য তথা সমস্যার গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন। এ প্রয়াসে তাঁরা তাঁদের মননশক্তি ও অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করে সমস্যার সমাধানের প্রয়াস পেয়েছেন। আজরফের মতে, তাই দর্শনের সমস্যা কেবল আধিবিদ্যক নয়, জ্ঞানতাত্ত্বিকও বটে। অধিকন্তু, তাঁর মতে দর্শন যেহেতু জীবন থেকেই উদ্ভূত ও জীবনের

প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত, তাই দর্শন জীবন বর্জিত হতে পারেনা বরং দর্শনকে হতে হবে বাস্তবমুখী ও জীবনঘনিষ্ঠ।

পূর্বে উল্লেখ করেছি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ পূর্ণাঙ্গ দর্শন পাওয়ার ক্ষেত্রে দার্শনিক ক্রোসের (১৮৬৬-১৯৫২) মতবাদ অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন, তিনি মনে করেন দর্শনকে যদি শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান এবং বুদ্ধিজাত জ্ঞান বলে অভিহিত করা হয়, তাহলে আমরা পূর্ণাঙ্গ দর্শন পাব না। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির পাশাপাশি আমাদের বোধি বা স্বজ্ঞাপ্রসূত জ্ঞানকেও স্থান দিতে হবে। এ সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন:

> ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় পুরাকালে দর্শনের যে চর্চা হয়েছে তাতে পাশ্চাত্যের যুক্তি ও ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর করতে হয়েছে। তাতে বোধির কোনো স্থান ছিল না, মধ্যযুগে প্রত্যয়জাত তত্ত্বের বিষয়গুলোকে যুক্তির মাধ্যমে সংহতি দানের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে প্রাচ্যে পুরাকাল থেকেই তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে বোধি বা স্বজ্ঞার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের মর্যাদা দান করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, প্রাচ্যের মনীষীদের মধ্যে জ্ঞানের পরিধি সম্বন্ধে ধারণা ব্যাপকতর ছিল। সদ্য বিগত যুগে স্বজ্ঞার ক্রিয়াশীলতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে আবার সচেতনতা দেখা দিয়েছে। এজন্য দর্শনের ক্ষেত্রেও ব্যাপকতা দেখা দিচ্ছে। দর্শনকে তাই ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা, যুক্তি এবং বোধির মাধ্যমে আহরিত ফল বলা যেতে পারে। [৭]

দর্শন বলতে এখন যা বোঝানো হয়, পাশ্চাত্যের লেখকদের বই থেকে আমরা যেভাবে জানি, তার প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল প্রাচীন গ্রিসে। এ সম্পর্কে দেওয়ান আজরফ ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে যেহেতু দর্শন মানবজীবনমুখী ও জগৎকেন্দ্রিক, তাই মানবজীবনের প্রয়োজন ও জগৎ জিজ্ঞাসা থেকেই দর্শনের উৎপত্তি। সুতরাং আমাদের এ অঞ্চলেও স্বাভাবিকভাবেই দর্শনের উদ্ভব ঘটেছিলো। তাঁর মতে, দর্শনের সঙ্গে জগৎ, জীবন ও সংস্কৃতির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ।

[৭] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, 'সভাপতির ভাষণ', **কার্যবিবরণী: বাংলাদেশ দর্শন সমিতি,** অষ্টম সাধারণ সম্মেলন ১৯৯০, ঢাকা : ১৯৯৪, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের এ অঞ্চলের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও বিভিন্ন মত, পথ ও ধর্মের চিন্তাশীল মানুষেরা তাঁদের স্বীয় উচ্চারণ ও লেখায় জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। এটা যে সবসময় সংহতভাবে বিদ্যমান তা নয় বরং অনেক সময় এগুলো বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন আকারে আমাদের ঐতিহ্যে ধৃত হয়ে আছে। আজরফের মতে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এগুলোকে সংগ্রহ, সমন্বিত ও বিকশিত করে নিজেদের দার্শনিক সৌধ নির্মাণ করা।

এ সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন:

> দর্শন বলতে আমরা যা বুঝি তার উদ্ভব, বিকাশ ও পরিপুষ্টি প্রাচীন গ্রীসে ঘটেছে বলে সাধারণভাবে জানা যায়। কিন্তু একথা পুরোপুরি নির্ভরেযোগ্য নয়। বস্তুত এই প্রাচ্যে উপমহাদেশীয় দর্শনের চর্চা যথার্থই আদি ও প্রাচীন। খ্রিষ্টপূর্ব সহস্রাধিক অব্দের মধ্যে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত হতে দেখা যায়। গ্রীক দর্শনের উন্মেষকালকে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। (খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০- খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের মধ্যে) এই সময়েই বা তার কিছুকাল পূর্বেই পারস্যে , ভারতে, চীনে এবং সম্ভবত জাপানেও দর্শনের সূত্রপাত ঘটে। প্রাচীন গ্রীসে দর্শনচিন্তা উদ্ভব হওয়ার অনেক পূর্বে মিশর, ব্যবিলন, মেসোপটেমিয়া, চীন ও ভারত প্রভৃতি সভ্য দেশে দর্শনচিন্তা বিদ্যমান ছিল। মিশর থেকেই সর্বপ্রথম দর্শন চিন্তার বিকাশ ঘটে। [৮]

এজন্য আজরফের মতে বিশ্ব দর্শনের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দর্শনকে নয় বরং উপমহাদেশ, মিশর ও চীনে উদ্ভূত দর্শনকেই অধিক প্রাচীনকালের বলে বিবেচনা করা প্রয়োজন। আগেই উল্লেখ করেছি, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এর ধারণা মানুষের জীবনের প্রয়োজন থেকেই দর্শন চর্চা শুরু হয়েছে এবং মানুষের জীবনোপলব্ধির গভীর ও ব্যাপকতর প্রকাশ হচ্ছে দর্শন। অন্যকথায়, মানুষ যুগ যুগ ধরে যে চিন্তা ভাবনা করে আসছে সেই চিন্তার সমন্বিত রূপকে দর্শন বলে অভিহিত করা যায়। এ সম্পর্কে মোহাম্মদ আজরফ বলেন:

[৮] যেভাবে উদ্ধৃত, আরশাদ আজিজ, **দর্শনের গল্প**, ঢাকা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, জানুয়ারি ১৯৮৩, পৃ. ৭

জ্ঞানের জন্য জ্ঞান চর্চা কিংবা দর্শনের জন্য দর্শন চর্চা এই শ্লোগান আদিতে সকল জনপদের মধ্যে সমভাবে উচ্চারিত না হলেও জীবনের প্রয়োজনে দর্শনচর্চা-এই প্রয়োজনবোধ যে প্রচ্ছন্নরূপে বিদ্যমান ছিল, একথা যথার্থ। 'দর্শন' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি। সাধারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার প্রতিশব্দরূপে তা ব্যবহৃত হলেও পুরোকালের ঋষিগণ এ শব্দকে চরম অভিজ্ঞতারূপেই গ্রহণ করেছেন। এ জন্য দর্শনকে পরম দর্শন নামেই অভিহিত করা সংগত।[৯]

সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, মানব ইতিহাসের যাত্রা যে দিন শুরু হয়েছিল সে দিন থেকেই দার্শনিক চিন্তারও উদ্ভব হয়েছিলো। তাইতো গ্রীক দর্শন থেকে শুরু করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যযুগের দর্শন তথা মুসলিম দর্শন, ভারতীয় দর্শন, চৈনিক দর্শন, জাপানী দর্শন, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন, ফরাসি দর্শন, জার্মান দর্শন, আমেরিকান দর্শন, বৃটিশ দর্শন, বস্তুবাদী দর্শন, অস্তিত্ববাদী দর্শন, নব্য-বাস্তববাদী দর্শন, প্রয়োজনবাদী দর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের দর্শনের বিকাশ হয়েছে। এজন্যে দর্শন কোন বিশেষ দেশ ও জাতির একক সম্পত্তি নয়। বস্তুত দার্শনিক চিন্তা সার্বজনীন ও মানবজাতির অখন্ড ও অভিন্ন উত্তরাধিকার। এজন্যে বলা হয় যে, সত্যের যেমন কোনো নির্দিষ্ট জিয়োগ্রাফি নেই, দর্শনেরও তেমনি কোনো নির্দিষ্ট জিয়োগ্রাফি নেই। দর্শন হচ্ছে চিরন্তন সত্যের অনুসন্ধান।

এ প্রসঙ্গে গোবিন্দ্র চন্দ্র দেব বলেন:

যদিও দর্শনের আসল সত্তা শাশ্বত ও সনাতন এবং সার্বজনীন ও সার্বভৌম, ইতিহাসের আদি যুগ থেকে দর্শন বৈচিত্রময়। সুখ-দু:খ সংঘাতবহুল ও প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর অথচ মৃত্যুভয়ে ভয়াতুর মানব মনের এবং তার সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধে জড়িত বিরাট বহির্জগতের পেছনে কোনো শাশ্বত সত্তা আছে কি-না নানাভাবে মানুষ তা আবিষ্কারের চেষ্টা করে আসছে। দার্শনিক তত্ত্ববোধ ও তার সহভাষী সার্থক জীবন দর্শনই দার্শনিকদের পরম লক্ষ্য, এ পরশ পাথরই তাঁরা যুগ যুগ ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।[১০]

---

[৯] প্রাগুক্ত, **অষ্টম সাধারণ সম্মেলন**, ১৯৯০, পৃ. ১০
[১০] গোবিন্দ চন্দ্র দেব, **তত্ত্ববিদ্যা সার**, ১৯৬৬, পৃ. ১৭৯-৮০

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই বলা যায়, দর্শনের শুরুতে দর্শন সত্তাকেন্দ্রিক বলে বিবেচিত হলেও এবং দর্শনের উৎপত্তিতে বিস্ময় জড়িত থাকলেও এর পিছনে মানুষের জীবনোপযোগী প্রশ্নাবলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কেননা জীবনের মৌলিক সমস্যা হতে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রশ্নাবলি এবং সে সব প্রশ্ন সমাধানের প্রয়াসেই উদ্ভব ঘটেছিল দর্শনের। তাই বলা চলে, জীবনের প্রয়োজনেই দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে দর্শনের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখেই বিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাববাদী ব্রিটিশ দার্শনিক ফ্র্যান্সিস হার্বার্ট ব্রাডলি (১৮৪৬-১৯২৪) বলেছেন যে:

> বস্তুর অধীনে শৃঙ্খলিত হয়ে মানুষ যেদিন তার নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলবে, যেদিন সূর্যোদয় ও গোধূলি লগ্নের লালাভ আভার প্রতি মানুষ আকর্ষণকে হারিয়ে ফেলবে, সেদিন ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অজানা জিনিসের প্রতি তার কোন আকর্ষণ থাকবে না, যেদিন মানুষ তার স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব খুইয়ে পশুর স্তরে নেমে আসবে, কেবল সেদিনই সে দার্শনিক জ্ঞানানুসন্ধান ও সত্য আহরণের পথ পরিহার করতে পারবে।[১১]

ব্রাডলির এ মত অনেকটা সমর্থন করে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফও দর্শন চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। দেওয়ান আজরফ বলেন:

> দর্শনচর্চা মানুষের জন্মগত। প্রকৃতির বুকে নানাবিধ বাধা বিঘ্নের মধ্যে, প্রাণপনে যুদ্ধ করে আপনার ঠাঁই করে নেবার পর থেকেই মানুষ বিশ্বে তার স্থান ও বিশ্বের আদিরূপ সম্বন্ধে চিন্তা করে আসছে। দর্শনকে তাই মানব জীবন সম্বন্ধে তথা এ বিশ্ব সম্বন্ধে মানব-মানসের চিন্তারই এক যৌক্তিক ফল বলে অভিহিত করা যায়। যতদিন এ ধরাপৃষ্টে মানবের বসতি থাকবে ততদিন অবশ্যই দর্শনচর্চা চলবে। মানুষ তার আদি সত্তাকে জানতে চায় এবং সে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে অমরত্ব লাভ করতে সে প্রয়াসী। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীই এই অমরত্ম লাভে উদগ্রীব। এ ছাড়াও পৃথিবীতে যতদিন মানুষ বাঁচবে ততদিনই সে ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভের পার্থক্য করবে। কোন পথে মূল্যবোধের সংরক্ষণ এবং এ সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব তা মানুষ বের করার চেষ্টা করবে।[১২]

---

[১১] Bradley, F.H, **Appearance and Reality,** Oxford: Oxford University Press, 1969, p.4
[১২] **ঐতিহ্য,** ঢাকা: ১ম বর্ষ, ৮-৯ সংখ্যা, পৃ. ৫৬

জগতের প্রতি সূক্ষ্মভাবে তাকালে দেখা যাবে সর্বত্রই একটা পরিবর্তনের ছাপ। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে এ পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তন হচ্ছে পৃথিবীর উপরিভাগে, সমুদ্রের তলদেশে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে, সৌরজগতে তথা মহাবিশ্বের সর্বত্র। এটা দেখেই হয়ত প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস ভেবেছিলেন জগতে পরিবর্তনই একমাত্র সত্য। এ সর্বব্যাপী পরিবর্তন স্পর্শ করেছে দার্শনিক চিন্তাকেও। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে সমকালীন দার্শনিক চিন্তাধারার দিকে দৃষ্টি দিলে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। বর্তমান সময়ে দার্শনিকেরা কেবল বিশুদ্ধ তত্ত্বালোচনার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেননি, তাঁরা এখন ক্রমাগত নিজেদের মনোযোগ নিয়োজিত করছেন মানুষের ব্যবহারিক জীবনের দিকে, প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি। এ কারণে এখন দর্শন ও নীতিবিদ্যার অনেক প্রায়োগিক শাখার উদ্ভব ও বিকাশ হচ্ছে। এদিক বিবেচনা করলে বলতে হয় দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ অনেক পূর্বেই দর্শনের এ ব্যবহারিক প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন। তাঁর কাছে দর্শন কেবল তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, দর্শন ছিল একান্তই জীবনকেন্দ্রিক। তাই তাঁকে ঢালাওভাবে ভাববাদী দার্শনিক বলা যায় না। বস্তুত তিনি ছিলেন একজন সমন্বয়ধর্মী দার্শনিক।

আমরা জানি ইংরেজিতে 'philosophy' কথাটির আভিধানিক অর্থ 'love of wisdom'- জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ ও ভালবাসা। সেই সুদূর অতীতকাল থেকে দার্শনিকেরা জ্ঞানের প্রতি ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দর্শন চর্চা করে আসছেন। তবে আজরফের মতে কেবল জ্ঞানের জন্যেই জ্ঞানচর্চা অথবা শুধু তত্ত্বালোচনাই দর্শনের সামগ্রিক রূপ নয়। তত্ত্বের সাথে বাস্তবের সহযোগেই তৈরি হয় দর্শনের পূর্ণ অবয়ব। এজন্যে মানবসমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই দর্শন চর্চার অন্যতম লক্ষ্য। তবে তিনি এ লক্ষ্য অর্জনে ছিলেন উদার ও অন্যের সাথে একসঙ্গে চলার পক্ষপাতি। এ লক্ষ্যেই দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর সমগ্র চিন্তা ও কর্মশক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন। এ সম্পর্কে দেওয়ান আজরফের বক্তব্য:

Dhaka University Institutional Repository

দর্শন শাস্ত্রে কোন শেষ কথা নেই। মানবজীবন যেভাবে অনন্তকালের ধারায় কোন দিকে প্রবাহিত হবে, তা যেমন পূর্বাহ্ন বলা কঠিন, তেমনি অনাগত কালের দর্শনও কোন দিকে অগ্রসর হবে, বলা কঠিন। তবে এ কথা জোরের সঙ্গেই বলা যায়, দর্শনকে জীবনধর্মী হতে হবে। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বা জীবনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে কোন আকাশ কুসুমের পানে দর্শন ধাবিত হতে পারেনা। বর্তমান কালে অস্তিত্ববাদের যে বিদ্রোহ দর্শন শাস্ত্রে দেখা গিয়েছে তার সূচনা বহু পূর্বেই হয়েছিলো। সোফিস্টদের বিদ্রোহে তার প্রথম প্রকাশ হলেও পরবর্তীকালে স্পিনোজার মত যুক্তিবাদী দার্শনিকের সারবস্তুকে ঈশ্বরের অপর নাম বলে ঘোষণা, লাইবনিজের ঈশ্বরতত্ত্ব বলে আরও একটা অধ্যায়ের সংযোজন, উইলিয়াম জেমসের প্রয়োগবাদের পক্ষে যুক্তি পেশ প্রভৃতিতে মানব মানসের সে অমরত্ব লাভের বাসনাই প্রকাশ পেয়েছে। বিশুদ্ধ বুদ্ধির সূত্রে ওঁরা এমন কোনো সত্তা বা নীতির সন্ধান পাননি, যার মাধ্যমে সে অমরত্ব লাভ করতে পারেন। এজন্য দর্শনের ক্ষেত্রে কেউ বা স্বজ্ঞার প্রবর্তন আবার কেউ বা ধারণার বাস্তব ফলের উপর নির্ভর করতে চেয়েছেন। অস্তিত্ববাদীগণ মানব জীবনের অস্তিত্বে অর্থটাকে সত্যের আলোকে পরীক্ষা করেছেন। এজন্য আমাদের জীবনকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়ে তারই আলোকে আমাদের সত্য মিথ্যা নির্ধারণের চেষ্টা করা উচিত। [১৩]

এজন্যে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ একটি সর্বব্যাপক ভিত্তির উপর তাঁর দর্শন সৌধ নির্মাণ করেন।

সুতরাং জগতে অসংখ্য জিনিসের অস্তিত্ব আছে। এর মধ্যে বেশকিছু জিনিস আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানতে পারি আর কিছু জিনিস আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানতে পারি না। যে সব জিনিস আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানতে পারি না, সেগুলো আমরা অনুভব করি। যে সব দার্শনিক বস্তুকে চিন্তা বা চেতনানির্ভর বলে মনে করেন, তাঁদের বলে ভাববাদী দার্শনিক। আর যে সব দার্শনিক মনে করেন, বস্তুসত্তা স্বাধীনভাবেই বিদ্যমান তাঁরা হলেন বস্তুবাদী দার্শনিক। দর্শনের ইতিহাস গভীরভাবে পাঠ করলে জানা যায় যে, বস্তু ও চিন্তার মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে দুটি মৌলিক প্রশ্ন রয়েছে: একটি হচ্ছে-সত্তা বিষয়ক, অপরটি জ্ঞান বিষয়ক।

[১৩] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, **'বাংলাদেশ দর্শন'**, কার্যবিবরণী, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, ৬ষ্ঠ সাধারণ সম্মেলন, ঢাকা : ১৯৮৬ পৃ. ১৯-২০

প্রথম প্রশ্নের মূল বিষয় হলো বস্তু ও চিন্তার সম্পর্ক নিয়ে। মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক বাস্তব জগৎকে যাঁরা চিন্তার উৎস বলে বিবেচনা করেন, জগতকে ক্রমান্বয়ে জানা যায় বলে স্বীকার করেন, তাঁরা হলেন বস্তুবাদী দার্শনিক। অপরদিকে, যাঁরা চেতনাকে মৌলিক ও বস্তুকে চেতনা -নির্ভর বলে ধরে নেন এবং বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়না বলে মনে করেন তাঁদের বলা হয় ভাববাদী দার্শনিক। অন্যদিকে রয়েছেন বাস্তববাদী দার্শনিক। তাঁদের মতে বস্তুকে জানা সম্ভব এবং বস্তুর নিজস্ব অস্তিত্ব আছে; তবে বস্তুর প্রকৃতরূপ আমরা কতটা এবং কিভাবে জানি এ নিয়ে বাস্তববাদী দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মনে করেন যে, বস্তুবাদ ও ভাববাদ দুটোই একদেশদর্শী তথা অপূর্ণ দার্শনিক মতবাদ। দুটোই সত্য, তবে আংশিকভাবে সত্য। প্রকৃত ও পূর্ণসত্য হচ্ছে এ দুটোর সমন্বয়ে। আজ পৃথিবীতে যেসব সমস্যা দেখা যাচ্ছে তার মূল কারণ এর একটিকে অস্বীকার করে অন্যটির উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন ও সে অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন। এজন্যে তিনি জ্ঞানের উৎস হিসেবে যেমন অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করেছেন, তেমন গ্রহণ করেছেন বুদ্ধিকে, আর তার সাথে যুক্ত করেছেন বোধিকে। তিনি বলেন:

> দীর্ঘকাল দর্শনশাস্ত্রের চর্চা করে আমার জীবনে এ ধারণা জন্মেছে যে, জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে কেবল জড় পদার্থের সন্ধান পাওয়া যাবে এরূপ ধারণা অর্থহীন। বিশ্লেষণের পরে বিশ্লেষিত বিষয়ের মধ্যে চেতনার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল যেমন তাঁর, বিশ্লেষণী পদ্ধতির প্রয়োগ করে তার সমাপ্তিতে কোন জীবনের সন্ধান পাননি তা ঠিক নয়। [১৪]

[১৪] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, 'দর্শন বিভাগ ও আমার জীবন ভাবনা', **দর্শন বিভাগের ৭৫ বছর স্মারক গ্রন্থ**, দর্শন বিভাগ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা: ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ৫০

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এর চিন্তাধারার দার্শনিক দিকের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সমন্বিত বিবৃতি পাওয়া যায় ডঃ আমিনুল ইসলামের লেখায়। এখন আমি তাঁর লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি দেব। তিনি বলেন:

> জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম', 'ফিলসফি অব হিস্ট্রি', 'ফিলসফি এন্ড রিলিজিয়ন' প্রভৃতি গ্রন্থে ও বহু প্রবন্ধে তিনি যে দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক মত প্রকাশ করেছেন তাতেও লক্ষ করা যায় তাঁর অবিচল ধর্মানুরাগ ও দার্শনিক যুক্তিবাদের এক চমৎকার সমন্বয়। দার্শনিক মতবাদের দিক থেকে তাঁর আকর্ষণ প্রধানত ভাববাদের প্রতি। দার্শনিক জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন জার্মান দার্শনিক হেগেলের মতবাদ দ্বারা। পরবর্তীতে তিনি ক্রমশ হেগেলীয় প্রভাব থেকে সরে এসে এক নিজস্ব ভাববাদী দার্শনিক মত রচনার দিকে অগ্রসর হন। তাঁর চিন্তা ও রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির, আবেগের সঙ্গে বিবেকের, এক কথায় ধর্মের সঙ্গে দর্শনের সংযোগ ও সমন্বয় বিধানের পক্ষপাতী।... ইসলাম ধর্মে ইন্দ্রিয় (sense), প্রজ্ঞা (Reason) ও স্বজ্ঞা (Intuition)-এ তিনটিই পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের উৎস বলে স্বীকৃত। ইসলামী মতের সুরে সুর মিলিয়ে অধ্যক্ষ আজরফ বলেন, নিছক বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা জীবনের পরিপূর্ণ ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না, কারণ বুদ্ধিই জীবনের সব নয় ; জীবন বুদ্ধির চেয়েও ব্যাপক ও গভীর। আর জীবনের এই ব্যাপক ও গভীর দিকটির ব্যাখ্যার জন্যই প্রযোজন অতিন্দ্রীয় অনুভূতি ও স্বজ্ঞার। স্বজ্ঞা জ্ঞানের এক উচ্চতর বাহন যাকে ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এর সম্যক ব্যাখ্যা ও উপলব্ধির জন্য নির্ভর করতে হয় আল্লাহ, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি কতিপয় ক্রিয়াশীল নীতি (Functional pattern) -র ওপর। এসব নীতিতে বিশ্বাস অপরিহার্য, কারণ এদের বাদ দিলে মানুষের উচ্চতর গুণাবলী তথা ন্যায়, সত্য, সুন্দর, কল্যাণ প্রভৃতি মূল্যমান ও মূল্যবোধসমূহকে ব্যাখ্যা করা যায় না। [১৫]

[১৫] আমিনুল ইসলাম, 'মোহাম্মদ আজরফের ধর্মচিন্তা ও দর্শন, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সম্বর্ধনা গ্রন্থ, ৯ই শ্রাবণ ১৪০৪, ২৫ জুলাই ১৯৯৭, ঢাকা: পৃ. ৭ ও ৯

কোন দার্শনিকের দর্শন চিন্তার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে তার দার্শনিক ভিত্তি সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দর্শন ও দার্শনিকের মতামত বিচার-বিশ্লেষণ করে তাঁর দর্শন আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. আনিসুজ্জামান বলেছেন:

> কোন দার্শনিকের দার্শনিক চিন্তার গতি-প্রকৃতি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হলে তাঁর দার্শনিক সৌধের ভিত্তি তথা জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথমে জানা প্রয়োজন। দেওয়ান আজরফ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শনের বিভিন্ন জ্ঞানতাত্ত্বিক মতামত অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করে জ্ঞানতত্ত্ব সমন্ধে তাঁর নিজস্ব মতবাদ গড়ে তুলেছেন। তিনি পূর্ণজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে এককভাবে বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, বিচারবাদ, এমনকি স্বজ্ঞাবাদ গ্রহণ করেননি বরং ক্ষেত্র বিশেষে জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ক এসব ক'টি মতকেই একই সাথে বিবেচনায় এনেছেন এবং ওয়াহীর আলোকে এগুলোকে সমন্বিত করে গ্রহণ করেছেন। অন্য কথায়, তিনি বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও সাধারণ স্বজ্ঞাকে অস্বীকার করেননি, তবে পূর্ণজ্ঞান অর্জন ও সত্যলাভের ক্ষেত্রে একক এমনকি যৌথভাবে এদের কার্যকারিতা মেনে নেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "The intuition of the prophets have still far-reaching effects on the pages of history. Their intuitions are recorded and regarded as the truths received without the help of the normal sense organs of the ratiocinative faculty. They solve problems of life, give directives to the activities of men, remodel the different instituitions of society. In short, they revalue the ideas and ideals of the exisiting order and remould the lives of men thought apparently no logical ground can be deciphered as to their origin, they do not as a matter of fact contradict the laws of reasoning or of logic. [As quoted.] এভাবে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ জ্ঞানোৎপত্তি সংক্রান্ত তাঁর ব্যাপক ভিত্তিক মত উপস্থাপন করেন। স্বাভাবিকভাবেই এজন্য তাঁর দর্শন একপেশে বা খন্ডিরূপ পরিগ্রহ করেনি। এরূপ একটি ব্যাপক জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তির উপরে তাঁর দার্শনিক সৌধ গড়ে উঠেছে বলে তার অধিবিদ্যক অবস্থান, পাশ্চাত্যে প্রচলিত এবং সে হিসেবে প্রাচ্যে অনুসৃত অর্থে, একজন স্বপ্নবিলাসী ভাববিলাসীর নয়। সেজন্য দর্শন তাঁর কাছে জীবন বিচ্ছিন্ন

> কোন তত্ত্বচিন্তা নয় বরং তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে যথার্থ দার্শনিক জিজ্ঞাসার মূল রয়েছে মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। অন্য কথায় তত্ত্বজিজ্ঞাসা মানুষের সহজাত। জীবন ও জগতের উৎপত্তি ও পরিণতি তথা আদি কারণ সংক্রান্ত প্রশ্ন, মানুষের উৎপত্তি ও পরিণতি মানব প্রকৃতি, মানবজীবনের জিজ্ঞাসা সচেতন মানব মনকে নাড়া দেবেই। [১৬]

ড.আমিনুল ইসলাম দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের স্বজ্ঞার ধারণা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে, অনেক দার্শনিকদের কাছে স্বজ্ঞা জ্ঞানের অন্যতম উৎস হিসেবে স্বীকৃত নয়; তাঁদের মতে স্বজ্ঞা ক্রটিহীন জ্ঞানের উৎস নয়, একথা বলে এটিকে একদম বাতিল করে দেওয়া যায় না। এ সম্পর্কে ড.আমিনুল ইসলামের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য।

> কিছু সংখ্যক দার্শনিকদের মতে একমাত্র ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাকেই আমরা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করতে পারি। এছাড়া স্বজ্ঞা বলে জ্ঞানের যে উচ্চতর বাহনের কথা বলা হয়, তার কোনো প্রামাণিক ভিত্তি নেই বলেই প্রমাণিক জ্ঞানের বাহন হিসেবে স্বজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়, হতেও পারে না। এ প্রসঙ্গে আমাদের অভিমত হলো যে, প্রায়োগিক প্রতিপাদননীতিই জ্ঞান পরীক্ষা ও প্রতিপাদনের একমাত্র নীতি নয়, এবং প্রায়োগিক প্রতিপাদনের বিষয়টি প্রচলিত অভিজ্ঞতায় আমাদের বেলায় প্রযোজ্য হলেও উচ্চতর মানবীয় ও পরাতাত্ত্বিক ব্যাপারে তা অচল। যেমন: দেশের শিল্প কর্মের মূল্যায়ন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন, সঙ্গীত উপভোগ প্রভৃতি মানবতার এমন অনেক দিক আছে যেগুলোকে প্রায়োগিক উপায়ে প্রমাণ বা মূল্যায়ন করা দরকার। এগুলো বাহ্যবস্তুর মত ইন্দ্রিয় পর্যবেক্ষণের ব্যাপার নয়, বরং ব্যক্তির অনুভব বা উপলব্ধির ব্যাপার। এসব ক্ষেত্রে একজন যা অনুভব ও উপলব্ধি করে অন্যকে দিয়ে অনুভব করাতে পারে না, করানো সম্ভবই নয়। কিন্তু তা সরাসরি হস্তান্তর বা প্রতিপাদন যোগ্য নয় বলে এ জাতীয় অভিজ্ঞতাকে বাতিল করে দেয়া যায় না। স্বজ্ঞাপ্রসূত তথ্যকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা যায় না, সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয়, এ জাতীয় যুক্তি যদি কেউ দিতে চান তাও টিকবে না। খোদ বিজ্ঞানের নিয়মাবলী প্রতিপাদনের ক্ষেত্রেও উপরে উল্লিখিত অসুবিধা বিদ্যমান।

....

[১৬] প্রাগুক্ত, আনিসুজ্জামান, সম্বর্ধনা গ্রন্থ, পৃ. ৩৩-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

> বিজ্ঞানীরা প্রায়শই তাঁদের বিভিন্ন মতের মধ্যে কোনটি অধিকতর প্রমাণসিদ্ধ, এ নিয়ে প্রবল বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব বিতর্কের কোনো চূড়ান্ত মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তবু বিজ্ঞান বিজ্ঞানই এবং বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলীর বৈধতাও অনস্বীকার্য। একথা অবশ্য ঠিক যে, স্বাজ্ঞিক (intutive) অভিজ্ঞতাকে আমরা সব অবস্থায় অভ্রান্ত ও অকাট্য বলে মেনে নিতে পারি না। কারণ কোন কোন অবস্থায় এ অভিজ্ঞতা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হতে পারে। স্বরূপের দিক থেকেও ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়াদি এতই বিমূর্ত ও জটিল যে, স্বজ্ঞার মাধ্যমে এদের জানতে ও উপলব্ধি করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভুল করতে পারেন। কিন্তু তাই বলে, অর্থাৎ ভ্রান্তির ঝুঁকি আছে বলে স্বজ্ঞাকে মূল্যহীন বলে বাতিল করে দেওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে বরং আমাদের উচিত এমন সতর্কতা অবলম্বন করা, যাতে করে ওই ঝুঁকির সম্ভাবনা সম্পূর্ণ দূর করা না গেলেও অন্তত কিছুটা হ্রাস করা যায়। সত্যকে ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা হয়তো কোনদিনই সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায় যখন যেটুকু সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাকে চূড়ান্ত সত্য অর্জনের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে স্বীকার করে নেয়াই বোধ হয় শ্রেয়। [১৭]

মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন একজন উদার মানুষ। তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস তাঁকে সংকীর্ণতার খোলসে আবদ্ধ করতে পারেনি। এজন্য গোড়াতেই তিনি এক আল্লাহ্‌র তৌহিদভিত্তিক বিশ্বজনীন ইসলামি জীবন দর্শন স্বীকার করে নিয়েছেন। ইসলামের এ মহান আদর্শ জীবন গ্রহণ করলে মুসলমানগণ যে কেবল নিজেদেরকেই উন্নতির সুউচ্চ শিখরে আরোহন করতে পারবে তা নয়, বিশ্বসভ্যতার রূপও পরিবর্তন করতে পারবে। এখানে উল্লেখ্য যে, আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক ও বিশ্ব-ধর্মতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান–অধ্যাপক ডঃ কাজী নুরুল ইসলাম মোহাম্মদ আজরফের সাহচর্যে থেকে তাঁর ধর্মীয় জ্ঞানবত্তা, যুক্তি ধর্মী বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং উদার দার্শনিক ভাবনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

[১৭] প্রাগুক্ত, সম্বর্ধনা গ্রন্থ, পৃ. ৯-১০

Dhaka University Institutional Repository

এই শিশুর মতো সরল মানুষটিকে নিয়ে গেলাম ভ্যাটিক্যান সিটিতে পোপের বিশেষ আমন্ত্রণে। আন্ত:ধর্মীয় সম্প্রীতির উপর কাজ করেছেন এ রকম সতেরো জন মুসলমানকে পোপ মহোদয় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। Varginia University-র Religious Studies বিভাগের অধ্যাপিকা রিফফাত হাসান এসেছিলেন। তিনি কড়া feminist। তাঁর বক্তব্যে সব মুসলমান ক্ষুব্ধ। কুরআন আর হাদীস যেন তাঁর মুখস্ত। তাঁর সাথে যুক্তিতর্কে অনেক ঝানু অধ্যাপক হেরে যাচ্ছিলেন। সে সময় উঠে দাঁড়ালেন অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। ড. মিসেস রিফফাত হাসানের প্রত্যেকটি যুক্তি একের পর এক খন্ডন করলেন। আলোচনা শেষে ভারতের আলীগড়ের একজন প্রবীণ অধ্যাপক আজরফ স্যারকে জড়িয়ে ধরে অনেক গুলি কথা উর্দুতে বললেন। তার সারমর্ম হলো: আপনি আজ মুসলমানদের ইজ্জত বাঁচালেন। আপনি যদি না থাকতেন, তাহলে যে কী হতো, খোদা-ই জানেন! গর্বে বুক ভরে উঠলো। তিনি বাংলাদেশের একজন অধ্যাপক- একথা ভেবেই নিজেকে ধন্য মনে করলাম। [১৮]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মনে করেন সুদূর প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে যে–দর্শন চর্চা হয়েছে তার ইতিহাস সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। বিশেষ করে ইংরেজরা এ উপমহাদেশে আগমন করার ফলে আমাদের ভারতবর্ষের দর্শন ইংরেজদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রকৃত বিচারে ভারতবর্ষের দর্শনের ইতিহাস সুদূর প্রসারী-এখানে পাশ্চাত্যের বহু বছর পূর্বে দর্শন চর্চা শুরু হয়েছিলো। মোহাম্মদ আজরফ বলেন:

পাক-ভারত উপমহাদেশে দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ হয়নি। ম্যাক্রমুলার থেকে শুরু করে সুবিখ্যাত অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান অথবা পরলোকগত অধ্যাপক ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত যে সকল পুস্তক রচনা করেছেন তাতে ভারতীয় দর্শনের হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের দার্শনিক মতাবলীরই আলোচনা হয়েছে। অথচ মুসলিম সমাজের কোন তত্ত্বজ্ঞানের মতবাদ নিয়ে আলোচনা হয়নি। অথচ মুসলিম সমাজেও যে মনীষীদের উদ্ভব হয়েছিলো তার প্রমাণ রয়েছে–জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক শায়খ আহমদ সিরহিন্দের 'হামা উস্ত' বা সর্বেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে।

[১৮] কাজী নুরুল ইসলাম, 'দেশের বাইরে আজরফ স্যারকে যেভাবে দেখেছি'; **দৈনিক ইত্তেফাক**, ঢাকা: ৫ নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ১৯

> শাহজাদা দারা শেকোহ তাঁর 'মুজমাউল বাহরেইনে' (মহাসাগর সঙ্গম) উপনিষদের ও কোরআনের বাণীতে ঐক্য আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। এতে তাঁর নিজস্ব মতবাদও প্রতিফলিত হয়েছে। মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সময় শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর দার্শনিক মতবাদ প্রকাশ করেন। এগুলো সে ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। [১৯]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় উপমহাদেশের দর্শনের ইতিহাস অপূণার্ঙ্গ ও অসম্পূর্ণ। ফলে এ থেকে পরিপূর্ণভাবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। তাই দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ প্রাচীন, মধ্যযুগ, আধুনিক ও সমকালীন দর্শন, মুসলিম দর্শন এবং ভারতীয় দর্শন প্রভৃতি বিচার বিশ্লেষণের পর বাংলাদেশ দর্শন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার পক্ষপাতী। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বাংলাদেশ দর্শনকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত করার জন্য বা বাংলাদেশ দর্শন যাতে প্রকৃত দর্শন হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে তার জন্য তিনি তাঁর জীবনের শেষ নি:শ্বাস পর্যন্ত লেখনির মাধ্যমে চেষ্টা করে গেছেন । তিনি মনে করেন অতীত ছাড়া অর্থাৎ অতীতকে বাদ দিয়ে কোন জাতি বা কোন কিছু প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই তিনি মনে করেন যে, বাংলাদেশে তথা এই ভূখন্ডে সুদূর অতীত থেকে দর্শনচর্চার যে মাল-মসলা রয়েছে সেগুলো একত্রিত করে বাংলাদেশ দর্শনকে সমৃদ্ধ করতে হবে। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের নিজের কথায়:

> বাংলাদেশ দর্শন সমিতির জন্মলগ্ন থেকেই আমি এর সঙ্গে নানাভাবে জড়িত। এ সমিতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাংলাদেশ দর্শন চর্চার ব্যাপক পরিবেশ সৃষ্টি এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির মানসে তাঁর প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি এতদঞ্চলে দর্শনের যে চর্চা হয়েছিলো সে সমন্ধে গবেষণার জন্য বুদ্ধিজীবী মহলকে সচেষ্ট করা। একথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, কোনো জাতি তার অতীতকে অস্বীকার ও ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করে পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। এ উপমহাদেশে সুদূর অতীতকাল থেকেই দর্শনের যে চর্চা হয়েছে, গবেষকদের দ্বারা এখন সেগুলো আবিষ্কৃতও হচ্ছে; তবে এদেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ইউরোপীয় দর্শনের অধিক চর্চার ফলে সে সব অমূল্য অবদান এখনও তার যথাযথ মূল্য লাভ করতে পারেনি।

---

[১৯] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রাগুক্ত, **দর্শনের নানা প্রসঙ্গ**, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

> আমরা বিভিন্ন দেশের দর্শনের সাথে অবশ্যই পরিচিত হবো এবং সে সব দর্শনের সুফলগুলি গ্রহণ করবো, তবে আমরা তা করবো আমাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, আদর্শ ও ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে। [২০]

দেওয়ান মোহাম্মদ ছিলেন অসম্প্রদায়িক, তাই তাঁর দর্শন চিন্তা অনেক ব্যাপক ও সমন্বয়ধর্মী ছিল। তাঁর দার্শনিক চিন্তায় কোন সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা ছিলনা। এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক শাহেদ আলীর মন্তব্য প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। তিনি বলেন:

> আমাদের লক্ষ্য সুষ্ঠুচিন্তার বিকাশ ঘটানো এবং এমন বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে মানুষ স্বীয় মত পোষণ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। আমাদের সব সময়ই মনে রাখা উচিত যে নানাবিধ মতবাদের সমন্বয়েই মানব সমাজে সংস্কৃতি বিকশিত হয়, আর চিন্তার রাজ্যে জোর জবরদস্তি করে কোন মতকেই প্রতিষ্ঠিত বা উৎখাত করা যায় না। এটাও স্মতর্ব্য যে, একটি চিন্তা ধারার ধারক ও উত্তরাধিকারী হিসেবে অথবা সেই চিন্তাধারার প্রতিপক্ষ হিসেবে জগতে নানাবিধ মতবাদ গড়ে উঠে। চিন্তার রাজ্যে কোন মতবাদই কোনো ভৌগলিক পরিমন্ডলে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং স্থান ও কালের সীমা অতিক্রম করে সে চিন্তাধারা বিস্মৃত হতে থাকে। মানব সমাজের সংস্কৃতিতে সর্বদাই এরূপ আদান প্রদান চলছে। এতদসত্ত্বেও সব দেশেই তাদের নিজস্ব মতবাদ গড়ে ওঠে এবং তার ফলে একটা ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ দর্শন সমিতির লক্ষ্য দেশ-বিদেশের দার্শনিক ঐতিহ্যের সমন্বয়ে আমাদের নিজস্ব দর্শনকে সমৃদ্ধ ও বিকশিত করা। এজন্য মোহাম্মদ আজরফ বাংলাদেশের দর্শনবিদ ও দর্শানুরাগীদের সংগঠিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এবং এদেশীয় দর্শনচিন্তাকে বিশ্বের কাছে উপস্থাপনের জন্য আন্তর্জাতিক দর্শন সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে তত্ত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। বাংলাদেশের জাতি গোষ্টীগত গৌরবময় দার্শনিক ঐতিহ্যে এবং সংস্কৃতির মৌল সূত্রগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ও বিকাশ-রূপায়নে দার্শনিক আজরফ ছিলেন সর্বদা ব্যস্ত। যে সব ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি চেতনার শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়ে একটি জাতি-গোষ্ঠীকে প্রাণৈশ্চর্যে সক্রিয় ও বেগবান করে তোলে, সেগুলিই ছিল তাঁর চিন্তা ভাবনার বিষয়। [২১]

[২০] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, বাণী, **জাতীয় দর্শন সেমিনার ১৯৯৬ স্মরনিকা**, সরকারি বি.এম. কলেজ বরিশাল

[২১] শাহেদ আলী, 'সবার শ্রদ্ধেয় দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের তিরোধানে' ; **দৈনিক ইনকিলাব**, ঢাকা: নভেম্বর ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বিভিন্ন ধরনের দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তার সাথে নিজেকে পরিচিত করেন। ইসলামী দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের উপর তাঁর যেমন গভীর আকর্ষণ ছিল, তেমনি তিনি গভীর জ্ঞান রাখতেন থেলিস থেকে শুরু করে সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, রেনে দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ, কান্ট, হেগেল, মার্কস, সার্ত্রে, হোয়াইটহেড প্রমুখ আধুনিক দার্শনিকদের দর্শন সম্পর্কে। বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত দার্শনিক জি,ই, মূর ও রাসেলের দর্শন ও বিজ্ঞান চেতনা সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। মুসলিম দার্শনিক আল কিন্দি, আল ফারাবী, ইবনে সিনা, আল গাযালী, ইবনে রুশদ, আলরাজি, আল্লামা ইকবাল ও অন্যান্য মুসলিম চিন্তাবিদদের দার্শনিক ভাবনার সঙ্গেও তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন হিন্দু, বৌদ্ধসহ ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় ও দার্শনিক সম্প্রদায়ের ভাবনারাজির সাথে। আর এ কারণেই তাঁর পক্ষে এভাবে লেখা সম্ভব হয়েছে:

> Our forefathers had, once occupied a very high position in the field of knowledge. During the middle age our forefathers contributed a very substaintial element to the stock of knowledge. We hope as the renaissance has already begun in our country, our future generation will contribute their mite not only in philosophy but in all fields of human life. [২২]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছাত্র-জীবন থেকেই দর্শন শাস্ত্রের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে দর্শন-শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভের পূর্ব থেকেই তিনি ছিলেন দর্শন সম্পর্কে যথেষ্ট অনুরাগী ও উৎসাহী। তখন থেকেই তিনি বন্ধু মহলে দর্শনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং বন্ধুরা মনোযোগ সহকারে শুনতেন। এ সম্পর্কে তাঁর সহপাঠী অধ্যাপক সাইদুর রহমান বলেন:

[২২] Dewan Mohammad Azraf, **philosophy and Religion,** Dhaka : Islamic Foundation, 1981, p. 100

> ১৯২৮ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। আজরফ সিলেট সরকারী মহাবিদ্যালয় হতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ সম্মান পরীক্ষা পাশ করে দ্বিতীয় পর্ব এম.এ তে ১৯৩১ সালে ভর্তি হন। তখন থেকেই তিনি আমার সহপাঠী। তিনি আমাদের কাছে সিলেট কলেজে অধ্যাপক সুরেন কুন্ডুর 'আইডিয়া অব গড' সম্পর্কে ক্লাসে দেওয়া বক্তৃতার বর্ণনা দিতেন, আর আমরা আগ্রহ উৎসাহ নিয়ে শুনতাম। তখনই তাঁর দার্শনিক প্রজ্ঞা অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। আমার তখনই মনে হয়েছিল, এককালে তিনি দেশের একজন প্রখ্যাত দার্শনিক হবেন। [২৩]

দেওয়ান আজরফ সম্বন্ধে সাইদুর রহমানের মন্তব্য যথাসময়ে সত্যে পরিণত হয়েছে। পরিণত বয়সে দেওয়ান আজরফ একজন বিশিষ্ট দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

বিভিন্ন দার্শনিকদের দর্শন সম্পর্কে যেমন বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা রয়েছে। তেমনি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফও সমালোচনার উর্দ্ধে নন। কোন কোন চিন্তাবিদগণ মনে করেন তাঁর দর্শনে কোন নূতনত্ব নেই। আবার কেউ কেউ মনে করেন তিনি দর্শনকে ধর্মের সাথে একাকার করে ফেলেছেন। কিন্তু দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো তিনি একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে জীবন-যাপন করলেও চিন্তার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ছিলেন। দল-মত, জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি সকলকে সমভাবে দেখার চেষ্টা করতেন এবং দর্শনের ক্ষেত্রে প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে প্রায় সকল দার্শনিকের দর্শন বিচার-বিশ্লেষন করে তিনি তাঁর নিজের মত তুলে ধরেছেন। দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁকে সমন্বয়বাদী দার্শনিক বলা যায় কারণ তিনি প্রকৃত জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি বা যুক্তি এবং স্বজ্ঞাকে স্বীকার করে তাঁর সাথে প্রত্যাদেশ (ওহী) বা বোধিকে সংযোগ করার কথা বলেছেন। তাই দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের দর্শনকে ভাববাদী র্দশন না বলে সমন্বয়ী দর্শন বলা যায় এবং তাঁকে সমন্বয়বাদী দার্শনিক বলা যায়। তিনি জাতীয় অধ্যাপকের পদ, একুশে পদক, স্বাধীনতা পদকসহ অসংখ্য সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেন। দেওয়ান আজরফ দেশ ও বিদেশে অনেক সেমিনার ও সম্মেলনে অংশগ্রহন করেছেন এবং সেসব সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করে বা বক্তব্য প্রদান করে দেশের মানুষের জন্য সুনাম বয়ে এনেছেন।

[২৩] ঐতিহ্য: ঢাকা, ১ম বর্ষ; ৭-৯ সংখ্যা, ঢাকা, পৃ. ৫৫

তৃতীয় অধ্যায়
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের রাজনৈতিক ভাবনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণঃ

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের সুদীর্ঘ জীবন ছিল সংগ্রাম, কর্মমুখরতা ও প্রাণচঞ্চলতায় পরিপূর্ণ। জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি সব মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য চিন্তা ভাবনা করতেন। তাই তিনি মানুষের হৃদয়ের ভালবাসা পেয়েছিলেন। বস্তুত তাঁর জীবনের মূলব্রত ছিল জ্ঞান ও কর্মের সাধনা। পূর্ব অধ্যায়ে উল্লেখিত ধর্ম, দর্শন, শিল্প-সাহিত্য, গ্রন্থালোচনা, গল্প-উপন্যাস, আত্ম-জীবনী মূলক রচনা, কৌতুক ও নাট্য চর্চা বহুবিধ বিষয়ে তাঁর পদচারনা ছিল। এক কথায়, জ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় তাঁর লেখনি স্পর্শ করেছে। তিনি চিন্তা করলেন শুধু জ্ঞান সাধনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, সেগুলোকে বাস্তবে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজে লাগাতে হবে। তাই তিনি তাঁর লেখালেখি ও বিভিন্ন সভা-সেমিনার বক্তৃতা সেগুলোকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন।

আমরা এ অধ্যায়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের রাজনৈতিক ভাবনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করবো। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জীবন শুধু জ্ঞান সাধনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা, কর্মসাধনায়ও ছিল সদা তৎপর। তিনি ১৯৪১ সালে অবিভক্ত ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯৪২ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগে যোগদান করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ছোট সময় থেকেই দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মানুষের দু:খ-দুর্দশা নিয়ে চিন্তা করতেন। তাই বড় হয়ে তিনি রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। প্রমাণ স্বরূপ, নিজে জমিদার পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ভূমিহীনদের (নানকারদের) পক্ষাবলম্বন করে তিনি তাদের আন্দোলনে সর্বদা নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যেই স্বীয় জমিদারীত্বে এক হাজার ভূমিহীনদের জমির স্বত্ব প্রদান করেন। ভারত বিভক্তির পূর্বকালে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি আসাম

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যকরী পরিষদের সদস্য মনোনীত এবং মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসাম আইন সভার উচ্চ পরিষদের সম্মানিত সদস্য Member of the Legislative Council (M.L.C) নির্বাচিত হন। এ সময়ে আসামের কংগ্রেস সরকারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদৌলইয়ের নেতৃত্বে তথায় বহিরাগত বাঙালীদের উপর নির্যাতন তথা 'বঙাল খেদা আন্দোলন' শুরু করলে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) বহিরাগত বাঙালীদের পক্ষে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। এ সময় দেওয়ান আজরফও এ আন্দোলন শুরু করেন এবং মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান আব্দুল বাসেতকে সাথে নিয়ে তিনি কামরুপ ও দড়ঙ্গ জেলার খাড়পুটিয়া, ঝেলন্ডি, কালাইগাঁও, বরপেটা প্রভৃতি স্থানে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে সরকার ঘোষিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন। ফলে বরপেটা আন্দোলন দমনে নিয়োজিত আসাম রাইফেলস্ এর এক সদস্য তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে, কিন্তু পুলিশ সুপার সামসুদ্দিন হাজারিকা রাইফেলস্ এর উপর ঝাপিয়ে পড়লে বর্ষিত গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়, এবং দেওয়ান আজরফ প্রাণে বেঁচে যান। তিনি আসামের কুখ্যত লাইন প্রথা (ঘোষণা: ৫ মার্চ ১৯৪৬ খ্রি:) বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং এ বছরের ২৯ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের টুকের বাজার শাখার প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। মে ১৯৪৭ সালে আসামের কংগ্রেস সরকার কর্তৃক 'বঙাল খেদা' অভিযানের বিরুদ্ধে এবং বহিরাগতদের উপর নানাবিধ জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা ও সরকার ঘোষিত ১৪৪ ধারা অমান্য করার অপরাধে মোহাম্মদ আজরফ আসামের শিলচরে মাসাধিক কাল (১ মাস ৬ দিন) জেল খাটেন। ভারতের ব্রিটিশ গভর্ণর লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন এর ঘোষণার পর তাঁর মুক্তি লাভ (৬ই জুন ১৯৪৭) হয়। তিনি সিলেটের গণভোটে অংশ গ্রহণ করে জয়লাভ করেন এবং এরপর সিলেটের বিভিন্ন স্থানে জনমত গঠনের পর কামরূপে গমন করেন। ভারত পাকিস্তান বিভক্তির পরে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যকরি কমিটি কর্তৃক কলকাতায় বাউন্ডারি কমিশনের কাছে স্মারকলিপি পেশ করার জন্য তিনি সেক্রেটারি

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত হন এবং কলকাতা সীমানা নির্ধারণ কমিশনের কাছে তেরোখানা স্মারকলিপি পেশ করেন। এ সময় সিলেট রেফারেন্ডামে (সিলেটকে পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তর্ভূক্তির জন্য) তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য; ১৯৪৭ সালের জুন মাসে রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হলে তিনি ছাতক কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করেন । তিনি ১৯৪৭ সালের ১২জুন সিলেট কেন্দ্রিয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ কর্তৃক আয়োজিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন এবং 'পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এছাড়াও দেওয়ান মোহম্মদ আজরফ তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে সক্রিয় নেতৃত্ব দিয়েছেন। পঞ্চাশের দশকে তিনি সিলেটে ভাষা-আন্দোলন (১৯৫২) সংগঠিত করেছেন ও জোরালো নেতৃত্ব দিয়েছেন। 'সাপ্তাহিক নও বেলাল' এর প্রধান সম্পাদক হিসেবে তিনি ভাষা আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন করেছেন। তিনি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠন পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

> দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ স্বদেশী আন্দোলন তথা স্বাধীনতা সংগ্রামেও (১৯৭১) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে শত বাধা বিপত্তি, নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা অত্যাচারের মুহূর্তেও তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং জাতীয় জীবনের গভীর সংকট ও বিপর্যয়ের মুহূর্তেও তিনি সংকট নিরসনের লক্ষ্যে লেখনীর মাধ্যমে দিক–নির্দেশনা দিয়েছেন। দেওয়ান আজরফ বলেন: বাংলাদেশের স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে। এই স্বাধীনতা রক্ষা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। [১]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন একজন প্রকৃত দেশ প্রেমিক। বাংলাদেশের জনগণের শুধু মুক্তিকামী কান্ডারী হিসেবে নন, একজন বিশিষ্ট লেখক হিসেবে, এমনকি একজন আদর্শ শিক্ষক রূপেও তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নানকার মুক্তি আন্দোলন থেকে শুরু করে আসামের লাইন প্রথা ও বঙ্গাল খেদা আন্দোলন, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন,

[১] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, দৈনিক ইনকিলাব, ২১ মার্চ ১৯৯৭, ১২ চৈত্র ১৪০৩, ঢাকা-পৃ. ১

সাতচল্লিশের গণভোটে অংশগ্রহণ, বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের গণসংগ্রাম এবং একাত্তরের মুক্তি সংগ্রামে পক্ষাবলম্বন-এইসব ঐতিহাসিক আন্দোলন গুলিতে সর্বদা অংশগ্রহণ করে তিনি নিজেকে একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জাতির ক্রান্তিলগ্নে অস্তিত্বের লড়াইয়ে তিনি কখনও পিছপা হননি বরং কঠিন বিপদের মুহূর্তেও মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। মোহাম্মদ আজরফের উপরিউক্ত কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করে ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরবৃন্দ তাঁকে হিউম্যানিজমের ভয়েস বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের রাজনীতি ছিল মানবতাবাদী। তিনি সব সময় মানুষের জন্য যে কল্যাণ চিন্তা করেছেন, তাঁর বাস্তব প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন রাজনীতির মধ্যমে। তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যাপক সোহেলা সোবহান বলেন:

> সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর অনুভূতিই শিশুর মত সরল ও মহৎ হৃদয় মানুষটিকে রাজনৈতিক পরিমন্ডলে টেনে নিয়ে আসে। তিনি সত্যিকার অর্থে জনসাধারণের খেদমত করার জন্যই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নেমে পড়েন। এলাকার মানুষ তাঁর সম্বন্ধে আগে থেকে জানতেন। তিনি যে একজন নি:স্বার্থ জনদরদী মানুষ এ বিষয়ে তাঁদের কোন সংশয় ছিল না। রাজনীতি তাঁর কাছে যে বিলাস, ক্ষমতার সিঁড়ি অতিক্রম করার কৌশল অথবা নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও উদ্ধার করার উপায় ছিল না এ সহজ সত্যটি তাঁর নির্বাচনী এলাকার লোকদের বেশি বোঝানোর দরকার পর্যন্ত ছিলনা। তিনি সে কারণে আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে শেষ পর্যন্ত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। জনসাধারণের বিপুল সমর্থন, তাদের ভালবাসা ও কল্যাণ চিন্তার সাথে নিয়ে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় বসেন। অধ্যক্ষ আজরফের জীবন-যাপন দেখে কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে তিনি এক সময় আইন পরিষদের একজন তুখোড় বক্তা ছিলেন। এরূপ সত্যিকার দেশপ্রেমিক প্রজাহিতৈষী রাজনীতিবিদদের যা হয়-তিনি কায়েমী স্বার্থবাদীদের কোপানলে পড়েন, গ্রেফতার হন এবং বেশ কিছুদিন জেল খাটেন। [২]

---

[২] অধ্যাপক সোহেলা সোবহান,'মানবতাবাদী দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ', প্রাগুক্ত, **সম্বর্ধনা গ্রন্থ**, প্রকাশকাল ২৫ শে জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হবার পর দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জীবনে অনেকগুলো কঠিন পরীক্ষা এসেছে। যেমনঃ চাকুরি চ্যুতি, জেলে যাওয়া, অভাব অনটন, প্রশাসনিক কোপানলে পড়া ইত্যাদি। কিন্তু তার পরেও তিনি স্বীয় আদর্শ থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। বিশেষ করে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত দিনগুলিতে তিনি জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাগুলোর মুখোমুখি হয়েছেন। যেমন, এই সময়ের মধ্যে তিনি অনেক চরম লাঞ্ছনা-গঞ্জনার স্বীকার হয়েছেন। তাকে জেলে নেওয়া হয়েছে। এমনকি তাঁর জীবনের মহান ব্রত শিক্ষকতার মত পেশা থেকেও তাকে অপসারণ করা হয়েছে। এ প্রসংগে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বিশেষ এক সাক্ষাৎকারে বলেনঃ

> আমি ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় আসাম উপপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হই। এই সালেরই এপ্রিল মাসের ৯ তারিখে মুসলিম লীগ কর্তৃক লাহোর প্রস্তাবকে তৎকালীন সরকার সংশোধিত আকারে গ্রহণ করে। মে ১৯৪৭ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানীর আহ্বানে আসামের কংগ্রেস সরকার কর্তৃক 'বঙ্গাল খেদা' অভিযানের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করি এবং দেওয়ান আব্দুল বাসেতকে সাথে নিয়ে আমি কামরুপ, দড়ঙ্গ জেলার খাড়পুটিয়া, ঝেলন্দি, কালাইগাঁও, বরপেটা প্রভৃতি স্থানে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে সরকার ঘোষিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করি। আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয় কিন্তু অল্পের জন্য আমি প্রাণে বেঁচে যাই। বাঙ্গালিদের ওপর এসব নানাবিধ জুলুমও অত্যাচারের প্রতিবাদ করায় আমি আসামের শিলচরে ১ মাস ৬ দিন কারাবাস ভোগ করি। ১৯৪৮ সালে আমি সাপ্তাহিক 'নও বেলাল' প্রত্রিকার প্রধান সম্পাদক রূপে দায়িত্ব পালন করি এবং ভাষা আন্দোলনের স্বপক্ষে বেশকিছু নিবন্ধ লিখি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় আমি সুনামগঞ্জ কলেজে প্রথমে উপাধ্যক্ষ ও পরে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করি। কলেজে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে আমার বাসা থেকেই মরহুম আব্দুল হকের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনের মিছিলকে সংগঠিত করা হয়। তার ফলে আমি পাকিস্তান সরকারের কোপানলে পড়ি এবং ১৯৫৭ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পরে যখন কেন্দ্রিয় সরকার সেই পরিষদকে বাতিল করে ৯৩ ধারা প্রয়োগ করে কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট হস্তান্তর করে। ঠিক এ সময় আমাকে কলেজের প্রিন্সিপালের পদ থেকে অপসারিত করা হয়। [৩]

---

[৩] মুকুল চৌধুরী, 'বিশেষ সাক্ষাতকারে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ', রাগীব রাবেয়া সাহিত্য পুরস্কার স্মারক গ্রন্থ ১৯৯৮ প্রকাশকালঃ ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯, ৭ ফাল্গুন১৪০৬, ঢাকা, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ছিলেন বাস্তববাদী এবং অত্যন্ত আত্ম প্রত্যয়ী রাজনীতিবিদ। সৃষ্টিকর্তার প্রতি ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। মানুষের প্রতিদায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের কারণে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ পরবর্তীতে এসব সংকটাপন্ন অবস্থা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন গণমুখী রাজনীতিবিদ। রাজনীতিকে তিনি কখনও ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেন নি। বিপন্ন মানুষের সেবা ও ত্রাণ কাজে সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছেন। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সত্যিকার কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর রাজনীতিক জীবনের মূলব্রত। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এর রাজনৈতিক ভাবনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান বলেন:

> দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন বড় মাপের জীবন ঘনিষ্ঠ দার্শনিক, উঁচু স্তরের সূফিসাধক, ইসলামী চিন্তাবিদ, গণমুখী রাজনৈতিক, কল্যাণধর্মী অর্থনীতিবিদ, মানবমুক্তির লক্ষ্যে নিবেদিত সংস্কৃতির বলিষ্ট কণ্ঠ, সুবক্তা, সুলেখক ও সুপন্ডিত, সর্বোপরি একই সাথে বিরল ধী শক্তির ও হৃদয়ানুভূতির অধিকারী একজন প্রজ্ঞাবান মানুষ। [৪]

একজন আদর্শবান রাজনীতিবিদ হিসেবে দেওয়ান আজরফ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দুঃখ-দুর্দশা,শোষণ-পীড়ন ও অশান্তি ইত্যাদি দেখে হতাশ হন এবং উপলব্ধি করেন যে এ অবস্থায় প্রকৃত গণতন্ত্র বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে দেওয়ান আজরফ বলেন:

> বর্তমান কালের সভ্য জগতের মানবগোষ্ঠী দল ও জাতীয়তার মোহে এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়েছে যে, একজাতি অপরজাতিকে মোটেই প্রীতিও সম্ভ্রমের নজরে গ্রহণ করেছে না। নিজেদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য সাময়িকভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলেও তাদের জাতীয়তার বাইরে অবস্থিত লোকদের

---

[৪] ড.আনিসুজ্জামান-'দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ', **দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সম্বর্ধনা গ্রন্থ**, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

> সঙ্গে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সূত্রে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই অসম্ভবের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পরে লীগ অব নেশনস এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পরে সম্মিলিত জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও তাতে জাতীয় স্বার্থ আদায় করার মানসিকতার অবসান হয় নি। এক দেশ বা রাষ্ট্রের মানুষের পক্ষে অপর দেশ বা রাষ্ট্রের মানবিক অধিকার বা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃতি লাভ করেনি। এতে গণতন্ত্রের বিকাশে প্রবল অন্তরায় দেখা দিয়েছে।[৫]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির যদি বিকাশ ঘটাতে হয় বা বাস্তবায়ন করতে হয় তাহলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বা চেতনা দরকার। এর জন্য আরও দরকার উচ্চতর গণতান্ত্রিক মূলমান বা নৈতিকতা যেমন:- প্রেম, দয়া, মায়া প্রভৃতি; এগুলো যদি না থাকে তাহলে একের সাথে অপরের সাথে হিংসা- বিদ্বেষ দেখা দিবে। তাই রাষ্ট্র আর স্বাধীনভাবে টিকে থাকতে পারবে না। এ সম্পর্কে দেওয়ান আজরফ বলেন:

> এ দুনিয়ার বুকে যদি গণতান্ত্রিক মুল্যমানের আলোকে সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ গ্রহণ করা যায় তাহলে এ জাতীয় সমাজ বা রাষ্ট্রের মুল্য এ বিশ্ব চরাচরে রয়েছে বলে ধারণা করলে তার অস্তিত্ব-স্থায়িত্ব ও গুরুত্ব প্রবল হবে । গণতন্ত্রের সঙ্গে মূল্যবোধ সংক্রান্ত চেতনা সংযোগ না থাকার ফলেই ব্যষ্টির অধিকারের সঙ্গে সমষ্টির অধিকারের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে । সম্পূর্ণভাবে ঐতিহ্য চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে ঈর্ষা ও হিংসার ভাব এবং যার পরিণতিতে দেখা দিচ্ছে যুদ্ধ বিগ্রহ ও আগ্রাসন । তাই মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে উচ্চতর মুল্যমানের ভিত্তি স্বরূপ এ সকল মুল্যমানের আধারগুলিকেও স্বীকার করে, সমাজের বুকে যার যতটুকু ন্যায্য অধিকার, তা আদায় করতে হবে এবং সঙ্গে প্রেম, দয়া মায়া প্রভৃতি নৈতিক মুল্যমানগুলিকে গণতান্ত্রিক মূল্যমান বলে গ্রহণ করতে হবে। [৬]

---

[৫] **জীবন বাতি**, ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী সংখ্যা, চট্টগ্রাম, ১৪১৪ হিজরী, পৃ. ৭-৩৩, প্রতিরোধ ১৫শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা,ঢাকা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩৯৮, সেপ্টেম্বর ১৯১১, পৃ. ৩৫-৩৬

[৬] **সচিত্র বাংলাদেশ**, সংখ্যা ১৭, ১৮ এবং ১৯, ঢাকা, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১, ১ আশ্বিন ১৩৯৮, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বিশ্বের মানুষ রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে । বিশ্বের প্রতিটি দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হলে গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা একান্ত জরুরি। এ সমন্ধে বর্তমান কালের ঘটনাবলী দৃষ্টে সকলেই একমত পোষণ করেন । তবে, কোন দেশের মানুষের জীবনে যদি চিন্তা, ধর্ম এবং মতবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকে-যদি দেশের মধ্যে এক শ্রেণি কর্তৃক অপর শ্রেণিকে শোষণের অবকাশ থাকে তাহলে সে দেশের স্বাধীনতা টিকে থাকতে পারে না । কাল ক্রমে সে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হবেই । ভারত বর্ষের ইতিহাস আলোচনা করলে ইহা আমাদের নিকট স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে । এ জন্য আমাদের দেশে প্রকৃত গণতন্ত্রের চর্চা হওয়া দরকার এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি মানুষের আস্থা ও শ্রদ্ধা থাকা উচিত । বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায়ও সে মূল্যবোধগুলির প্রতি দিকনির্দেশনা ও সেগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করার ব্যবস্থা থাকা একান্ত দরকার । এই গণতান্ত্রিক মূল্যমানের প্রতি জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । এজন্য তিনি সকল ধরনের শোষণ-বঞ্চনা ও প্রতারণার উর্দ্ধে উঠে চিন্তা করেছেন ও তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে মানবীয় গুণাবলী প্রতিফলনের চেষ্টা করেছেন । স্বজাতি, স্বদেশ ও নিজ সমাজের উন্নয়নে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। এজন্য সকল মানুষের কল্যাণ কামনার পাশাপাশি তিনি নিজ দেশের শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের কল্যাণ কামনা ও সম্পদের সুষম বন্টনের কথা চিন্তা করেছেন । দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশ করার পূর্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতাদর্শ বিচার-বিশ্লেষণ করে কোন মতবাদ বা শাসন ব্যবস্থা মানবের কল্যাণ সাধন করতে পারবে অর্থাৎ কোন শাসন পদ্ধতি রাষ্ট্রে কায়েম থাকলে মানুষ শান্তি ও সমৃদ্ধি সহকারে জীবন যাপন করতে পারবে-সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন:

> রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মানব জীবন সম্বন্ধে আমরা নানাবিধ ধারণার সঙ্গে পরিচিত হই। মানুষকে কোথাও ভাবা হয়েছে সম্পূর্ণ একক ও নি:সঙ্গ হিসেবে, আবার কোথাও ভাবা হয়েছে শ্রেণিবদ্ধ জীব হিসেবে। এ ধারণার সত্যাসত্যের উপরই বিভিন্ন মতবাদের সত্যাসত্য নির্ভরশীল। অন্যদিকে দেখা যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদেরও কারণ রয়েছে; কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন বিশেষ মতবাদের উৎপত্তি তার কারণ নির্ণয় করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এক সময় পোপের শাসনে

সমস্ত ইউরোপ অতিষ্ট হয়ে পড়ে। পোপের অধীনে বিভিন্ন বেশে মস্ত মস্ত জমিদারী গড়ে উঠে। সে সব জমিদারীর মালিক সামন্ত সর্দারেরা দেশের বুকে চালায় অকথ্য নির্যাতন, তাদের অধীন গরীব চাষীরা ভূমিদাসে পরিণত হয়। এসব ভূমিদাস সামন্ত সর্দারের কাঠের কাঠুরে ও পানি সরবরাহকারী রূপে তাদের হাতের পুতুল হয়েই বেঁচে থাকে। এসব সামন্ত সর্দার দেশের উৎপাদন শক্তি তাদের হাতের মুঠোয় রেখে উৎপাদিত দ্রব্য যথেচ্ছা বিক্রি করার জন্য অপর একদল লোককে দিতো। ক্রমে সেই বনিক গোষ্ঠী দেখতে পেলো দেশের সমস্ত চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন করে ভূমি-দাসেরা। সামন্ত সর্দারেরা বসে বসে ভোগ করে অথচ উৎপাদিত দ্রব্যের উপরই তাদেরই মালিকানার দস্তুরতে তারা বনিকদের উদ্ধৃত্তকে যথেচ্ছা চালান দেওয়ার সুবিধা দেয়না। কাজেই এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবিচারমূলক। তার পরিবর্তে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দেয় নতুন দার্শনিক মতবাদ তাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় উদারনৈতিক মতবাদ । এ মতবাদের সুচনা হয় ইতালীয় রেনেসাঁয় । জার্মানির রিফরমেশনে হয় তার বিকাশ এবং ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবে তা' পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। ইতালী রাজনৈতিক চিন্তানায়ক ম্যাকিয়াভেলিই সর্ব প্রথম দেশের শাসন ব্যবস্থায় রাজকীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। পোপের আধিপত্য বিনাশের জন্য তার সুচনা হলেও পরবর্তী কালে ধর্মের রাজ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতার নীতি গৃহীত হয়। আল্লাহ ও মানুষের অন্তবর্তী অন্য কোন ব্যক্তি বা শ্রেণির আধিপত্য অস্বীকার করে মার্টিন লুথার তাঁর প্রটেসট্যান্ট্ ধর্ম প্রচার করেন এবং ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় রাবোস পিয়ারের জীবনে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা শ্লোগান হয়ে পড়ে ।[৭]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের দৃষ্টিতে উপরিউক্ত আলোচনার দুটি দিক রয়েছে।

১) নঞর্থক দিকের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এটা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে দারুণভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

২) অপরপক্ষে, সদর্থক দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই মতবাদের মধ্যে মানুষের স্বাধীনতা নিহিত। এখানে যেমন ব্যক্তি উৎপাদন করতে পারবে তেমনি ভোগ ও বিলি-বন্টন করতে পারবে।

---

[৭] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকাঃ বাংলাদেশ, ১৯৯১, পৃ. ২৩, ২৪

আজরফের মতে, সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ গড়ে উঠে উদার নৈতিক মতবাদ। এই উদার নৈতিক মতবাদই শেষ পর্যায়ে ব্যক্তি -স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সর্বশেষে ধনতন্ত্রে রূপলাভ করে। আর এই ধনতন্ত্রের নানাবিধ ত্রুটির ফলে সমাজে দারুণ সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা নিরসনের জন্য কার্ল মার্কস ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বস্তুতান্ত্রিক সমাজবাদ নামক এক মতবাদ উদ্ভাবন ও প্রচার করেন। ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা কার্ল মার্কসকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। ফলে তিনি ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করান। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মতে, প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত যতগুলো রাজনৈতিক মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে তাদের মধ্যে সমাজ জীবনের আদি সংখ্যা হিসেবে কোথাও ব্যক্তি আবার কোথাও সমষ্টিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তাই রাজনৈতিক মতবাদগুলো মোটামুটি দু"ভাগে ভাগ করা যায়। ১) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ; ২) সামাজিক চুক্তি মতবাদ;

নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদঃ

উদার নৈতিক মতবাদের ভিত্তি করেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ গড়ে উঠেছে। একে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ বলা রয়েছে এই জন্য যে, এখানে মানব সমাজের আদি উপাদান রূপে ব্যক্তির সত্তাকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ফরাসী ভাষায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ 'লেসা-ফার' (Laissez Faire) নামে পরিচিত এর অর্থ 'হস্তক্ষেপ না করা, যার যার স্বাধীনমতে চলতে দাও'। আর তাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের আর এক নাম 'স্বাচ্ছন্দ্য নীতি'।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদের মূল কথা হলো, রাষ্ট্রের কর্মধারা যথাসম্ভব সংকোচন করা এবং ব্যক্তি-ইচ্ছা ও স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা। জন লক, এডাম স্মিথ, হার্বাট স্পেনসার ও জে.এস. মিল প্রমুখ এ মতের সমর্থক।

Dhaka University Institutional Repository

এই মতবাদ সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন:

> মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও লক থেকে শুরু করে এ্যাডাম স্মিথ পর্যন্ত যে চিন্তা ধারার ইতিহাস পাওয়া যায়, তার সার সংক্ষেপে এই বলা যায়, মানুষের চিন্তা রাজ্যে চলেছে আনবিক মনস্তত্বের খেলা। রাষ্ট্রীয় জীবনে চলছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্যের চেষ্টা। মানুষ একক হয়েই জন্মগ্রহণ করে, সেই একক মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শ থেকে গড়ে ওঠে তার সমাজ, তার জাতি তার রাষ্ট্র। মানুষের আদি সত্তায় রয়েছে তার অহংবোধ ও স্বার্থপরতা। সেই আদি মানবের চলাফেরায়, ব্যবসা-বানিজ্যে চিন্তা ধারায় অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে-তার কাজ কর্মে যাতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়েই রাষ্ট্র গড়ে উঠবে। [৮]

এখানে উল্লেখ্য যে, পূর্বেই বলা হয়েছে ব্যক্তির ইচ্ছা ও স্বাধীনতা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকবে। ব্যক্তিকে যদি এত স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহলে তাদের মধ্যে সবসময়ই মারামারি-হানাহানি লেগেই থাকবে। প্রত্যেকে যদি নিজের স্বার্থের কথা ভাবে, তাহলে মানুষের জীবনে কোলাহলের সৃষ্টি হবে-মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না। এ সম্পর্কে জন লকের মন্তব্য হচ্ছে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ পশুর মত একে অপরের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত থাকেনি, মানুষের মধ্যে শান্তি বিরাজ করেছে। প্রকৃতির আইনের দ্বারা মানুষের স্বাভাবিক অধিকার, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি ভোগের সুযোগ থাকে।

এতদসত্ত্বেও প্রকৃতির রাজ্যে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন,

১) প্রকৃতির রাজ্যে কোন আইনকে ব্যাখ্যা বা প্রয়োগের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান নেই।

২) যদিও প্রকৃতির আইন-কানুন সকল মানুষের মনেই কার্যকরি, তবুও বিচার বুদ্ধির পার্থক্যের দরুণ এবং স্বার্থের ভিন্নতার ফলে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়।

---

[৮] ঐ, পৃ. ২৫

লক মনে করেন, উপরিউক্ত সৃষ্ট সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য মানুষ সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব। এই বুদ্ধির বদলতেই মানুষ অন্যের সাথে বিরোধ না করে তার নিজের অধিকার বজায় রেখে চলতে পারে। তবে এতেও অনেক সময় তাকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তাই নিজের মঙ্গলের জন্য তার অধিকার অন্য সম্প্রদায়ের হাতে তুলে দিয়ে সবার সাথে মিলেমিশে জীবন ধারন করতে থাকে। আর এ থেকেই উৎপত্তি হয় সামাজিক চুক্তি মতবাদের।

সামাজিক চুক্তি মতবাদঃ

সামাজিক চুক্তি মতবাদ অতি পুরনো। এ মতবাদের সার কথা হলো রাষ্ট্র একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং মানুষের দ্বারাই এর সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ আদিম মানুষের মধ্যে পারস্পারিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে ফরাসী দার্শনিক রুশো এক নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। রুশো সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যার শুরুতে রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতির রাজ্যেরও অস্তিত্ব ছিল বলে ধরে নিয়েছিলেন। রুশোর মতে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব–সংঘাত ছিল না। পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও সহানুভূতি বিদ্যমান ছিল। সে সময়কার মানুষ মুক্ত, উদার, সাহসী ও সতেজ মনের অধিকারী ছিল। ফলে নিরবচ্ছিন্ন সুখ–শান্তি বিরাজ করত। সে সময়কার অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি প্রকৃতির রাজ্যকে 'মর্তের স্বর্গ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রকৃতির রাজ্যে স্বর্গের ন্যায় অবস্থা বিরাজ করা সত্ত্বেও এ রাজ্যের আদর্শ পরিবেশ বেশি দিন টিকেনি। এর পিছনে দুটো কারণ দায়ী ছিল।

১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি;

২) চিন্তাশক্তির বিকাশের কারণে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব;

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি উদ্ভবের ফলে, এই সম্পত্তির ভোগ দখলের অধিকার নিয়ে সংঘাত দেখা দিল। ফলে অশান্তি , বৈষম্য ও দ্বন্দ্ব শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে কলুষিত করে ফেলল। জনসাধারণ তখন স্বাভাবিকভাবেই এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে লাগল। রুশোর মতে,

জনসাধারণ এ অবস্থায় নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে রাষ্ট্র গঠন করল। রুশোর এ মতবাদকে বলা হয় 'সামাজিক চুক্তি মতবাদ'। এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ব্যক্তি তার সমস্ত অধিকার সম্প্রদায়ের হাতে ন্যস্ত করে। সকলকে তাদের অধিকারও একইভাবে সম্প্রদায়ের হাতে ন্যস্ত করতে হয় বলে অন্যের পক্ষে পীড়াদায়ক কোন শর্ত আরোপিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। সামাজিক চুক্তি মতে সম্প্রদায়ই সার্বভৌমত্ব লাভ করে। কারণ, ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায়ই তার সমস্ত অধিকার সম্প্রদায়ের হাতে তুলে দেয়। রুশোর জীবনীতেই তাঁর মতবাদ পরিষ্কারভাবে ফুটে উটেছে:

> আমরা প্রত্যেকেই আমাদের শরীর ও শক্তি সর্বসাধারণের মহান ইচ্ছার অধীনে সমর্পন করি এবং আমাদের সংঘবদ্ধ অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমাদের সমগ্র সম্প্রদায়ের অভিভাজ্য অংশরূপে গ্রহণ করি। এই সমাবেশের ফলে একটা নৈতিক ও সংঘবদ্ধ সংগঠনের সৃষ্টি হয়- যার নিষ্ক্রিয় অবস্থার নাম রাষ্ট্র। সক্রিয় অবস্থার নাম সার্বভৌমত্ব এবং অনুরূপ কোন সংগঠনের সম্বন্ধ যাকে বলা হয় শক্তি। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকদের সম্বন্ধের ফলে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সম্পত্তির একমাত্র মালিক। [৯]

ব্যক্তি সম্বন্ধে এত উচ্চ ধারণা পোষণ করা সত্ত্বেও রুশো ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষণের কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নি। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মতে, রুশোর উপরিউক্ত মতবাদে সূক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণে পরস্পর বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত, ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় তাহলে সম্প্রদায় বা রাষ্ট্রের হাতে তার সম্পূর্ণ অধিকার তখনই ত্যাগ করতে পারে, যদি তার ব্যক্তিগত অধিকার কোন ভাবেই ক্ষুন্ন না হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকার তো ক্ষুন্ন হয়েছেই, অধিকন্তু তাকে সাধারণের ইচ্ছার উপরই তার সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিতে হয়েছে।

....

[৯] ঐ, পৃ. ২৭-২৮

দ্বিতীয়ত, মানুষের মনে যদি সর্বসাধারণের উপকার করার মত কোন সৎ প্রবৃত্তি না থাকে, তাহলে তার আত্ম-অহংকার কিছুতেই তাকে এভাবে আত্ম-সমর্পন করতে দেবে না। কাজেই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে রাষ্ট্র বা তার সার্বভৌমত্বে পৌঁছা রুশোর পক্ষে যুক্তিসংগত হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে, রুশো তার মতবাদের সমর্থনে কোন যুক্তি উপস্থাপন করেন নি। মরমীবাদীদের মত এক বিশেষ ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে তিনি তাঁর দার্শনিক মতবাদ গড়ে তুলেছেন। যদিও তাঁর জোরালো ভাষার আবেদনে ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লব সহজে ঘটতে পেরেছিলো। তার পশ্চাতে কারণ ছিল দীর্ঘদিনের নির্যাতিত মানবতার মুক্তির প্রয়াস। তবুও যুক্তির নিক্তিতে বিচার করলে তাতে নানা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।

দেওয়ান আজরফের মতে, উদার নৈতিক মতবাদ বা সামাজিক চুক্তি মতবাদের মধ্যে ব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণার বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিকে কল্পনা করা হয়েছে একক ও সম্বন্ধহীনভাবে। মনোবিজ্ঞানের জগতে যেমন হয়েছে আনবিক মনস্তত্ত্বের সূত্রপাত তেমনি মানুষকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, স্বার্থবাদী জীবরূপে গ্রহণ করে এই নব্য–ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ দুনিয়ার ইতিহাসে এক নতুন চিন্তাধারার সুত্রপাত করে। উদারনৈতিক মতবাদের আলোচনা হতে দেখা যায় কোনও বিশেষ সময়ে এক শেণির মানুষের আধিপত্য বিস্তারের ফলে দেশের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদিত দ্রব্য অপব্যবহার হয়। সেই বিশেষ শ্রেণি তাদের নিজের স্বার্থ বাস্তবায়নে সে অতিরিক্ত দ্রব্যকে ব্যবহার করার ফলে শ্রেণি সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। তখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমতা সাধনের জন্য ব্যক্তিকে দিতে হয় অবাধস্বাধীনতা। সে অবাধ স্বাধীনতার ফলে কোন বিশেষ শ্রেণি আর শোষণের সুযোগ পায় না। তার জন্য মানুষের আসল প্রকৃতির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে এক নতুন দর্শনের সৃষ্টি হয়। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ভাষায় সে দর্শনের ভাবার্থ এই:

> মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর। তার উৎপাদনের প্রাথমিক কারণ অভাবের নিরসন হলেও উদবৃত্ত থেকে সে স্বভাবতবই মুনাফা করতে চায়। সে সুযোগে বাঁধা উপস্থিত হলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ হয়ে পড়ে অনিবার্য। সেই সংঘর্ষ এড়াতে হলে মানুষের স্বাধীনতার কোন সীমারেখা টেনে দেয়া

> সঙ্গত নয়, তাকে দিতে হয় তার নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রনের অধিকার। তা পেলেই সে তার অভাব নিরসনের জন্য যেমন করবে পর্যাপ্ত উৎপাদন তেমনি সে উদ্বৃত্তকেও সে তার নিজের সুবিধার জন্য ব্যবহার করবে। এই দার্শনিক মতবাদের নীতি হলো ব্যক্তিকে একা থাকতে দাও। [১০]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মনে করেন উপরিউক্ত নীতি 'ব্যক্তিকে একা থাকতে দাও' এটা গ্রহণ করার ফলে সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে আর একটি নুতন চিন্তা-ধারার সৃষ্টি হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছে ধনতন্ত্র।

ধনতন্ত্র:

উদারনৈতিক মতবাদই পরিশেষে তার লক্ষ্য চ্যুত হয়ে এক বিকৃত মতবাদ ধনতন্ত্র নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে উদারনৈতিক মতবাদ থেকে নুতন মতবাদের সৃষ্টি করা হলো, সে মতবাদেও ত্রুটি দেখা যায়। ফলে এ মতবাদ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আবার মানুষের মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষ শুরু হয়। এ মতবাদের কল্যাণে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে তাদের ইচ্ছে মত মূলধন খাটিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে করে রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছের মতো অবস্থায় পরিণত হয়। দেশের সমস্ত সম্পদ অল্প দিনের মধ্যে নিজেরা কুক্ষিগত করে নেয়।

তখন তারা নিজের দেশের বাইরেও ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে। এর রক্তরাঙ্গা ইতিহাস পাওয়া যায় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় জাতিগুলোর ইতিহাসে। ইউরোপীয় জাতিগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবসা–বাণিজ্যের উপলক্ষে ছড়িয়ে পড়ে শাসন ও শোষণ করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষের বুকের রক্ত শুষে নিয়েছে।

---

[১০] ঐ, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কোন এক বিশেষ ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই অপর দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বিদেশের মানুষকে শোষণ করতে হলে নিজ দেশের মানুষের মধ্যে দলীয় মনোভাব বা জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হওয়া দরকার।

স্বদেশের মানুষের সম্মতি ব্যতীত বিদেশের মানুষকে শোষণ করা যায় না। তাই পুঁজিপতিরা দেশের মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হলে পুঁজিপতি মনোভাব আরও প্রবল হয়। ধনতন্ত্র বিকাশের প্রথম পর্যায়ে দেশে বিদেশে মূলধন বিস্তার করতে থাকে। বিশেষত শিল্প বিপ্লবের পর ইউরোপীয় দেশগুলো উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। কিন্তু এক পর্যায়ে মূলধন খাটানোর আর সুবিধা থাকে না, তখন ধনতন্ত্রবাদীরা বুঝতে পারে তাদের অভ্যন্তরীণ গলদ। যখন দেশের টাকা বিদেশে খাটিয়ে পরের সম্পদ আত্মসাৎ করার আর কোন রাস্তা থাকে না– যখন নিজের দেশের মজদুর শ্রেণী বিদ্রোহ শুরু করে– "তখন দেশের সুখ–শান্তি আর সুবিধার নামে করতে হয় পশু শক্তির প্রয়োগ।" তাই ধনতন্ত্রের সংকোচনের যুগে তারই প্রতিষ্ঠানিক কৌশল হিসেবে হয় ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি। [১১]

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় উদারনৈতিক মতবাদ বা তার থেকে সৃষ্ট ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ বা সামাজিক চুক্তিবাদে মানব-জীবন সম্বন্ধে ধারণার কোন বিশেষ প্রভেদ নেই। সর্বত্রই মানুষকে ভাবা হয়েছে এককরূপে। আবার ধনতন্ত্রে সেই মানুষকে কেবল এককরূপে ভাবা হয়নি, তাকে ভাবা হয়েছে স্বার্থপররূপে; অথচ মানব জীবন হচ্ছে এসব মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক। এ সম্পর্কে আজরফ বলেন:

[১১] ঐ, পৃ. ২৯-৩০

মানব জীবন নিয়ে আলোচনা করলেই দেখা যায় মানুষ সব সময়েই যুথচারী জীব। জীবনের আদি পর্যায়েই সে অপরের সঙ্গ কামনা করে। কোন দুর্বিপাকে সে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে জীবন তার কাছে হয়ে পড়ে দুর্বিসহ। সে কেবল অপরের সঙ্গই কামনা করে না, অপরের মঙ্গল কামনাও সে করে। আত্মরক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা তার জীবনের প্রধান মনোবৃত্তি হলেও প্রেম, দয়া, মায়া, বাৎসল্য, পরার্থপরতা তার জীবনে বিশেষভাবে কার্যকরি। মানুষের মাঝে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকলেও তাদের মধ্যে রয়েছে এক সার্বিক ঐক্য, সে ঐক্যের সুর বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে য়াহুদীদের ধর্মে। [১২]

ইহুদী ধর্ম :

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা ও ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করতে গিয়ে তাঁর 'জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম'- নামক বইয়ে ইহুদী ধর্ম নিয়েও আলোচনা করেছেন। কারণ এ ধর্মেও রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য কিছু আদর্শ নিয়মনীতি রয়েছে। যেগুলো কোন দেশে বাস্তবায়িত হলে দেশ সুশৃঙ্খলভাবে চলতে পারে। আজরফের মতে, ইহুদীদের ধর্মে মানুষের বৃহত্তর সত্তা বিকাশের জন্য নানাবিধ আদেশ রয়েছে। ব্যক্তি ও স্বার্থের সমতা আনয়নের জন্য ইহুদীরা নতুন উপায় গ্রহণ করেছিল। এ সম্পর্কে বৃটেনের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যকডোনাল্ড বলেন:

> বোধ হয় অন্য কোনও জাতীয় আইনে ও আচারে ইসরাইলীদের মত দলীয় এবং ব্যাষ্টি-জীবনের সমতা সাধনের চেষ্টা করেনি। তারা ছিল অনুগৃহীত জাতি, তাদের ধর্ম ব্যষ্টি-কেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও জাতীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। ...(সর্বাবস্থায়ই) তারা ব্যক্তিগত অধিকার অক্ষুন্ন রেখেছে। এ জন্যই মুসার অনুশাসনে বা তাঁর বিভিন্ন ধারায় দাসপ্রথা ও ভীতিপ্রদ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নানাবিধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিদ্যমান। প্রত্যেক সাত বছর অন্তর য়াহুদীদের দাসগুলোকে মুক্তি দেওয়া হয়। বন্ধকা-বন্ধ বস্ত্রাদি প্রত্যেক দিন শেষে ফিরিয়ে দিতে হয়। প্রত্যেক সাত বছরের শেষে মাঠগুলো পতিত রাখতে হয়, যাতে সেগুলো সাধারণের সম্পত্তিরূপে গণ্য হতে পারে। জমিতে চাষীর অধিকার অক্ষুন্ন রাখার জন্য ধর্মীয় ও সরকারী বিধান প্রয়োগ করা হয়।[১৩]

[১২] ঐ, পৃ. ৩০
[১৩] ঐ, পৃ. ৩১-৩২

ইহুদি ধর্মে উপরে উল্লিখিত সাম্যবাদমূলক নীতি থাকলেও ইহুদীদের বাস্তব জীবনে সেগুলোর প্রতিফলন ঘটেনি। ইতিহাসে দেখা যায় এককালে ইহুদীদের মত এরূপ শোষক জাতি পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি ছিল না। তাছাড়া ইহুদীরা পৃথিবীতে কোন পরিপূর্ণ রাষ্ট্রগঠন করেছে এরও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ মিলে না। তবে যদিও ইহুদীদের সাম্যবাদমূলক নীতি বাস্তবায়ন হয়নি, এর জন্য হয়তো তারাই দায়ী, তথাপি তাদের সাম্যমূলক নীতির অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে।

প্লেটো:

ইহুদিদের ধর্মনীতি সমন্বিত রাজনৈতিক পদ্ধতি আলোচনার পর দেওয়ান আজরফ তাঁর আলোচনায় বিশিষ্ট গ্রীক দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্লেটোকে নিয়ে এসেছেন। দার্শনিক প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' নামক গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা আলোচনা করে সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে মানব জাতিকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন যথা:

শাসক শ্রেণি (Guardian class), যোদ্ধা বা সৈনিক শ্রেণি (Solider Class), এবং উৎপাদক শ্রেণি (Producting Class) । প্রথম শ্রেণির কাজ দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করা, ধৈর্যধারী, যুক্তিবান, ও মেধার অধিকারী এবং দার্শনিকদের (Philosopher King) নিয়ে এ শ্রেণি গঠিত। দ্বিতীয় শ্রেণির কাজ হল দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। তৃতীয় শ্রেণির কাজ হলো উৎপাদন কার্য সম্পাদন করা। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন করে সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের করায়ত্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল শাসক শ্রেণির প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না। তারা সবার সাথে মিলেমিশে কলোনীতে জীবন যাপন করবে। এমনকি এখানে স্ত্রীলোক ও সন্তান-সন্ততিগণ সাধারণ সম্পত্তি হিসেবে পরিগনিত হবে। প্লেটোর 'রিপাবলিকে' যে আদর্শ অনুসরণের কথা বলা হয়েছে তাতে পরার্থপরতার প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং তাকে বাস্তব জীবনে বাস্তবায়িত করার বিষয়টি-স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে ভাবতে হবে মানব মনের স্বাভাবিক অহংবোধ থেকে উর্দ্ধে উঠে সেটা কিভাবে

বাস্তবায়িত হবে সে সম্পর্কে প্লেটো কোন দিক নির্দেশনা দেননি। তবে সর্বশেষ বলা যায়, এ রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন অর্থ নেই। কারণ এ রাষ্ট্র জনসাধারণের সমর্থনের উপর গড়ে উঠে না।

মাজদাকঃ

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনায় ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ইরানের মাজদাক নামক এক সম্প্রদায়ের মতবাদ তুলে ধরেছেন। মাজদাকরা মানব-প্রকৃতির পরার্থপরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এক অভিনব মতবাদ চালু করেছিল। সে মতানুসারে, দেশের সম্পদ সকল জনগণ সমানভাবে ভোগ করতে পারবে। তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে বিবাহ প্রথা রদ করার ঘোষণা দিয়েছিল-তাদের মত হচ্ছেঃ ''যেভাবে সকলে বায়ু ও জল উপভোগ করে, সেভাবেই স্ত্রীলোকগণকেও ভোগ করবে।'' [১৪]

তবে মাজদাকরা শুধু যৌন জীবনেরই যৌথানুষ্ঠানের ঘোষণা করেন। কিন্তু তারা অর্থনীতির ক্ষেত্রে যৌথব্যবস্থা করতে পারে নি। তাই তাদের মতবাদ বেশিদিন টিকেনি।

কার্লমার্কসঃ

দেওয়ান আজরফ তাঁর রাজনৈতিক ভাবনায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও উদারনৈতিক মতবাদ কিভাবে ধনতান্ত্রিক মতবাদে পরিণত হল এবং এই ধনতান্ত্রিক মতবাদও পৃথিবীর মানুষকে শান্তি দিতে পারল না এবং শেষ পর্যন্ত কার্লমার্কস এর নতুন চিন্তাধারাও ব্যর্থ হয়েছে, সেটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। কার্লমার্কস আদিকাল থেকে তার সময় পর্যন্ত ইতিহাস ব্যাখ্যা করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে উপরে উল্লিখিত মতবাদের মাধ্যমে মানুষের শান্তি আসতে পারে না। মানুষের মধ্যে যদি সত্যিকারের সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সমাজে শান্তি আসতে পারে। আমরা এখন মার্কসের রাজনৈতিক দর্শন তথা সমষ্টিকেন্দ্রিক মতবাদ বা সমাজতান্ত্রিক মতবাদ নিয়ে আলোচনা করব-

---

[১৪] ঐ, পৃ. ৩৩

কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) দার্শনিক হেগেলের দ্বারা আংশিকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। হেগেল মনে করেন, মানব মন অন্বয় (Thesis),ব্যত্যয় (Antithesis) ও সমন্বয়ের (Synthesis) ধারায় একেবারে পরম সত্তায় এসে স্বস্তি লাভ করে। পরম সত্তায় আর কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এ সব চিন্তার মাধ্যমকে হেগেল গ্রহণ করেছেন অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ বলে। মার্কস এক্ষেত্রে হেগেলের থেকে ভিন্ন পথে অগ্রসর হন। অন্বয়, ব্যত্যয় ও সমন্বয়কে ইতিহাসের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করে মার্কস প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সভ্যতার গতি এ দ্বন্দ্বের ফলে সম্ভব হচ্ছে। কার্ল মার্কস তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যা করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, গুহামানব কিভাবে পশুচারী মানবে পরিণত হয়। আবার যাযাবর কি কারণে কৃষিজীবীতে পরিণত হলো। কৃষিজীবি থেকে সামন্ত শ্রেণি, বনিক শ্রেণি অতপর বনিক শ্রেণি থেকে পুঁজিপতি হয়ে কিভাবে শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণ করে; ফলে শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়। কার্ল মার্কসের মতে, গুহাবাসী মানব তাদের জীবিকার প্রয়োজনে পশুচারণ করতে থাকে। পরবর্তীতে পশুচারী যাযাবর পাথর ঘষে লাঙলের মত একটা অস্ত্র তৈরি করে। তা দিয়ে মাটি খুঁড়ে তাতে বীজ বপন করে দেখল খুব তাড়াতাড়িই তরতর করে চারা গজিয়ে উঠে। এরপর কিছু পশুচারী সমাজের লোক আর পশুচারণ না করে শস্য উৎপাদনে লেগে যায়। তারা যখন শস্য উৎপাদন করে সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করতে থাকে। তখন মাঝে মাঝে পশুচারীরা হামলা করে তাদের শস্য লুট করে নিয়ে যায়, ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধে যায়। আর এ দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয় মানব সমাজ। কাল মার্কস এভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, আদিম কাল থেকে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিলো সে দ্বন্দ্বের ফলে সামন্ত যুগের সৃষ্টি হয়, সামন্ত যুগে যারা খেটে খায় বা মানুষের আহার যোগায় তারা সামন্ত প্রভুদের কৃপার পাত্ররূপে তাদের আজ্ঞাবহ হয়ে দাস শ্রেণিতে পরিণত হয়। এভাবে সামন্ত প্রভু ও দাসশ্রেণি গড়ে উঠে এবং তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এরপর একদল লোক সামন্ত প্রভুদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত দ্রব্য দেশ- বিদেশে রপ্তানি করে তা থেকে লাভবান হয় এবং তারা বণিক শ্রেণি হিসাবে পরিগণিত হয়। বনিক শ্রেণি ব্যবসা-বাণিজ্য করে কিছুটা লাভবান হলে এক পর্যায়ে সামন্ত প্রভুরা বনিক

শ্রেণিকে তাদের উৎপাদিত দ্রব্য ব্যবসার উদ্দেশে দিতে অস্বীকৃতি জানালে, বনিকশ্রেণির সাথে সামন্ত শ্রেণির দ্বন্দ্ব লেগে যায় এবং দাসশ্রেণি সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য বণিক শ্রেণির সাথে যোগ দিয়ে সামন্ত প্রভুদের পরাজিত করে। এর ফলে সমাজে আর এক নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে বণিক শ্রেণির মূলধন যখন অত্যধিক বেড়ে যায় তখন তারা কলকারখানা স্থাপন করে দাস শ্রেণিকে সেই কারখানায় খাটিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করে। যতই নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয় ততই তাদের মুনাফা বাড়তে থাকে। অবশেষে তাদের মূলধন এত বেড়ে যায় যে, তা আর দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয় না। তখন সে মূলধন দেশের বাইরে অন্যদেশে খাটিয়ে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। এভাবে পুঁজিবাদ পৃথিবীতে শোষণ শুরু করে। এ সম্পর্কে দেওয়ান আজরফ বলেনঃ

> মূলধন যত ফেঁপে যায় ততই মুষ্টিমেয় লোকের হাতে দেশের সম্পদ এসে জড়ো হয়। মূলধন বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার অপর একদল মানুষ হড় হড় করে নিবিত্ত শ্রেণিতে পরিণত হয়। এতে আবার নতুনভাবে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। পুঁজিবাদী সমাজের পক্ষে নিবিত্তের শ্রম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাদের শ্রম ব্যতীত কলকারখানা চলতে পারে না। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করলে তারা শ্রম করতে চায়না। একেবারে আহার যোগানো বন্ধ করলেও তারা মারা যায়। তাই তাদের রাখা হয় জীবন্মৃত অবস্থার মধ্যে। খাওয়া-পরা ও প্রজননের ব্যবস্থা করে দিয়েই মালিক তাঁর কর্তব্যের শেষ মনে করেন। অপরদিকে পুঁজিপতির পুঁজির সঙ্গে শ্রম যুক্ত হয়েই এ সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন সম্ভব হয়। [১৫]

উৎপাদনের জন্য তাই দু'য়েরই যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে, কিন্ত বন্টনের বেলায় শ্রমিকের কৃতিত্ব করা হয় সম্পূর্ণ অস্বীকার। তার ফলে বঞ্চিত শ্রমিকেরা কালে সংঘবদ্ধ হয়ে মালিকের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়, পুঁজিবাদীর বিলাস-সৌধ চূর্ণ করে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের করে প্রতিষ্ঠা।

[১৫] ঐ,পৃ.৩৭

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর জীবন সমস্যার সমাধান নামক বইয়ে মার্কসের বক্তব্য তুলে ধরেন:

> সমাজতন্ত্রকে যদি বলা যায় হেগেলীয় দর্শনের Being, তাহলে ধনতন্ত্রকে বলা যায় Non-Being এবং সমাজতন্ত্রকে বলা যায় Becoming, সামন্ততন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলেই সৃষ্টি হয় নির্বিত্তশ্রেণি। সেই নির্বিত্তশ্রেণির কল্যাণের জন্য সমাজতন্ত্রই একমাত্র পন্থা। তার জন্য চাই রক্ত-বিপ্লব। মার্কস এঙ্গেলস এর সর্বশেষ বাণী:' সর্বদেশের মজুরশ্রেণি সংঘবদ্ধ হও'। [১৬]

কালমার্কস যে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন তা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিকে তার অধিকার ত্যাগ করতে হবে। এখানে রাষ্ট্রই হবে সমস্ত কাজ-কর্মের কেন্দ্রস্থল। এই রাষ্ট্রের নীতি হবে 'প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবে এবং তার প্রয়োজন অনুসারে ভোগ করবে'। বৃহত্তর মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে যখন মানুষ তার স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সকল কাজ-কর্মই নিজের এবং সবার জন্য করতে শিখবে, তখন রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন থাকবে না। তাই মানুষকে পরার্থপর করার জন্য সাম্যবাদী আদর্শের রাষ্ট্রকে করতে হবে সব ক্ষমতার অধিকারী। প্রতিক্রিয়ার কোন সুযোগই যাতে এর মধ্যে স্থান না পায় সে জন্যই প্রত্যেক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের জন্য সমস্ত কিছু বিলিয়ে দেবার মন মানসিকতা নিয়ে জীবন-যাপন করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এসব শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়িত হলে মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রয়োজন আপনা-আপনি ফুরিয়ে যাবে । মানুষের বৃহত্তর সত্তার প্রকাশের জন্য আর কোন শক্তির প্রয়োজন হবে না।

কিন্তু পরবর্তীতে মার্কস এর এই তত্ত্বও ভুল প্রমাণিত হয়েছে ।

১) মানুষ পুরোপুরিভাবে তার স্বার্থকে ত্যাগ করতে পারে না;

২) তাই একটা নির্দিষ্ট সময় পর মানুষ আর ভালভাবে কাজ কর্ম-করতে চায় না।

---

[১৬] ঐ, পৃ. ৩৭

ফলে রাষ্ট্রের-অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমে খারাপ হয়ে পড়ে। তাই মার্কস এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলো বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনি। দু'একটি রাষ্ট্র নাজুক অবস্থার মধ্যে দিয়ে টিকে রয়েছে। বাকী রাষ্ট্রগুলো ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে।

টলস্টয় বা নব্যখ্রিষ্টবাদঃ

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিকাংশ সৎ রাষ্ট্র চিন্তাবিদদের নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করেছেন। রাষ্ট্র নিয়ে যাঁরা সুচিন্তিত মতবাদ দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন টলস্টয়। তাঁর প্রচারিত মতবাদ হচ্ছে নব্যখ্রিষ্টবাদ। টলস্টয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মানব সভ্যতার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি পর্যালোচনা করে তাঁর মতবাদ তুলে ধরেন। উনবিংশ শতাব্দীর ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি তিন ধরণের সমস্যা দেখতে পেয়েছিলেন যথা:

১। ব্যক্তিগত মালিকানা;

২। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধরে রাখার জন্য নানাবিধ কলকারখানা বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা;

৩। আর এসবের পিছনে কাজ করেছে খ্রিষ্টের প্রতিষ্ঠিত পথ থেকে দূরে সরে পড়া;

বিখ্যাত দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী টলস্টয় নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, রাষ্ট্রে যত রকমের সমস্যার সৃষ্টি হয় এর মূলে প্রধান ভূমিকা রাখে ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তিনি সেই সময়ের রাষ্ট্র পদ্ধতি সম্পর্কে আক্ষেপের সুরে বলেছেন:

> চোরাই মালের মস্তবড় আড়তদার আমাদের রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রই বর্তমানের সমস্ত সামজিক অবিচারকে বুকের তলায় আগলে রাখে। এর মূলে রয়েছে সেই ব্যক্তিগত মালিকানা। সেই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র বর্বরজনচিত জুলুমের ঘেরাজালে দেশকে দেশ ঘিরে ফেলেছে। এর জন্যই আইন-কানুনের সৃষ্টি, এর জন্যই পুলিশের লোক, সৈন্যসামন্তের প্রয়োজন। [১৭]

---

[১৭] ঐ, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

টলস্টয় মনে করেন, এই ব্যক্তিগত মালিকানা রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো আদর্শের বলে হঠাৎ বিলুপ্ত হবে না অথবা বিপ্লবীদের মত তা'ব্যক্তির হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া যাবে না। এই সমস্যার সমাধান হতে পারে যদি মালিক স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তার বিত্ত বা সম্পদ আপনি ত্যাগ করে, তা হলেই বিত্তশালী ও বিত্তহারার ব্যবধান ঘোচানো সম্ভব। আর এজন্য ধনীকে তার সম্পদের অহংকার ত্যাগ করতে হবে। শিল্পীকে সর্ব সাধারণের চিত্র আঁকতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জনের উপর নির্ভর করে জীবন-যাপন করতে হবে। জীবনের মূল প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে কিছুই গ্রহণ করবে না। টলস্টয় এর এ মতবাদকে ধর্মীয় সমাজতন্ত্র বলা যেতে পারে। কারণ আদি-খ্রিষ্ট ধর্মের প্রেরণায় ব্যক্তি যখন তার প্রয়োজনাতিরিক্ত আর কিছু গ্রহণ করবে না, তখনই হবে আদর্শ সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা-তখন মানুষে মানুষে আর কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না। এ পৃথিবী হয়ে পড়বে সুখরাজ্য। উপরের আলোচনায় দেখা যায়, টলস্টয়ের চিন্তাধারায় দুস্থ মানবতার জন্য অতীব দরদ ফুটে উঠেছে; কিন্তু তিনি ব্যক্তির স্বাধীনতার সাথে তাঁর মতবাদের সামঞ্জস্য তৈরী করতে পারেন নি। তাই তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। দেওয়ান আজরফ মনে করেন, যে কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্রুটি-বিচ্যুতি আবিষ্কার করে সমালোচনা করতে পারি কিন্তু তার গঠনমূলক সমাধান দিতে না পারলে কোন মতবাদ কখনও প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

গান্ধীবাদঃ

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর মতবাদ নিয়েও আলোচনা করেছেন। মহাত্মা গান্ধীও একটি আদর্শের ভিত্তিতে সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন টলস্টয়ের ভারতীয় শিষ্য। পূর্বেই উল্লেখ করেছি টলস্টয় ছিলেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার ঘোর বিরোধী। তিনি মনে করতেন ব্যক্তিগত সম্পত্তিই পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির মূলে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করে। মহাত্মা গান্ধীও ব্যক্তিগত সম্পদের দিকে তাকায়নি। চরকায় সুতা কেটে কাপড় বুনে নিজে

পরতেন এবং অপরকে পরবার ও জীবিকা অর্জনের পরামর্শ দিতেন। গান্ধীজীর দর্শন ছিল শান্তি, অহিংসা, অসম্প্রদায়িকতা এবং সমতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন। কিন্তু স্বার্থপরতা মানুষের একটি অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি। তাই মানুষের পক্ষে পরের উপকারের জন্য নিজের সব অধিকার পুরোপুরি ত্যাগ করা, কোন কালেই সম্ভব হয়নি। শুধু আত্মিক শক্তির বলে ইন্দ্রিয় জয় করা সব সময় সম্ভব হয়না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বার্থপরতা মাথা তুলে দাঁড়ায়। ফলে মুখে সাম্যবাদ প্রচার করলেও তার দ্বারা মানুষের শোষণ বন্ধ হয় না। তাছাড়া স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে আদর্শিক সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠন করা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। অপর পক্ষে, গান্ধীজী ব্যক্তি-চেতনা ও সমষ্টি চেতনা বা সাম্যবাদের চেতনার মধ্যে যে বিরাট ফাঁক রয়েছে তাঁর যোগ সূত্র আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সফল হননি এবংএ লক্ষ্যে তিনি পুরোপুরি দিক নির্দেশনাও দিতে পারেন নি। তাই সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে গান্ধীর রাষ্ট্রীয় দর্শন ব্যর্থ হয়েছে।

তাই দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ রাষ্ট্র সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদসমূহ যেমন-ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, সামাজিক চুক্তিবাদ, ধনতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদ (মার্কসবাদ), টলস্টয় এর নব্যখ্রিষ্টবাদ, গান্ধীবাদ ইত্যাদি মতবাদগুলো তাঁর রচিত 'জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম' নামক বই এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে এগুলোর সুবিধা-অসুবিধা তুলে ধরার পর তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, এসব মতবাদের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। এর প্রত্যেকটি মতবাদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেমন অসুবিধা তেমনি বাস্তবায়নের কিছুদিন পরই আবার মানুষের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয় এবং সেখানে মারামারি-হানাহানি শুরু হয়। ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাই এক্ষেত্রে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মতে, আলোচ্য বিশৃঙ্খল অবস্থার হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রধান উপায় (প্রেসক্রিপশন) হচ্ছে ইসলামিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যদি ইসলামি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে যে কোন রাষ্ট্রে মানুষ সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি সহকারে জীবন-যাপন করতে পারবে। তাই তাঁর মতে, মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হলে তার ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজ জীবন আগে ভালভাবে গঠন করতে হবে।

ইসলামি গণতন্ত্র ও সামাজিক সুবিচার: দেওয়ান আজরফের মতে, ইসলামের ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের জন্য কোন পৃথক আইন নেই। আদেশ রয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহর আদর্শে জীবন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। জনাব রাসূলে আকরাম (সা:) বলেছেন- 'তাখাল্লাকু বি আখ-লাকিল্লাহ'' আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও। সে আদেশ ব্যক্তি-জীবনের পক্ষে যেমন প্রযোজ্য, সমাজ-জীবন ও রাষ্ট্র জীবনের পক্ষেও তেমনই সমানভাবে প্রযোজ্য। এ সম্পর্কে দেওয়ান আজরফ বলেন:

> ব্যক্তি যেমন আল্লাহর আদর্শে জীবন গঠন করবে, তেমনি সমাজ বা রাষ্ট্রও গঠিত হবে আল্লাহর আদর্শেই। ইসলামের নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজ ও রাষ্ট্রে আদর্শরূপে গড়ে তোলা। সমাজকে রাষ্ট্রের মধ্যে বিলীন করে দেওয়ার জন্য ইসলামের কোন আদর্শ না থাকলেও ইসলামের শাসন অনুশাসন যাতে সর্বদা সহজভাবে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে চালু হতে পারে তার জন্য রয়েছে পরিষ্কার নির্দেশ। সালাত, সিয়াম হজ্জ, যাকাত প্রভৃতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত জীবনের বিশুদ্ধি, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ব্যক্তি জীবনকে সংঘ-জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী করে তোলা।[১৮]

আজরফের মতে, রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বাস্তব রূপ দিতে হলে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজ জীবন আগে ভালভাবে গঠন করার জন্য ব্যক্তিকেই ঈমানের পাশাপাশি সালাত, সিয়াম, হজ্জ, কুরবানী ও যাকাত এবং প্রয়োজন বোধে দেশের জন্য জিহাদ করতে হবে। এখানে প্রথমেই ঈমানের মাধ্যমে ব্যক্তির জীবনে এ বিশ্বাস পুরোপুরি আসতে হবে যে, দুনিয়ার সমস্ত কিছুর মালিক আল্লাহ। মানুষ হচ্ছে আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ তার দেওয়া সমস্ত কিছু শুধুমাত্র ভোগ করবে, এর মালিকত্ব দাবি করতে পারবে না।

---

[১৮] ঐ, পৃ. ৮০

সালাত শব্দের অর্থ কেবল উপসনা নয়, এর অর্থ হচ্ছে যে সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম সৃষ্টিকর্তার আদেশ-নির্দেশের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ। সালাতের মূল লক্ষ্য হচ্ছে:

(১) জীবনকে নানা রিপু বা প্রবৃত্তি (লোভ-লালসা) ইত্যাদি অসৎ প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে সম্পূর্ণমুক্ত হয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হবার প্রস্তুতি গ্রহণ। এবং

(২) আল্লাহর গুণাবলি জগতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে নেতার (খলিফার) নেতৃত্বে একসাথে কাজ করা। এ সালাতের মধ্যে ইসলামের অপরাপর কর্তব্যের মত দুটো দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে পারমার্থিক দিক, অপরটি হচ্ছে সামাজিক দিক। সামাজিক দিক থেকে দেখা যায়-এতে সকল মুসলমানকে দিনে পাঁচবার একত্রিত হওয়ার তাগিদ রয়েছে। রাসূল (সা:) নির্দেশ দিয়েছিলেন- 'যদি কেউ মসজিদে সালাত আদায় না করে বাড়িতে আদায় করে তাহলে তার ঘর পুড়িয়ে দাও।' এতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় সালাতের অন্যতম উদ্দেশ্য মুসলানদের একত্রিত করা। মুসলমানের জীবনে ঐক্য, প্রেম, মৈত্রী ও সৌহার্দ প্রভৃতি সৃষ্টির জন্য তাদের প্রত্যেককে দিবা রাত্রিতে অন্তত পক্ষে পাঁচবার একত্রিত করাই হচ্ছে সালাতের সামাজিক গুরুত্ব। এভাবে মসজিদে একত্র হয়েই হুজুর (সা:) এবং তার সাহাবীরা বিভিন্ন-কানুন, সৃষ্টি তত্ত্ব বা এ দুনিয়া বিকাশের আদি কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করতেন। তারা মসজিদে নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতেন। কাজেই এ দুনিয়ার নানা বিষয়ে খাঁটি জ্ঞান লাভের জন্য সালাত সম্পাদন উপলক্ষে মসজিদে সমবেত হওয়া মুসলমানদের জীবনে অবশ্য কর্তব্য ছিল। অপরদিকে, মাবনজীবনের পূর্ণ আত্মসমর্পনের মাধ্যমেই আল্লাহর পরিচয় ও সান্নিধ্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। মুসলমান ঘরবাড়ি ছেড়ে মসজিদে এসে পূর্ণ আত্মসমর্পনের মাধ্যমেই আল্লাহকে রাজি খুশি করে তাকে এ জগতে পাঠানোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারে, এটা হচ্ছে সালাতের পারমার্থিক দিক।

Dhaka University Institutional Repository

সওম শব্দের অভিধানগত অর্থ হচ্ছে নিবৃত্তি। জৈবিক কামনার প্রাবল্য বা উত্তেজনার মূল কারণ হচ্ছে কু-প্রবৃত্তি বা পানাহার । তাই পানাহার না করে পাশবিক শক্তিতে পরাভূত করে আয়ত্তাধীন করা হচ্ছে সওমের সূক্ষ্মতম তাৎপর্য। এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় সাওমের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে জৈবিক প্রবৃত্তির দমন ও উন্নততর প্রবৃত্তির বিকাশ। দেওয়ান আজরফের মতে, সওমের আদেশ তো একা একা পালনের ক্ষেত্রে যে কোন মাসেই হতে পারত। কিন্তু এটা বৎসরের বিশেষ কোনো মাসে একত্রে পালনের নির্দেশ কেন এলো- এক্ষেত্রে বলা যায় আল্লাহর উদ্দেশ্য কেবল ব্যক্তি জীবনের সংশোধন নয়, গোটা মানবজাতির আত্মার পরিশুদ্ধি। এজন্য একটা নির্দিষ্ট চন্দ্রমাসে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী সব মানুষের জন্যই সওমকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে নির্দেশ এসেছে। সব মানুষ যাতে একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের জৈবিক প্রবৃত্তিকে দমন করে প্রকৃত মানবিক চরিত্র বিকাশ করে বিশুদ্ধ মানবজীবন তথা মুসলিম জীবনে সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে এ দুনিয়ায় সুখ শান্তিতে বসবাস করতে পারে সওমের মধ্যে তার ইঙ্গিত রয়েছে। তাছাড়া, এ দুনিয়ায় মানুষের মধ্যে জন্মগত তারতম্য রয়েছে যেমন-কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত, কেউ কালো, কেউ সাদা, কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র কেউ শক্তিশালী, কেউ দুর্বল। সবার প্রতি রয়েছে আল্লাহর সমান স্নেহ, করুণা, সহানুভূতি ও ভালোবাসা; অথচ মানুষ এত বেশি আত্মকেন্দ্রিক যে, সে অপরেরর জন্য ভাবতে পারে না। এজন্য সে যাতে গরিবদের অর্থাৎ যারা একবেলাও পেটপুরে আহার করতে পারে না, তাদের দু:খ কষ্ট অনুভব করতে পারে অর্থাৎ ধনী-দরিদ্র সবাই যেন ক্ষুধার তাড়না উপলব্ধি করতে পারে তার জন্য রমজান মাসে দিনের বেলা পানাহার নিষেধ করা হয়েছে। অন্যদিকে, সওম রত মানুষ সর্বাবস্থায় বুঝতে পারে তার অধিকারে ধন সম্পদ থাকলেও সেগুলোর যতেচ্ছা ব্যবহার বা ভোগ করার অধিকার তার নেই। তাকে সেগুলো ভোগ করতে হবে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশ মত। অর্থাৎ সেগুলোর প্রকৃত মালিক সে নয় সেগুলোর মালিক আল্লাহ সুবহানাআ'আলা।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে হজ্জের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে । হজ্জ ব্রত পালনের মাধ্যমে মানবের কল্যাণের কথা বলা হয়েছে। হজ্জব্রত পালন উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশ থেকে নানান ভাষার লোকেরা এসে একত্রিত হয়, তাদের মধ্যে পরিচয় ঘটে এবং ভাবের আদান-প্রদান হয়। ফলে তাদের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ গড়ে উঠে। আল্লাহর অভিপ্রায় অনুসারে যাঁরা হজ্জব্রত পালন করবেন তাঁরা একেশ্বরবাদের স্বাদ পাবেন এবং পরস্পরের সঙ্গে তারই মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলে বিশ্ব জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হবে। হজ্জের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর তাওহীদের প্রতিষ্ঠা। তাওহীদের স্বার্থকতা হচেছ মানুষের সাথে মানুষের ভেদাভেদের বিলোপ সাধন। একই আল্লাহর বান্দা হিসেবে দুনিয়ার সব মানুষই সমান। কুরআনুল করীমে তাওহীদের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ তওহীদ ও তার আনুষঙ্গিক নানাবিধ গুণের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সংস্রবও বর্তমান।

হজ্জের মত কুরবানীর মাধ্যমেও বান্দার মধ্যে বিভিন্ন যোগ্যতার সৃষ্টি হয়। কুরবানীর মাধ্যমেও দুটো যোগ্যতা বান্দার মধ্যে আসে- যেমন:

(১) আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্য;

(২) ত্যাগ স্বীকার;

কুরবানীর মূল তাৎপর্য কুরআনের মধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে '' কুরবানী পশুর গোশত অথবা উহাদের রক্ত আল্লাহর নিকট উপনীত হয় না বরং তোমাদের সংযমই উপনীত হয়ে থাকে।'' কাজেই আজরফের মতে, কুরবানী শুধু পশু হত্যার নিষ্ঠুরতম অনুষ্ঠান নয়। এতে প্রিয় পশুকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করাতে দৃঢ়চিত্ততা, কর্তব্যবোধ ও সংযম বা ত্যাগ স্বীকারের অনুশীলন করা হয়।

যাকাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্বত:প্রণোদিত হয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ বা অন্য কোন সম্পদ আত্মার কল্যাণের জন্য দান করা। কুরআনুল-করীমের নির্দেশ ও আল্লাহর রসূলের ব্যাখ্যা-সোনা-রুপা বা টাকা পয়সা যাদের কাছে সঞ্চিত থাকবে তাদের পক্ষে শতকরা আড়াই ভাগ

Dhaka University Institutional Repository

রূহের বিশুদ্ধির জন্য দিতে হবে। তবে আজরফের মতে, দানকে সর্বাবস্থায় ইনকাম ট্যাক্স্ বলে গণ্য করা যাবে না। এ ট্যাক্স্ হচ্ছে রূহের বা আত্মার বিশুদ্ধির জন্য।

জিহাদের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম বা অবিরাম চেষ্টা বা সাধনাতে নিরন্তর হওয়া। তবে সাধারণত জিহাদ বলতে ইসলামকে এ বিশ্বে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামকে বুঝায়। তবে ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানব জীবনকে সুন্দর-সরল ও কল্যাণময় পথে পরিচালনার জন্য যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, অবিরাম সংগ্রাম করে সে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করাই হচ্ছে জিহাদের মূল লক্ষ্য। যথা,

(ক) প্রতিকুল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম;

(খ) দৈহিক নিরাপত্তার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম;

(গ) সামাজিক বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম;

(ঘ) মানবজীবনের কু -প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং

(ঙ) স্বীয় নফস্ ও কু -প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা জিহাদ করা।

সুতরাং জিহাদ বলতে শুধু এক দেশের বা জাতির বিরুদ্ধে অন্য দেশের বা জাতির যুদ্ধকে বুঝায় না বরং উপরের আলোচ্য বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আদর্শ মানুষ হওয়াকেই ব্যাপক অর্থে জিহাদ বলে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত ও জিহাদ প্রভৃতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে - ব্যক্তিগত জীবনের বিশুদ্ধি এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে - ব্যক্তিজীবনকে সংঘবদ্ধ জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত করে তোলা।

দেওয়ান আজরফ মনে করেন, উপরের গুণাবলিগুলো (সালাত, রোজা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ) কোন মানুষ জীবনে পালন করলে তার ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবন ভালোভাবে গঠিত হবে এবং সে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে পরিগণিত হবে। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ যে ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতির কথা বলেছেন সেটি পরিচালনার জন্য উপরের গুণাবলি সম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

দেওয়ান আজরফ ইসলামের আলোকে তাঁর রাজনৈতিক ধারণা ব্যক্ত করেছেন। ইসলামে রাষ্ট্রকে ধারণা করা হয়, মানুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর বিধান ও শাসনকে বাস্তবায়িত করার এক মাধ্যম বলে। কুরআন-উল- কারিম ও হাদীস শরীফে বর্ণিত নীতিগুলিকে রাষ্ট্রের মাধ্যমে রূপায়িত করাতেই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা নিহিত। এজন্য তাকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। তবে রাষ্ট্রের অধিবাসী মানুষের স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে অবদমিত করে রাষ্ট্রকে সমালোচনার উর্ধ্বে কোনো প্রতিষ্ঠান বলে গন্য করা হয় না। একে একটা মধ্যপন্থী ধারণা বলে গন্য করা যায়। মানবজীবনকে পূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্য কুরআন-উল-করিমে সেই সব উপায় ও পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য একে মানব জীবন বিকাশের এক মস্ত বড় উপায়ও বলা যায়।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মতে, নবী করিম (স:)এর জীবন সংস্কৃতিতে এই সব বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। হুজুর (স:) এর জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া অর্থাৎ ইনসানে-ই-কামিল বা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়া। এ স্তরে উপনীত হলেই মানুষের পক্ষে আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে তাঁর জগৎকে শাসন করার যোগ্যতা অর্জিত হয়। এই পন্থা অনুসরণের দ্বারাই মানব সমাজের তথা রাষ্ট্রের প্রজা-সাধারণের মধ্যে সমতা বিদ্যমান হবে বলে তিনি মনে করেন। মানব-জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তি এর মধ্যেই নিহিত বলে তিনি বিশ্বাস করেন। মানুষ যদি আল্লাহর হুকুমকে পুরোপুরিভাবে মেনে চলে এবং ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সমাজ জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে তার বাস্তবায়ন ঘটায় তাহলে একটা সুন্দর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানমূলক পরিবেশ বাস্তবায়ন সম্ভব বলে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ধারণা। ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়নে সর্বদা আত্মনিবেদিত থেকে তিনি তার লেখনির মাধ্যমে জগৎকে সমৃদ্ধ করার চেষ্ঠা করেছেন । তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিলো–বিশ্বের

Dhaka University Institutional Repository

সব মানুষকে ইনসানে কামিল বা মর্দ্দে মুমিন–এ উন্নীত করা এবং মানুষের মধ্যে সব ধরনের সদগুনাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা । এ ধরনের কল্যাণমুলক ইসলামি রাষ্ট্র গঠনে তিনি সমর্থন যুগিয়েছেন এবং আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করেছেন । ইসলামি ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতি সম্পুর্ণরূপে শ্রদ্ধাশীল থেকে তিনি বিশ্ব মানুষের মুক্তির কথা ভেবেছেন , সব ধরনের শোষণ বঞ্চনার অবসান কামনা করেছেন । এ সম্পর্কে তিনি বলেন:

> আল্লাহ সুবহানাতায়লা নবী করিম (স:) কে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে । তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ ২৭ রমজানে রাতে হেরা পর্বতের গুহাতে ফেরেসতা জিব্রাইলের মারফতে কুরআন-উল-করিম এ দুনিয়ায় নাজেল হয়েছে এবং সে কুরআনের বাণী এ সৌরমন্ডলের সকল বস্তুর কাছেও নাজেল হয়েছে । এ কুরআনুল-করিমের প্রদর্শকরূপে আল্লাহ তাঁকে যেমন এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, তেমনি এ দুনিয়ার মানুষকে মর্দ্দেমুমিন করে এ বিশ্ববিধান সত্যিকার ইনসান-ই-কামেল করে আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে এ সংস্থায় প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য । সুতরাং মানুষকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করে তুললেই সে আল্লাহর প্রতিনিধি হতে পারে এবং সে প্রতিনিধি লাভ করেই সে এ দুনিয়াতে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে । আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা হলেই মানুষে মানুষে আর দ্বন্দ্ব কোলাহল থাকবে না, মানুষের মধ্যে প্রেম, মৈত্রী ও ভালবাসার সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। মানুষের স্থান ফেরেশতাদের চেয়েও আরও উন্নত হবে এবং এ দুনিয়া হয়ে উঠবে একটি আদর্শিক স্থান ।[১৯]

498722

ইসলামে জীবন পরিচালনার সময় সর্বক্ষেত্রে একই আইন প্রযোজ্য । এখানে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য আলাদা কোন আইন নেই। এ সম্পর্কে দেওয়ান আজরফ বলেন :

> ইসলামের ব্যক্তি- জীবন ও সমাজ-জীবনের জন্য কোন পৃথক আইন নেই। আদেশ রয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহর আদর্শে জীবন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। জনাব রাসূলে আকরাম (স:) বলেছেন– 'তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ।' আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও। সে আদেশ ব্যক্তি জীবনের পক্ষে যেমন প্রযোজ্য, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্র জীবনের পক্ষেও তেমনই সমানভাবে প্রযোজ্য।

[১৯] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১৭ জুন ১৯৯১, ১৩, আষাঢ় ১৪০৬, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

সোজা কথায়, ব্যক্তি যেমন আল্লাহ্‌র আদর্শে জীবন গঠন করবে , তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হবে আল্লাহ্‌র আদর্শেই। ইসলামের নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজ ও রাষ্ট্রে আদর্শরূপে গড়ে তোলা। সমাজকে রাষ্ট্রের মধ্যে বিলীন করে দেওয়ার জন্য ইসলামের কোন আদর্শ না থাকলেও ইসলামের শাসন-অনুশাসন যাতে সর্বদা সহজভাবে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে চালু হতে পারে ,তার জন্য রয়েছে পরিষ্কার নির্দেশ। [২০]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ভাবনায় যে রাষ্ট্রের রূপরেখা ছিল তা গঠিত হবে মদীনা সনদের আদলে। যে সনদকে পৃথিবীর সর্বপ্রথম সুন্দরভাবে লিখিত কোন রাষ্ট্রীয় সংবিধান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর রচিত 'জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম' নামক বই-এ মদীনা সনদের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম তুলে ধরে ইসলামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপরেখা দেবার চেষ্টা করেছেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ভাষায়:

'' মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর জীবনের অধিক ভাগই দুধর্ষ কুরাইশ জাতির সঙ্গে নানাবিধ যুদ্ধে অতিবাহিত হয়। কুরাইশদের বিরোধিতার সঙ্গে দেয় য়াহূদীদের বিশ্বাসঘাতকতা। তা সত্ত্বেও তিনি কোন জাতির বা ধর্মাবলম্বীর কোন মতামতের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করেননি। মদীনাতে হিজরত করার পরে তিনি যে রাষ্ট্র গঠন করেন, তাতে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সে মর্মবাণীই ফুটে উঠেছে। মদীনা সনদের প্রথম কথাই হলো- মদীনার য়াহূদী, পৌত্তলিক এবং মুসলমান সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে, কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না। [২১]

---

[২০] প্রাগুক্ত, জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম,পৃ. ৮০
[২১] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ঐ, পৃ. ১০৩-১০৪

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং মদীনা সনদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে হুজুর (স:) এর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে মুসলিমেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সংখ্যালঘু ইহূদী ও পৌত্তলিকদের নামই প্রথমে বলা হয়েছে। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে–সেই সময়ে নানাবিধ অত্যাচার ও অনাচারের যুগে ইসলামি রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হতো। মদীনা সনদে সংখ্যাগুরু লোকদের মধ্যে থেকে নেতা বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। যদি ইহূদী বা পৌত্তলিকরা সংখ্যাগুরু হতো তা হলো তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকতো এবং তাদের নেতার আদেশে সংখ্যালঘু মুসলিমদের পরিচালিত হওয়ার ওয়াদা থাকতো। তবে মুসলিমেরাই যেহেতু সংখ্যাগুরু ছিল, এজন্য মুসলিমদের সর্বুসম্মতিক্রমে হযরত মুহাম্মদ (স:) কেই জননেতা নির্বাচন করা হয়েছিলো এবং তাঁর নেতৃত্বই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিলো। তবে কোন অবস্থাতেই যাতে বর্তমান কালের তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতো অর্থের বিনিময়ে নানাবিধ দুর্নীতির সৃষ্টি না হয়-সে দিকে ইসলামি রাষ্ট্রের তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। ইসলামি রাষ্ট্রের সংবিধানে সংখ্যালঘুদের প্রশংসা আগে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তারা যেন অপরের দ্বারা নির্যাতিত না হয় সে কথা বলা হয়েছে। হক বা অধিকারের ক্ষেত্রেও সংখ্যালঘুদের অধিকারকে গুরুত্বের সাথে দেখার কথা বলা হয়েছে। এদিক থেকেও ইসলামি রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠতের দাবীদার।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের রাজনৈতিক ভাবনায় দেখা যায় তিনি যে ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করেছিলেন–সে রাষ্ট্রের খলিফা বা প্রতিনিধি নিয়োগের সম্পর্কেও তিনি আলোকপাত করেছেন। তিনি তাঁর রচিত জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম নামক বই-এ প্রকাশ করেন, আল্লাহর রাসূল (স:) এর পরে আল্লাহর রাষ্ট্রে তাঁর প্রতিনিধির নিয়োগে কখনও নির্বাচন, কখনও বা মনোয়ন, কখনও বা নির্বাচনের জন্য প্যানেল মনোনয়ন করা হয়েছে। মুসলমানেরা প্রত্যেকেই আল্লাহর প্রতিনিধি বলে তাদের প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি (খলিফা) নির্বাচন করার অধিকার রয়েছে। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুকের নির্দেশ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সাধারণ মুসলমানদের নির্বাচন হবে আল্লাহর রাসূল (স:) এর প্রতিনিধি বা খলিফা নির্বাচনের ভিত্তি। তিনি আদেশ করেছিলেন:‘‘সর্বসাধারণ মুসলিমদের

Dhaka University Institutional Repository

সম্মতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি যদি কারো প্রভুত্ব স্বীকার করে তা'হলে যে আধিপত্য করতে চায় এবং যে আনুগত্য স্বীকার করে তাদের দু'জনেরই মৃত্যুদন্ড হওয়া উচিত।" [২২]

কাজেই দেখা যাচ্ছে ইসলামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের খলীফা বা রাষ্ট্রনায়ক হতে হলে তাকে সর্বসাধারণের সমর্থন লাভ করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি সব মানুষের সমর্থন লাভ করতে না পারে তাহলে সে ব্যক্তি রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার উপযুক্ত নয়।এক্ষেত্রে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে প্রার্থীর জনপ্রিয়তা অর্থাৎ রাষ্ট্র বা কোন সংস্থার প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে হলে প্রার্থীর পক্ষে অধিক সংখ্যক ভোট সংগ্রহ করতে হয়। প্রার্থীর ব্যক্তিগত চরিত্রের সাথে জনপ্রিয়তার কোন যোগ থাকার প্রয়োজন নেই। তার নির্বাচিত এলাকার লোকদের যে কোন ভাবে সন্তুষ্ট করতে পারলেই হয়ে যায়। সে হয়তো কোন টাকা পয়সা অথবা যে কোন জিনিস বিলিয়ে দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করতে পারে। আধুনিক গণতন্ত্রে সংখ্যার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়। এ গণতন্ত্রে সব মানুষের সমঅধিকার স্বীকার করা হলেও-কর্মক্ষেত্রে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তাদের অর্থের দ্বারা গরিবদের কাছ থেকে অতি সহজে ভোট ক্রয় করতে পারে। কাজেই সংখ্যা গরিষ্ঠতা আধুনিক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলেও সংখ্যালঘু ধনীদের দ্বারা এটি নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু ইসলামি গণতন্ত্রে এ রকম ব্যবস্থার কোন স্থান নেই। ইসলামি গণতন্ত্রে প্রার্থীর চরিত্রের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।

ইসলাম ধর্মের বিপরীত যে কোন কাজ কর্মে লিপ্ত ব্যক্তি ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্র নায়ক পদের যেমন প্রার্থী হতে পারে না, তেমনি জনগণও এরূপ ব্যক্তিকে ভোটদান করে না। ইসলামি গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে-এ পৃথিবীতে আল্লাহর শাসন কায়েম করা। এজন্য যে ব্যক্তি আল্লাহর শাসন কামনা করে না, বা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানতে রাজী নয়, সে ব্যক্তি ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের খলিফা (প্রতিনিধি) নির্বাচিত হতে পারে না।

---

[২২] ঐ, পৃ. ১১০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে যাতে কোন সময়ে অর্থের দ্বারা কোন সুযোগ-সুবিধা আদায় করা না হয়। এজন্য খলিফাকে ও প্রকৃত মুসলিম হতে হবে। অর্থের প্রাধান্যের জন্য বর্তমান কালের গণতন্ত্রের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তা সত্যিই কাম্য নয়। মুখে গণতন্ত্রের নামে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে, অর্থের জোরে নরপিশাচ শ্রেণীর মানুষগুলো সফলতা লাভ করে। এ গণতন্ত্রকে অধ্যাপক হ্যারলড লাস্কি তীব্র নিন্দা করেছেন। বর্তমান কালের গণতন্ত্রে নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর চরিত্রকে বিচার করা হয় না, তার পরিবর্তে কেবল গণবায়কে বিচার হয় বলে নিতান্ত চরিত্রহীন লোকের নির্বাচিত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ থাকে। অথচ ইসলামিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন প্রার্থী ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন-যাপন প্রণালী ইসলামের রীতিনীতির সাথে যুক্ত কিনা প্রভৃতি বিষয়ে বিচার করা হতো বলে, চরিত্রহীন লম্পট শ্রেণির লোক কখনও ক্ষমতায় আসতে পারতো না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে রয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতা। যে ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য বর্তমান যুগে এত হৈ চৈ শোনা যায়-চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই মানুষের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) সে স্বাধীনতার লিখিত সংবিধান জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্শিশেষে সবাকেই দান করেছেন। অপরদিকে, এ গণতন্ত্রে যাতে কোন দুর্নীতি প্রশ্রয় না পায়- এবং অর্থের মাধ্যমে যেন কোন চরিত্রহীন লোক ক্ষমতায় আসতে না পারে তার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের আচার-আচারণ কেমন হওয়া উচিত, তা আমরা ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের খলিফাদের আচরণ বা কার্যাবলী থেকে উপলব্ধি করতে পারি। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এর মতে, হুজুর (সঃ) এর সময়ে ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতার চরম বিকাশ ঘটেছিল এবং পরবর্তী সময়ে সাহাবীদের শাসনামলেও সেই আদর্শের অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল। তিনি প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ইসলামি

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্রের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা:) এক সভায় বক্তৃতায় বলেছিলেন:

> আমি আপনাদের এক খাদিম মাত্র। আমার কাছ থেকে আপনাদের সর্বপ্রকার মঙ্গলজনক কাজ আদায় করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।" হযরত উমর (রা:) আর একদিন জনসভায় বক্তৃতাকালে শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্য থেকে হঠাৎ এক ব্যক্তি বলে উঠলো, 'হে উমর, আল্লাহ্কে ভয় করো।' সমবেত জনতা চাইলো তাকে থামিয়ে দিতে কিন্তু হযরত উমর (রা:) বললেন, ''না, না, একে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে দিন। নিজের মতামত ব্যক্ত না করলে ইসলাম প্রদত্ত স্বাধীনতা ভোগ ও সাম্যের সম্মান আপনারা কি প্রকারে করবেন? ইসলাম জননেতা ও জনগণের মধ্যে কোন ইতর-বিশেষ করেনি। শুধু পাথর্ক্য এই যে, জননেতার দায়িত্ব অধিক। সকলেরই সম্মতি ও আপত্তিতে কর্ণপাত করা রাষ্ট্রনেতা হিসেবে আমার কর্তব্য। [২৩]

সুতরাং দেখা যায়, মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা যাতে স্বেচ্ছাচার বা জুলুমে পরিণত না হয়, তার প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেই ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল । সে আদর্শ ছিল এমন সাম্যবাদী আদর্শ যেখানে বাদশাহ এবং ফকিরে কোন পার্থক্য ছিল না। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কথা বলতে চেয়েছেন সে রাষ্ট্রের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা (খলিফা)'র দায়িত্ব ছিল আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ । জনসাধারণের টাকা পয়সা রাষ্ট্রের সর্বময় কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে থাকলেও তা থেকে ইচ্ছামত ব্যয় করার অধিকার খলিফার ছিল না । কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহের উদ্রেক হলে জনসাধারণ প্রকাশ্যে রাষ্ট্রপতি বা খলিফার সমালোচনা করতে পারতো। ইসলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে ।

খলিফা উসমান (রা:) এর খিলাফতের সময় কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করলে তিনি মুসলিমদের এক সাধারণ সভা আহবান করে তার উপর আরোপিত অভিযোগ খন্ডনের উদ্দেশ্যে বলেন:

[২৩] ঐ,পৃ. ১০৬

আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে বলছি-আমি কোন শহরের উপর তার সাধ্যাতীত কর ধার্য করিনি, কাজেই আমার বিরুদ্ধে আনীত এ অভিযোগ নিছক মিথ্যা। আমি সর্বসাধারণের থেকে যা গ্রহন করছি তাদেরই হিতের জন্যই ব্যয় করছি । যে লভ্যাংশের এক-পঞ্চাংশ আমার নিকট এসেছে তাও আমার ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ব্যয় করা আইনসঙ্গত নয় । তাই তার সমস্তই মুসলিমরা ব্যয় করেছে। আমি করিনি। সাধারণ ধনাগারের এক কপর্দকও তসরুফ করা হয়নি, আমি তা থেকে একটি পয়সাও নিইনি । আমি আমার নিজের উপার্জনের উপর নির্ভর করেই জীবিকা নির্বাহ করি।" তারপর তিনি আরও বলেন– "তোমরা জানো,খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে আরব দেশে আমি ছিলাম উট ও ছাগীর সবচেয়ে বড় মালিক । খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দু'টো উট ব্যতীত আমার আর কোন পশু নেই । সে গুলোও আমি হজ্জের সময় মক্কায় যাওয়ার জন্য ব্যবহার করি।[২৪]

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও খলিফা সাধারণ জনগণের নিকট জবাবদিহি করেছেন এবং রাষ্ট্রের ধনাগার থেকে অতিরিক্ত কোন কিছুই গ্রহণ করেন নি বরং জনগণের জন্য নিজের অর্জিত সম্পদ ব্যয় করেছেন। পক্ষান্তরে, বর্তমানে আমাদের দেশ থেকে শুরু করে বিশ্বের নামিদামী দেশের রাষ্ট্রনায়কদের দিকে তাকালে আসল চরিত্র ফুটে উঠে। তারা নিজের সম্পদ জনগণনকে দেওয়া তো দূরের কথা, জণগণের সম্পদ কুক্ষিগত করে নিজেদের জন্য বিলাস-বহুল বাড়ি-গাড়ি তৈরি করা থেকে শুরু করে যাবতীয় ব্যক্তিগত সুখ সমৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা করে থাকে। অথচঅনেক সময় জনগণের বাড়ি-ঘর তো দূরের কথা রাস্তায়ও তাদের মাথা গোঁজার ঠায় থাকে না। তাই দেওয়ান আজরফ মনে করেন, আমাদের দেশে যদি ইসলামি গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে মানুষের মধ্যে সাম্য কায়েম হবে এবং একে অপরের সাথে প্রেম-প্রীতি ভালোবাসার সৃষ্টি হবে। আমাদের দেশও শান্তি-সমৃদ্ধিতে ভরপুর হয়ে উঠবে। আমরা সুখ শান্তিতে বসবাস করতে পারব। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ যে গণতান্ত্রিক ইসলামি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কথা বলেছেন, সে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় খলিফা বা রাষ্ট্র সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

[২৪] ঐ, পৃ. ১০৭

ব্যক্তি কখনও স্বৈরাচার বা (ডিকটেটর) হতে পারবে না । কারণ, তাঁরা মনে করতেন যে সাধারণ প্রজা বা জনসাধারণের মতো খলিফাকে সমভাবে আইন মেনে চলতে হবে। হযরত মুহাম্মাদ (স:) এর ইন্তেকালের পর এ আদর্শ অনুসরণ করে গণতন্ত্রের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র গঠিত হয় । নব-নির্বাচিত খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর মধ্যে ন্যায় বিচারের একটা স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় । তিনি খলিফা নির্বচিত হবার পর জনতার উদ্দেশ্যে বলেন:

> ''সঙ্গীগণ,আমি তোমাদের খলিফা নির্বাচিত হয়েছি । আমি তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ট বলে দাবী করিনে। তোমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে শক্তিশালী তাকেই আমি দুর্বলতম মনে করব-যতক্ষন পর্যন্ত না তাদের কাছ থেকে অন্যায় ভাবে দখলকৃত (দুর্বলদের) সামান্যতম অধিকারকে আমি ফিরিয়ে আনতে পারি এবং যারা তোমাদের মধ্যে দুর্বলতম-তারাই আমার কাছে সবলতম যতক্ষন পর্যন্ত না আমি তাদের অধিকারকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করি। ভাইগণ, আমাকে তোমাদের মতই আল্লাহ্র আইন মেনে চলতে হবে এবং আমি তোমাদের উপর কোন নতুন আইন চাপাতে পারবো না। আমি তোমাদের উপদেশ ও সাহায্য চাই। যদি সৎ পথে চলি, তোমরা আমার সহায়তা করবে, যদি ভুল পথে চলি তাহলে আমাকে সংশোধন করবে।'' [২৫]

খলিফাগণ কখনও জনগনের মতামত উপেক্ষা করতেন না। মানুষ হিসেবে তারা নিজেদেরকে ভুল- ভ্রান্তির উর্ধ্বে মনে করতেন না। তাঁরা নিজদের ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। ইসলামের উজ্জ্বল নক্ষত্র খলীফা উমর (রা:) একদিন এক জনসভায় আদেশ করেছিলেন–মোহরানা যেন বেশি নেওয়া না হয়। তাঁর কথা শোনা মাত্রই একবৃদ্ধা দাঁড়িয়ে কুরআন শরীফের এক আয়াতের উল্লেখ করে দেখিয়ে দেন যে, কুরআনে মোহরানার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি। খলীফা সবিনয়ে তাঁর ভুল স্বীকার করেন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান যুগের রাষ্ট্র নায়কদের চরিত্রের সঙ্গে খলিফাদের চরিত্রের কোন তুলনাই চলে না। তাঁরা নিজেদের সাধারণ মানুষ বলে মনে করতেন। নিজেদেরকে কখনও শ্রেষ্ঠ মানব বা ভুল-ক্রুটির উর্দ্ধে মনে করতেন না বা 'অতিমানব' ভাবতেন না।

....

[২৫] ঐ,পৃ. ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ যে ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা বলেছেন সেই রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থাপনা কিরূপ হবে, সে সম্পর্কেও তিনি ইসলামের আলোকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আজরফের মতে,এ রাষ্ট্রের অর্থনীতি পরিচালিত হয় সর্বসাধারণের কল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখে। এর অর্থের উৎস হবে যুদ্ধলব্ধবিত্ত (আল-গনীমাহ্) যাকাত, সাদাকা, জিযিয়া, খিরাজ, আল-ফায়, আল-উশর প্রভৃতি বিভিন্ন কর ধার্য করে। তবে পরিবর্তিত অবস্থায় সেগুলোর কোন পরিবর্তন হলে তাও স্বীকার করে নেওয়া হবে। হযরত উমর (রা:) এর লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের সমস্ত মুসলিম অধিবাসীকে রাষ্ট্রের অঙ্গ জ্ঞান করে রাষ্ট্রগত-প্রাণ করে তোলা। সেজন্য তিনি তাদের প্রত্যেকের বৃত্তি নির্ধারণ করে দিয়ে ছিলেন এবং যাতে করে তারা জীবিকার সংস্থানের জন্য অন্য কোন্ কাজে লিপ্ত না হয় এবং কোন নাগরিক কোন কাজ করছে, তার প্রহি তিনি কড়া দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর খিলাফতের সময় কোন অমুসলিম মুসলিম হয়ে গেলে তার সম্পত্তি দেশের নাগরিকদের মধ্যে-ভাগ করে দেওয়া হতো।

এ রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি মানুষের হাতে কোন অবস্থায় যেন ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা, (পুঁজি) সঞ্চিত হতে না পারে সে জন্য কুরআনের আদেশ বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হতো। আল্লাহ বলেছেন:''এবং যারা সোনারুপা সঞ্চয় করে, আল্লাহর পথে (মানবতার কল্যাণের জন্য) ব্যয় করেনা-তাদের নিকট এক কষ্টদায়ক শাস্তি ঘোষণা করে দাও।'' [২৬]

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাসূল আকরাম (স:) যা বলেছেন, সাহাবী আবু হুরায়রা (রা:) তা বর্ণনা করে বলেন: ''রোজ কিয়ামতে এ সকল লোকদের পার্শ্বদেশ, কপাল, পিঠে দাগ দেওয়া হবে।''

[২৬] সূরা, আত-তাওবাহ ৯:৫:৩৪

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়াদের আধিপত্য বিস্তারের সুচনায় এবং সিরিয়াতে মু'আবিয়া গর্ভনর থাকাকালে এ আয়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করে হযরতের প্রিয় সাহাবী হযরত আবু যর গিফারী (রা:) বিপ্লবের সূচনা করেন। তাঁর সুদৃঢ় অভিমত ছিল: প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন বিত্তই কেউ রাখতে পারবে না। [২৭]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর 'জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম' নামক বই এ কুরআন হাদীস ও সাহাবীদের শাসনামলের কতিপয় ঘটনা তুলে ধরে ইসলামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনে হাজম জাহেরী 'মুহাল্লায়' উল্লেখ করেছেন যে হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেনঃ আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছেন: ''যে ব্যক্তির কাছে শক্তি ও সামর্থ্যের সরঞ্জাম নিজ আবশ্যকের অতিরিক্ত রয়েছে। তার উচিত ঐ সামান-সরঞ্জাম দুর্বলকে দান করা। যে ব্যক্তির কাছে খাওয়া-পরার অতিরিক্ত উপাদান রয়েছে তার পক্ষে উচিত-অতিরিক্ত সামান দীন-দু:খীকে দান করা।'' [২৮]

আবু সাইদ খুদরী আরও বলেছেন, 'নবী করিম (সা:) এভাবে নানা প্রকারের উল্লেখ করেছেন তাতে আমার এরূপ ধারণা জন্মেছে যে, আমাদের মধ্যে কারো কোন প্রকারের মালের দাবী থাকতে পারেনা।

হযরত রসুলে করীম (সা:) এর প্রধান সাহাবী ও ঘনিষ্টতম আত্মীয় হযরত আলী (রা:) বলেছেন:

> 'আল্লাহ্ তা'আলা ধনীদের উপর গরীবদের আবশ্যকীয় জীবিকা পরিপূর্ণভাবে সরবরাহ করা ফরয করেছেন। যদি তারা গরিবেরা ভুখা, নগ্ন থাকে অথবা জীবিকার জন্য বিপদগ্রস্থ হয় তাহলে ধনীরা দায়িত্বশীল নয় বলেই বুঝতে হবে-এজন্য আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কিয়ামতের দিন জবাবদিহি হতে হবে এবং সংকীর্ণতার জন্য শাস্তিভোগ করতে হবে। এবং বিবিধ আরও হাদীস ও কুরআনের দলীলের দ্বারা মুহাদ্দিস ইবনে হাজম এ বিষয় ব্যাখ্যা করে বলেছেন:

[২৭] প্রাগুক্ত, জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম, পৃ. ১১২
[২৮] ঐ, পৃ. ১১২-১৩

Dhaka University Institutional Repository

> ''প্রত্যেক মহল্লার ধনীদের উপর গরীব-দু:খীদের জীবিকার জন্য দায়ী (জামিন) হওয়া ফরয (অবশ্য) কর্তব্য। যদি বায়তুলমালের আমদানী ঐ গরিবদের জীবিকার সরবরাহের জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহলে শাসক বা আমীর ধনীদিগকে এ কাজের জন্য বাধ্য করতে পারেন অর্থাৎ তাদের মাল বলপূর্বক গরিবদের প্রয়োজনে খরচ করতে পারেন-তাদের জীবিকার সংস্থানের জন্য কমপক্ষে অত্যাবশ্যক প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষুধার অন্ন, পরিধানের বস্ত্র এবং ঝড়-বৃষ্টি, গরম-রোদ ও প্লাবন থেকে রক্ষা করতে পারে এমন বাসগৃহ।'' [২৯]

পূর্বেই বলা হয়েছে, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এমন এক প্রকার রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতির কথা চিন্তা করেছিলেন যেখানে অতিরিক্ত পূঁজি সৃষ্টির কোন সুযোগই থাকবে না । তিনি মনে করেন, ইসলামী নীতি অনুসারে জীবন-যাপন করলে মানুষের হাতে কখনও অতিরিক্ত পূঁজির সৃষ্টি হতে পারেনা বা মাল জমা হতে পারে না । যাকাত ব্যতীত আরও অনেক ধরনের দান ব্যক্তিকে করতে হয়। যেমন- পিতৃমাতৃকুলের আত্মীয়-স্বজন, অনাথ, এতিম ছেলে-মেয়ে বিত্তহারা ও সহায়- সম্বলহীন পথিকের হক রয়েছে ধনীর মালের উপর। কাজেই ব্যক্তি যদি সত্যিকারভাবেই তার উপর অর্পিত হকগুলো আদায় করে তাহলে কখনো তার হাতে অতিরিক্ত কোন ধন সম্পদ জমা হতে পারে না। কুরআন এবং হাদীস শরীফেও দানের ফজিলত ঘোষণা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ আবু হুরায়রা (রা:) এর একটি হাদীস তুলে ধরেছেন:

> আল্লাহর রাসূল (স:) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, 'হে বনি আদম আমি পীড়িত ছিলাম কিন্তু তুমি আমায় দেখোনি।' সে উত্তর করবে, 'হে আমার প্রভু, আমি তোমাকে কিভাবে দেখবো, তুমি যে নিখিল বিশ্বের প্রভু?' তিনি (আল্লাহ) বলবেন, তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দা পীড়িত ছিল, কিন্তু তুমি তাকে দেখোনি, তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে দেখতে (শুশ্রূষা করতে) তা'হলে তার মাঝেই আমাকে পেতে? হে বনি আদম! আমি তোমার কাছে আহার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমায় আহার দাও নি।' সে উত্তর দেবে, হে আমার প্রভু, আমি তোমাকে কিভাবে খেতে দিতে পারতাম-যেহেতু তুমি সমস্ত ভূবনের প্রভু?' তিনি (আল্লাহ্) বলবেন,

[২৯] ঐ, পৃ. ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে চাওয়া স্বত্ত্বেও তুমি খেতে দাওনি–তুমি কি জানতে না যদি তুমি তাকে খেতে দিতে তাহলে আমাকেই খেতে দিতে?" [৩০]

এতসব আইন-কানুন থাকা সত্ত্বেও যদি মানুষের মধ্যে অযথা সঞ্চয় করার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে তাহলে প্রয়োজনবোধে খলীফা (প্রশাসক) ধনীদিগকে দরিদ্রের দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর রাষ্ট্রীয় দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে সুদ প্রথার কুফল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এটা এমন একটা প্রথা যার মাধ্যমে অর্থ লগ্নিকারী চক্রবৃদ্ধি সুদ গ্রহণ করে দিনের পর দিন ধন সম্পদের মালিক হয়। পক্ষান্তরে যে অর্থ গ্রহীতা সে দিনের পর দিন শোষণের ফলে ভিখারীতে পরিণত হয়। বর্তমান জগতে রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুদ প্রথা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে অর্থাৎ সুদ ছাড়া তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো চিন্তাই করা যায় না। কিন্তু দেওয়ান আজরফ যে ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা বলেছেন, সেখানে সুদের কোন নাম নিশানা থাকবে না। কারণ ইসলামে সুদকে হারাম করা হয়েছে। আজরফের মতে, দুনিয়ার সমস্ত কিছুর অধিকার (সার্বভৌমত্ব) আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করার ফলে যাতে এক মানুষের পক্ষে, অপর মানুষকে শোষণ বা পীড়নের কোন সুযোগ না থাকে তার জন্য সুদ প্রথাকে ইসলাম গোঁড়াতেই হারাম করে দিয়েছে।

দেওয়ান আজরফের মতে, মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে প্রেম, স্নেহ, দয়া-মায়া প্রভৃতি উচ্চ পর্যায়ের প্রবৃত্তি রয়েছে। এগুলো অনুশীলন ব্যতীত মানুষের মধ্যে সত্যিকারভাবে বিকাশ হয় না; অথচ এ সুদের ব্যবসা দ্বারা মানুষের সেসব প্রবৃত্তির বিকাশে নানাবিধ বাঁধা দেখা দেয়।

সাধারণত মানুষ যখন বিভিন্ন সমস্যা বা বিপদের সম্মুখীন হয় এবং তার পক্ষে তার নিকট রক্ষিত অর্থে সে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়ে উঠে না, তখনই সে ঋণ নেবার জন্য অন্যের

[৩০] Maulana Fazlul Karim, Al-Muslim... **Al-Hadis**, See, p. 35,273

Dhaka University Institutional Repository

নিকট যায়। মানুষ হিসেবে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, বিপদের সময় অন্যকে সর্বোতভাবে সাহায্য করা। অন্যের দুর্বলতার সুযোগে তাকে ধার (ঋণ) দিয়ে তা থেকে মোটা অংশের মুনাফা (লাভ) আদায় করা কোন মানুষের কাজ হতে পারে না। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে মানুষকে ভালোবাসা বা তাকে সাহায্য সহযোগিতা করা। এ ক্ষেত্রে মানুষও যদি তার সহজাত প্রবৃত্তির সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করে তার বিপরীত দিকে ধাবিত হয় এবং প্রাণীর মত অপর মানুষের রক্ত ভক্ষন করতে চায় এটা কখনও মানবীয় কাজ হতে পারে না।

আল্লাহ মানুষকে ইনসান-ই-কামিল বা পূর্ণাঙ্গ মানুষ রূপে গড়ে তুলতে চান। পূর্ণাঙ্গ মানুষ হবে মানুষের প্রকৃত বন্ধু। কাজেই যে প্রথা বা ব্যবস্থায় মানুষ দ্বারা মানুষের ক্ষতি সাধিত হয়, তা কোন অবস্থায়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হতে পারে না বরং তা সর্বাবস্থায় পরিহার করার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, যারা সুদ গ্রহণ করে (সুদখোর) তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যেও এর কুফল পরিলক্ষিত হয়। তাদের মধ্যে বিভিন্ন খারাপ অভ্যাস যেমন- অলসতা ও বিলাসিতা আসে অর্থাৎ কোন কাজ কর্ম না করে ঘরে বসে মুনাফা লাভের প্রবণতা এবং সে অর্থ জীবনের আবশ্যিক কাজে ব্যয় না করে, প্রয়োজনাতিরিক্ত কাজে (বিলাসিতায়) ব্যয় করার প্রবণতা দেখা দেয়। পরিণামে এসব পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চিন্তা করেছিলেন সেখানে নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিয়েও তিনি একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। আজ সারা পৃথিবীতে নারীর অধিকার নিয়ে হৈ চৈ শুনা যায়। নারীরা নারীবাদী আন্দোলন করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। আমরা মনে করি পাশ্চাত্য সমাজে নারীর অধিকার বাস্তবায়ন করা হয়, কিন্তু প্রকৃত দৃষ্টিতে দেখা যায় সেখানে নারীরা ব্যবহৃত হয় মূলত ভোগ্য পণ্যের মতো। যতদিন যৌবন থাকে ততদিন তাদের কদর থাকে, যৌবন শেষ হয়ে গেলে তাদের আশ্রয় হয় বৃদ্ধাশ্রমে এবং

সাথী হয় কুকুরছানা, বিড়ালছানা অথবা খরগোশ ছানা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের গৃহপালিত পশু পাখি।

ইসলাম পূর্বযুগেও নারীর কোন মর্যাদা ছিল না। কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তারা অপমান বোধ করত এবং তাদের জীবন্ত কবর দেওয়া হত। তাই বলা যায় ইসলামী সমাজে বা রাষ্ট্রে নারীর পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এ সমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করতে হলে আমাদের কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা করতে হবে। কারণ, কুরআন ও হাদীস হচ্ছে ইসলামের বুনিয়াদ।

নারীর অধিকার সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছেঃ ''তাদের জন্য তোমাদের উপর সেই অধিকার তোমাদের জন্য যেমন তাদের উপর রয়েছে।" সূরা নিসা

সূরা নিসাতেই আবার বলা হয়েছে, "পুরুষ জাতির নেতৃত্ব রয়েছে নারীদের উপর।"

ইসলাম জগতে আল্লাহর রাসূল (সা:) কে গণ্য করা হয় জীবন্ত কুরআন রূপে। কুরআনুল-করীমের প্রতিটি অক্ষর তাঁর জীবনে রূপায়িত হয়েছে বলে তিনি এ দুনিয়ায় কুরআনুল-করীমের অতুলনীয় ভাষ্যকার। নারী জাতি সম্বন্ধে তাঁর উক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ হাদীস উল্লেখযোগ্য।

১. সন্তানের বেহেশত মায়ের পদতলে।
২. পিতা-মাতার মধ্যে কাকে প্রথম সম্মান প্রদর্শন করবে, এ প্রসঙ্গে কোন এক প্রশ্নের উত্তরে হুজুর (সা:) বলেছিলেন: প্রথমে তোমার আম্মাকে, তারপর তোমার আম্মাকে, তারপরে তোমার আম্মাকে, তারপর তোমার আব্বাকে।
৩. স্ত্রী লোকেরা পুরুষের জমর অর্ধেক।
৪. এ পৃথিবী ও তার অন্তর্গত সব কিছুই সম্পদ, তবে এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধার্মিক নারী।

Dhaka University Institutional Repository

৫. আল্লাহর আদেশ-তোমরা তোমাদের নারীদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করবে। কারণ,তারা তোমাদের মাতা, কন্যা ও স্ত্রী।

৬. নারীদের অধিকার পবিত্র। যাতে তাদের অধিক কষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ রেখো।

৭. তোমাদের নারীদের মসজিদে আসতে বাধা দিও না। তবু তাদের বাড়ী তাদের পক্ষে উত্তম স্থান।

কুরআনুল করীম ও হাদীসের এসব উক্তিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- নারীর মর্যাদাও অধিকারের ক্ষেত্রে যখন বলা হয়েছে পুরুষের উপর নারীর, নারীর উপর পুরুষের অধিকার সমান। তখন এ বিশ্বে নারীর অধিকার পুরুষের অধিকারের সমান বলে গণ্য করা হয়েছে।

এ আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে আল্লাহর রাসূলের হাদীসঃ স্ত্রী লোকেরা পুরুেষের জময অর্ধেক। নারীদের অধিকার পবিত্র যাতে তাদের অধিক কষ্ট না হয়। সে দিকে লক্ষ রাখবে।

কাজেই নারী পুরুষের অধিকারের বেলায় ইসলামি সমাজে কোন রকম পার্থক্য হতে পারে না; যেমন, মানব জীবনের প্রাথমিক চাহিদা হচ্ছে অন্ন-বস্ত্রের সন্ধান। অন্ন-বস্ত্র বিতরনের সময় যেমন নারী পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকতে পারে না, তেমনি শিক্ষা-সংস্কৃতি বা জীবনের অন্যান্য অধিকার লাভের ক্ষেত্রেও তাদের অধিকার ক্ষুন্ন হয় এরকম কাজ করা যাবে না; তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে নারীর উত্তরাধিকার নিয়ে- নারীকে পুরুষের সমান উত্তরাধিকার দেওয়া হয়নি। যেমন,

(১) আব্বা-আম্মার সম্পত্তিতে ছেলেরা যে অংশ পায়, মেয়েরা তার অর্ধেক পায়।

(২) একজন পুরুষের স্ত্রী তার পরিত্যাজ্য সম্পত্তিতে সন্তান-সন্ততি থাকলে দুই আনা অংশের মালিক হয় অথচ একজন স্ত্রী তার স্বামীর আগে মৃত্যুবরণ করলে, স্বামী তার সম্পত্তির চার আনার অংশ পায়।

(৩) সাক্ষী দান কালে শুধু নারীর সাক্ষ্য ইসলামী বিধান মতে গ্রহণ করা হয় না। শতাধিক নারী হলেও তার সাথে একজন পুরুষের সাক্ষের প্রয়োজন।

(৪) বিয়ের বেলায় একজন পুরুষ চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে। অপরদিকে একজন নারীর পক্ষে একাধিক স্বামী একসঙ্গে গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই। উপরের বিষয়গুলো আলোচনার পূর্বে আমাদের একটা জিনিস ভালভাবে জেনে রাখা দরকার যে, ইসলামী সমাজ পুরুষ প্রধান বা পিতৃ প্রধান। সুদূর অতীতে আমাদের নবীজী হযরত মুহাম্মাদ (সা:) জন্মেরও একশত বৎসর পূর্বে সারা আরব জাহানে মাতৃপ্রধান বা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল। এমন কি হুজুর (সা:) জন্মের সময়ও ইয়েমেনে মাতৃপ্রধান সমাজ ছিল। পুরুষেরা নানাবিধ সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের অধিকার লাভ করেছিলো। তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জাহিলিয়াতের যুগে নারী জাতির উপর নানাবিধ নির্যাতন করা হতো। জাহিলিয়াতের যুগে নারীকে পুরুষের বিলাস-সামগ্রী মনে করা হত। সেই জাহিলিয়াত বা অন্ধকারাছন্ন যুগে জন্ম গ্রহণ করেও হযরত মুহাম্মাদ (সা:) নারীকে এমন পরম মর্যাদা দান করেছেন যা আজও ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে।

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে (বেলায়) নারীকে কেন পুরুষের সমঅধিকার দেওয়া হয়নি, তার উত্তরে বলা যায় যে ইসলামি সমাজে নারীরা পিতার সম্পত্তিতে অধিকার লাভ করার পরও স্বামীর নিকট থেকে তাদের নিরাপত্তার জন্য কাবিন (মোহরানা) লাভ করে। পুরুষের পক্ষে এরূপ সুযোগ নেই। তাছাড়া নিজের স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য পরিবারের কর্তা হিসেবে পুরুষকেই সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব বহন করতে হয়। নারীকে এক্ষেত্রে মুক্ত রাখা হয়েছে। এমনকি সন্তানকে দুধ পান করানোর ক্ষেত্রেও নারীর উপর আবশ্যকীয়তা নেই। ইচ্ছা করলে স্তন পান করাতেও পারে, আবার নাও পারে। সাধারণত শারীরিক গঠন, শক্তিমত্তা এবং বিভিন্ন জায়গায় কম ঘোরাফেরাা ইত্যাদি কারণে নারীদের অভিজ্ঞতা কম থাকে। তাই সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে নারীদের সাথে একজন পুরুষ রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান আজরফ মতে, ইসলামে 'অধিকার' শব্দটি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ইসলামে অধিকার শব্দের অর্থ কোন কিছুর উপর ব্যক্তির মালিকানা নয়, তার হিফাজত মাত্র। যাকে ইংরেজিতে বলে Custodianship । ইসলামি সমাজে নর অথবা নারী কেউ তার ইচ্ছামত কোন সম্পদ ব্যয় বা ধ্বংস করতে পারে না। তাকে সে সম্পদের রক্ষক হিসেবে আল্লাহর পথে মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় করতে পারে।

বিবাহের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের তারতম্যের ক্ষেত্রে বলা যায়-ইসলামী সমাজে জিনা বা ব্যভিচার হচ্ছে গুনাহে কবিরা (মহাপাপ)। তাই কোন অবস্থায়ই যেন নারী অথবা পুরুষ এ কাজে লিপ্ত না হয় সে জন্যেই পুরুষকে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা-গণনায় দেখা যায়, প্রত্যেক দেশেই নারীর সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার চেয়ে বেশি। বিবাহের ক্ষেত্রে সাধারণত শীত প্রধান অঞ্চলের নিয়ম হলো পুরুষের বয়স হবে একটু বেশি আর নারীদের একটু আগে। যেমন, পুরুষ ৩০-৫০, নারী ২০-৪০ বছর। গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষের বয়স ২২ থেকে চল্লিশ এবং নারীর ক্ষেত্রে ১৫ থেকে ৩০ বৎসর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শীতপ্রধান ও গ্রীষ্মপ্রধান উভয় অঞ্চলেই বিবাহযোগ্য পুরুষের সংখ্যা নারীর চেয়ে কম। কারণ, এ বয়সে পুরুষেরা জীবন ধারণের উপকরণ সংগ্রেহে ব্যস্ত থাকে এবং বিভিন্ন জায়গায় চলাফেরা করতে গিয়ে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে প্রাণ হারায়। আবার সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন সময় যে সংগ্রাম ও যুদ্ধ বিগ্রহ হয় এতে পুরুষেরাই প্রাণ হারায় বেশি। তাই বিভিন্ন দেশে বিবাহযোগ্য পুরুষ মানুষের সংখ্যা গুরুতরভাবে হ্রাস পায়।

কাজেই এসব সংকট-কালীন সময়ের ব্যবহার হিসেবে ইসলামে একাধিক বিবাহের সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু বিবাহের সুযোগ দেবার পরও আল-কুরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদি একাধিক স্ত্রীর সাথে সমআচরণ বা ব্যবহার করতে না পারা যায় তাহলে একটি মাত্র বিবাহ করতে হবে। আবার পুরুষের সাথে স্ত্রী একই কাজ করতে পারবে না-এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কোন নির্দেশনা নেই। শাসন বা বিচার বিভাগীয় কাজে, শিক্ষাক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের নানা ক্ষেত্রে নারীরা কেন পুরুষের সমান মর্যাদা ভোগ করবে না এর বিপক্ষে-কুরআন ও হাদীসে কোন উক্তি নেই। কাজেই জীবনের কোন ক্ষেত্রে নারীর অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়নি।

সুতরাং পূর্বে উল্লিখিত আলোচনায় মাতার সম্মান পিতার সম্মানের তিন গুণ অর্থাৎ নারীর মর্যাদা তিন গুণ বলা হয়েছে পুরুষের মর্যাদার চেয়ে। আবার দ্বীনদার নারীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ট সম্পদ বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে অনেকে প্রশ্ন করেন, নারী জাতিকে এত সম্মান বা মর্যাদা দেবার পর অধিকারের ক্ষেত্রে কোনো কোনো বিষয়ে পুরুষের সমান আসন দেওয়া হয়নি কেন?- এর উত্তরে বলা যায় নারীর শারীরিক ও মানসিক দিকের প্রতি লক্ষ রেখেই তাকে কোন কোন অধিকারের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে মাত্র।

এ সম্পর্কে দেওয়ান আজরফ বলেন:

> পূর্বেই বলা হয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে এ দুনিয়ার সবকিছুর একমাত্র মালিকানা আল্লাহ্ সুবহানাতা'আলার। মানুষকে তার কাছে গচ্ছিত বিষয়ের ভোগ দখলের অধিকার দেওয়া হয়েছে বটে,তবে সে ভোগ দখলকে সে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে না। সে ভোগ দখলের জন্য যে নীতি নির্ধারিত হয়েছে তারই নির্দেশিত পথে তাকে ভোগ করতে হবে। এজন্য মুমিন মুসলিমদের অধীন সম্পদ ওয়াকফ্কৃত সম্পত্তির মত আল্লাহর আইন মোতাবিক পরিচালিত হবে। এ পরিচালনা অত্যন্ত কঠিন কাজ এবং এর দায়িত্ব ততোধিক কঠিন। নারীদের শারীরিক দুর্বলতা এবং সন্তান লালন পালনে তাদের অধিক দায়িত্ব থাকায় তাদের কোন কোন বিষয়ের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তাদের হিফাজতকারী বা (Custodian) এর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। তবে মর্যাদার দিক থেকে তাদের স্থান পুরুষের উর্ধ্বে নির্দেশিত হয়েছে। [৩১]

বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যদা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করাও একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই দেওয়ান আজরফ তাঁর রাষ্ট্রীয় দর্শনে

---

[৩১] প্রাগুক্ত, জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম, পৃ. ১০১

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যালঘুদের নিয়েও আলোচনা করেছেন। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মনে করতেন বর্তমান রাষ্ট্রগুলোতে সংখ্যালঘুদের সমস্যা একটা অন্যতম-সমস্যা। তিনি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তায় এ সমস্যাটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর 'জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম' নামক বই-এ দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান 'মদীনা সনদে' প্রথমেই সংখ্যালঘু ও পৌত্তলিকদের অধিকার ও তাদের প্রতি কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যার প্রথম কথাই ছিল- মদীনার ইহুদী, পৌত্তলিক এবং মুসলমান সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে, কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে ন। সুতরাং এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সেই সময়ে নানাবিধ অনাচার ও অত্যাচারের যুগেও ইসলামি রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের সম্মান প্রদর্শন করা হতো। এ সম্পর্কে দেওয়ান আজরফ বলেন:

> ''সংখ্যালঘুদের দু'দিক থেকে দেখা যেতে পারে। সংখ্যালঘু বলতে রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোকদের মতাবলম্বী নয়, এমন একদল লোককে যেমন বোঝা যায়-তেমনি অন্য ধর্মাবলম্বী লোককেও বোঝা যায়। ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুর স্থান কোথায়, তা-ই আমাদের বিবেচ্য। ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমদের মধ্যে সংখ্যালঘু বলে কেউ থাকতে পারে না। কারণ, মুসলিমেরা সকলেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী বলে ইসলামেরই অনুসারী ও ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের রুপায়নে এক মতাবলম্বী হতে বাধ্য। ভিন্ন ধর্মের লোকদের ইসলামী রাষ্ট্রে বলা হয় যিম্মি। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রাখতে ইসলামী রাষ্ট্র সর্বোতভাবে বাধ্য। এজন্যই ইসলামের শাসন বিধান অনুসারে ইসলামী রাষ্ট্রে এমন কোন আইন গৃহীত হতে পারে না-যা যিম্মির সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিকূল। তাই আধুনিক গণতন্ত্রের চেয়ে এক্ষেত্রে ইসলামী নীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কারণ, আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে কোন আইন জনমতের জোরে গৃহীত হয়ে যেতে পারে, যা সম্পূর্ণই সংখ্যালঘুর সংস্কৃতির প্রতিকূল। কাজেই শুধু যিম্মি শব্দ শুনেই যাঁরা অস্থির হয়ে পড়েন তাঁদের প্রবোধের জন্য বলা যেতে পারে যিম্মি অর্থ রক্ষিত নয়-তার অর্থ ইসলামী শাসন বিধানে যাতে কোন অনিষ্ট বা অমঙ্গল না হয় তার জন্য রক্ষা কবচের ব্যবস্থা। [৩২]

....

[৩২] ঐ, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে ইসলামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু বা যিম্মিরা খুব ভাল অবস্থানে ছিল। তাদের কোন রকম অত্যাচার করা হতো না, তাদের অধিকারকে পুরোপুরি সংরক্ষণ করা হতো। সংখ্যালঘু বা যিম্মি সম্পর্কে হযরত আলীর উক্তি, **'যিম্মির রক্ত আমারই রক্ত'**। তাই বলা যায় ইসলামী রাষ্ট্রে যিম্মির বা সংখ্যালঘুদের মুসলিমদের মতো সমান অধিকার রয়েছে। পক্ষান্তরে, অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিশেষ করে আধুনিক কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলাতে কমিউনিস্ট ব্যতীত অন্য কাউকে নির্বিঘ্নে বাস করতে দেওয়া হয় না।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, ইসলামি গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিত্ত সঞ্চয় বা শোষণের কোন অবকাশই থাকতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ ইরাক ও সিরিয়া বিজিত হওয়ার পর সাহাবীদের শত অনুনয়- বিনয় সত্ত্বেও হযরত উমর ফারুক (রা:) তাঁদের জায়গীর দান করেন নি বরং সমস্ত ভূমি সরকারের অধীনে রেখে তার আয় সকল অধিবাসীদের প্রয়োজনে ও ওয়াকফ হিসেবে গণ্য করেছেন। এমনকি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি যাতে কোন জোতদারের হাতে না থাকে তার জন্য হযরত বিলাল (রা:)-এর জায়গীর থেকেও অতিরিক্ত জমি ফেরৎ নিয়ে হযরত উমর ফারুক (রা:) চাষীদের মধ্যে বন্টন দিয়েছেন।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হচ্ছে প্রকৃত জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। মহানবী (সা:) এবং তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত সাহাবাগণ এ ধরনের রাষ্ট্র কায়েম করে দেখিয়েছেন। দেওয়ান আজরফ মনে করেন, আবার যদি মানুষের মধ্যে সেই চেতনাবোধ জাগ্রত হয় এবং তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে হযরত (সা:) সাহাবাদের খিলাফতের সময়ে অনুসরণীয় নীতিগুলো গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে রাষ্ট্র গঠিত হয় তাহলে আবার মানুষের মধ্যে সাম্য, শান্তি, সম্প্রীতি, একে অপরের প্রতি দরদ, মায়া-মমত্ববোধ, ভালবাসা জাগ্রত হবে; এমনকি একজন মানুষ অপর মানুষের জন্য প্রয়োজনে জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। ফলে এমন একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হবে যেখানে রাষ্ট্রের সব মানুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে পারবে। এ রকম একটা রাষ্ট্রের ধারণা দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ অন্তরে

পোষণ করতেন এবং পুনরায় বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতে সে ধরনের রাষ্ট্র যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় সেজন্য তাঁর আন্তরিক প্রয়াস ছিল। এ লক্ষ্যে তিনি সভা-সেমিনার, বিভিন্ন মহলে আলাপ-আলোচনা, বিভিন্ন প্রবন্ধ-পুস্তক প্রণয়ন, তথা লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। আজ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল নিয়ে সারা দুনিয়ায় মারা-মারি, হানা-হানি লেগেই আছে। এসব দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের হৃদয়ে অনুশোচনার সৃষ্টি করেছিল; তাই এ অবস্থা থেকে অব্যহতি পাওয়ার জন্য তিনি তাঁর লেখনী, বক্তৃতা সমস্ত কিছুর মধ্যে ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জীবনী নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় প্রথম জীবনে তিনি সক্রিয় রাজনীতি করেছেন, এক পর্যায়ে জেল-খেটেছেন, বিভিন্ন জুলুম সহ্য করেছেন, চাকুরীচ্যুত হয়েছেন এবং জমিদারের নাতি -হয়েও অনেক কষ্টে দিনাতিপাত করেছেন। চাকুরীচ্যুত হওয়ার পর তিনি লক্ষ্য করলেন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে রকম ভাল মানুষ দরকার তা যদি তৈরি করা যায়, তাহলে রাষ্ট্রের মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারব। তাই পরবর্তীতে তিনি রাজনীতি-ত্যাগ করে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে ধরনের আদর্শবান মানুষ দরকার (ইনসানে-কামিল) তাঁর জন্য কাজ করতে লাগলেন। কারণ, তিনি উপলব্ধি করেছেন, রাষ্ট্রের প্রশাসক ও জনসাধারণ যদি ভালো না হয় তাহলে কোন রাষ্ট্র ভালভাবে পরিচালনা ও সুষ্ঠুভাবে টিকে থাকা সম্ভব নয় এবং এতে সবসময় বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকবে। এখানে উল্লেখ্য প্লেটো যেমন তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য দার্শনিক রাজা এবং রাষ্ট্রের জনগণকে তিন ভাগে ভাগ করার কথা বলেছিলেন, তেমনি দেওয়ান আজরফও প্রত্যক্ষ রাজনীতি বাদ দিয়ে সারা পৃথিবীর সব রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে এগুলোর নানা সুবিধা ও অসুবিধা তুলে ধরেন। আর তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাপ্ত সবচেয়ে উপযোগী এবং মানুষের জন্য কল্যাণকর ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত পেশ করেন।

সমালোচনাঃ অনেকে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের রাষ্ট্রচিন্তাকে প্রাচীন ধ্যান-ধারণা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের ধারণা বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের রাষ্ট্র সম্পর্কিত মতবাদ বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া তার রাজনৈতিক মতবাদ ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি কিভাবে বাস্তবায়িত হবে এ সম্পর্কে দেওয়ান আজরফ পরিষ্কার কোন রূপ রেখা প্রণয়ন করেন নি। সমালোচকদের সমালোচনার উত্তরে বলা যায়, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন শতাব্দীর সাক্ষী। আমরা জানি, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন। তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেছেন। জীবনের প্রথম পর্যায়ে বাম রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। নিজে জমিদার হওয়া স্বত্তেও জমিদারদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জমিদারি প্রথা বাতিল করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে পড়েছেন এবং সেগুলোর বাস্তব ফলাফল খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ- 'জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম' নামক পুস্তকে প্রাচীন কালের রাজনীতি ও রাজনৈতিক পদ্ধতি থেকে শুরু করে আধুনিক কালের রাজনীতি অর্থাৎ রুশোর মতবাদ থেকে শুরু করে লিউ টলস্তয় ও ভারতবর্ষের গান্ধীজির মতবাদ পর্যন্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, এদের প্রবর্তিত কোন মতবাদই কোনো দেশে ভালভাবে প্রচলিত হয়ে মানুষের পুরোপুরি কল্যাণ বয়ে আনেনি। তাছাড়া এসব মতবাদ মানুষে মানুষে শোষণ- বঞ্চনা, হানা-হানি বন্ধ করতে পারে নি, বরং বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে শক্তিশালী বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের প্রাণ নাশ করছে। তাই দেওয়ান আজরফ তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ধারণা পেশ করেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তিনি যে রাজনীতির ধারণাটি পেশ করেছেন তার নাম দিয়েছেন 'ইসলামিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা'। তিনি তাঁর প্রায় শতবর্ষের দীর্ঘজীবনে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক শাসন পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, যে শাসন পদ্ধতির মাধ্যমে আরবের দুর্ধর্ষ জাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সেই পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আবারও পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসা সম্ভব। তিনি তাঁর 'জীবন সমস্যার

Dhaka University Institutional Repository

সমাধানে ইসলাম' পুস্তকে ইসলামিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হলে মানুষগুলো ঈমান, নামায, রোজা, যাকাত ও হজ্জ এই গুণগুলো পালন করার মাধ্যমে কিভাবে তৈরি হবে সে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন এবং সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান কিভাবে নির্বাচিত হবেন সে সম্পর্কে, তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া সেই রাষ্ট্রে নারীর অধিকার ও সংখ্যালঘুদের অধিকার কিভাবে সংরক্ষিত হবে সে সম্পর্কীয় আলোচনা, ভূমি আইন, উৎপাদন পদ্ধতি, বন্টন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন।কাজেই বলা যায়, সমালোচকগণ তাঁর সম্পর্কে পরিপূর্ণ না জেনেই সমালোচনা করেছেন। পরিশেষে, এ কথা কথা ব্যক্ত করবো যে, দেওয়ান আজরফের পেশকৃত ফর্মুলা যদি সত্যিই বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে আজকের যুগেও তাঁর প্রস্তাবিত 'ইসলামি গণতান্ত্রিক শাসন' পদ্ধতি কার্যকরী হতে পারে এবং মানুষ তার বহু কাঙ্খিত শান্তি ফিরে পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের অর্থনৈতিক চিন্তার ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নঃ

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন একজন মানবতাবাদী ও সাম্যবাদী দার্শনিক। তিনি তাঁর আলোচনায় দর্শন রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্ম ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর আলোচনার একটা অন্যতম বিষয় ছিল ইনসানে কামিল (পূর্ণাঙ্গ মানুষ)। মানুষ যদি সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে না পারলে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারবে না। তাই মানুষের জীবনে পূর্ণাঙ্গতার জন্য দর্শন, রাজনীতি ও ধর্ম যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি অর্থ একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেজন্য দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মানুষের শান্তিময় জীবন যাপনের জন্য রাজনীতি বা রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি এবং ধর্ম সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি অর্থনীতি সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। অর্থনীতি মানব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। এটি মানব জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জীবনের নানাবিধ চাহিদা পূরণ করতে গেলে প্রথমেই অর্থনীতির কথা এসে পড়ে; আর এই অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই আমাদের জানতে হয়: অর্থনীতি কী? অর্থনীতির বিষয়বস্তু কী? অর্থনীতির উৎস কী ইত্যাদি। এ জগতে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। এদের মধ্যে পাশ্চাত্য অর্থনীতি এবং ইসলাসী অর্থনীতি অন্যতম।

আমরা তৃতয়ি অধ্যায়ে দেখেচি যে, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর রাজনৈতিক ভাবনায় ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতির কথা বলেছেন। আর রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিভিন্ন অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করে পরিশেষে ইসলামি অর্থনীতির গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরেছেন। এ অধ্যায়ে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হলো অর্থনীতি সর্ম্পকে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের চিন্তার ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। দেওয়ান আজরফ তাঁর ‘জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম’ এবং ‘জীবন দর্শনের পূর্ণগঠন’ এ বই দু‘টিতে এবং তাঁর বিভিন্ন লেখনি ও বক্তৃতায় অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর বই-এ ইসলামী অর্থনীতির উৎস, ইসলামি

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের ভূমিনীতি ও তাঁর প্রয়োগ সংক্রান্ত তিনটি মাত্র শর্ত উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর পর্যালোচনায় ইসলামি সমাজে জনগণের ভোগ দখলের অধিকার, ভোগ দখলে জমির পরিমাণ, জমি থেকে ফসল উৎপাদনের নীতি ও ফসল উৎপাদন ও বন্টন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন।

সাধারণত অর্থনীতি হচ্ছে এমন একটি পরিবর্তনশীল সামাজিক বিজ্ঞান যেখানে রয়েছে মানুষের আয় ও এর বন্টন, কর্মসংস্থান, মানবিক কল্যাণ এবং সামগ্রিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে অসীম অভাব ও বিকল্প ব্যবহার উপযোগী সীমিত সম্পদের মধ্যে সমন্বয় বিধানের পথ নির্দেশ। এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, উৎপাদন, বন্টন, ভোগ, বিনিময়, অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা, সরকারী অর্থ ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ইত্যাদি।

আমরা সাধারণত পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদদের চিন্তার আঙ্গিকে আমাদের সব অর্থনীতি সংক্রান্ত আলোচনা করে থাকি। এর ভিত্তি গঠনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই কাজ করেছে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন অর্থনীতিবিদদের চিন্তা। এ অর্থনীতির উৎস হচ্ছে কৃষি, বনজসম্পদ, খনিজ সম্পদ, মৎস সম্পদ, শিল্প কারখানা, ব্যবসায় বাণিজ্য, নির্মাণ খাত, যোগাযোগ এবং বৈদেশিক রেমিটেন্স ইত্যাদি খাত থেকে প্রাপ্ত খাজনা ও কর।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মনে করেন, এগুলো মানুষের চিন্তা শক্তির মাধ্যমে এসেছে কাজেই এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে অনেক সমস্যা রয়েছে। এখানে ইচ্ছা করলেই-খাজনা ও কর ফাঁকি দিয়ে এবং শ্রমজীবি মানুষের অধিকার হরণ করে একজন অনেক সম্পদের মালিক হতে পারে। ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্র মানুষের মাঝে বড় ধরনের ভেদাভেদ সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া এই পদ্ধতির অন্তরালে সুদের ব্যবস্থা রয়েছে যা ইসলামে সরাসরি হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর জীবনের প্রায় শত বর্ষে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে

দেওয়ান আজরফের ধারণা, প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে শান্তি আনয়ন করা কষ্টসাধ্য। তাই প্রচলিত অর্থনীতির সুবিধা-অসুবিধা পর্যালোচনার পর তিনি ইসলামী অর্থনীতির ধারণা ব্যক্ত করেছেন।

মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন জমিদার বংশের এবং তিনি নিজেও ছিলেন জমিদার। তিনি প্রচলিত অর্থব্যবস্থার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। সে কারণে তাঁর বাস্তব উপলব্ধি হয়েছে যে, প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বা খেটে খাওয়া মানুষ নিস্পেষিত হয়ে আরও দরিদ্র হয়ে যায়। ব্যক্তি জীবনে, পরিবারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি সংগঠিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

তাই দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, তাঁর জীবনোপলব্ধি থেকে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন করার কথা ভেবেছেন, যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একসময়ে সবচেয়ে দুরবস্থা গ্রস্থ, অন্ধকারাচ্ছন্ন, হত্যাকারী ও লুন্ঠনকারী জাতিকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে এবং সেই সময়কে স্বর্ণযুগে পরিণত করেছিলো। সে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের আচার-আচরণ এবং লেনদেনের মধ্যে এরকম পরিবর্তন হয়েছিলো। যে সমাজে মারামারি-হানাহানি, জোর-জলুম ও প্রতারণা ছিলনা। ফলে সামাজে পরিপূর্ণভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। পূর্বের অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই , রাষ্ট্রীয় শাসনের ক্ষেত্রে দেওয়ান আজরফ যে ইসলামি গণতন্ত্রের কথা বলেছেন, সে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তিনি ইসলামি অর্থনীতির কথা বলেছেন। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ, পুস্তক, লেখনি, সভা সেমিনারে বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলামি অর্থনীতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ধারণা ব্যক্ত করা হলো:

ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সব মানুষের সম অধিকারের কথা বলা হয়েছে, তেমনি ইসলামি অর্থনীতিতে জনসাধারণের কল্যাণের কথা বলা হয়েছে। এ অর্থনীতির

মূল ভিত্তি গঠিত হয় যুদ্ধলব্ধ বিত্ত (আল-গণীমাহ), যাকাত, সাদকা, জিযিয়া (অমুসলিমদের নিরাপত্তা কর), খিরাজ (আপতকালীন কর), আল-ফায় (বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পদ), আল-উশর প্রভৃতি বিভিন্ন কর ধার্য করে। তবে প্রয়োজনে এর পরিবর্তন ও পরিমার্জন স্বীকার করা নেওয়া হয়।

একটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রধান উপাদান হচ্ছে উৎপাদন ও বন্টন। আর এ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে ভূমি। ইসলামে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভূমির উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ইসলামী সমাজে ভূমিনীতি ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি। সাধারণ অর্থে ভূমি বলতে স্থলভাগ ও মাটিকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে ভূমি কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ মানুষের ভোগের জন্য বা উৎপাদন কাজে সাহায্য করার জন্য প্রাকৃতিক সব ধরনের দানকে ভূমি আখ্যা দেওয়া যায়। ভূমির ব্যাখ্যা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, ভূমি বলতে জলে-স্থলে আলো-বাতাসে এবং উত্তাপে পরিব্যপ্ত সেসব পদার্থ ও শক্তিকে বুঝায় যা প্রকৃতি মানুষের সাহায্যের জন্য অবাধে দান করেছে। তাই অর্থনীতিতে ভূমি বলতে শুধু পৃথিবীর উপরিভাগ বা মৃত্তিকাকে বুঝায় না, বরং ভূমির অবস্থান, উর্বরতা, খনিজ দ্রব্য, বনজ ও জলজ সম্পদ, আলো বাতাস, তাপ, আবহাওয়া ও জলবায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদকে বুঝায়।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভূমি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণ কৃষি ও শিল্প থেকে শুরু করে সব ধরনের উৎপাদনের ক্ষেত্রেই ভূমি দরকার। ভূমি ছাড়া উৎপাদনের কথা চিন্তাও করা যায় না। এ ভূমি ব্যবহারের কিছু নীতি রয়েছে।

ইসলামি দর্শনের সাথে মিল রেখেই সমাজের ভূমি-নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামের নিয়মনীতি বাস্তবায়নের প্রতি ক্ষেত্রেই পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রথমে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং মানুষ

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর প্রতিনিধি এটা মনে প্রাণে স্বীকার করে নিতে হবে। পাশাপাশি ব্যক্তিগত অথবা সমাজ জীবনে সুখ-সুবিধার জন্য বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।

ইসলামি সমাজ অথবা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কোন সম্পদ বা অন্য কিছুর উপর ব্যক্তিগত কোন মালিকানা থাকবেনা, থাকবে শুধু ভোগের অধিকার। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি (খলিফা) হিসেবে ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষ আল্লাহর মালিকানাকে মেনে নিয়ে সম্পদ ভোগ করতে পারবে, এর অতিরিক্ত কোন দাবিই সে করতে পারবে না।

তাই ইসলামি সমাজে জনসাধারণকে জীবন যাপনের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু জমি রক্ষক হিসেবে ভোগ করতে দেওয়া হয়। অতিরিক্ত সম্পত্তি (জমি বা ভূমি) রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় অথবা গো-চারণভূমি, কবরস্থান, জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ভূমি যাতে কোন ব্যক্তি বিশেষের বা বংশানুক্রমিক সম্পত্তিতে পরিণত না হতে পারে, তার প্রতি দৃষ্টি রেখেই ইসলামি রাষ্ট্রের ভূমি বন্টনের নিয়ম নীতি তৈরি করা হয়েছে। এখানে ইসলামি রাষ্ট্রের একজন প্রজা বা নাগরিক কী পরিমাণ ভূমি ভোগ দখল করতে পারবে এর দলিল নিম্নরূপ।

ইসলামি সমাজে একজন ব্যক্তি কি পরিমাণ ভূমি ভোগ দখল করবে সে সম্পর্কে আমরা হুজুর পাক (স:) এর জীবন ইতিহাস থেকেই জানতে পারি। নবী করিম (স:) মক্কা থেকে মদীনাতে হিজরতের পর ভূ-সম্পত্তির যে ইতিহাস পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায়, ''আনসার ও মুহাজিরগণের ভূ-সম্পত্তির স্বত্বাধিকারের অর্থ এই যে, নবী করিম (স:) ও খুলাফায়ে রাশেদীনদের দান ও জায়গীর স্বরূপ যে জমি তাদের দিয়েছেন তাই তাদের সরল জীবন যাপনের কাজে লাগতো। [১]

---

[১] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের জীবন ধারনের জন্য যতটুকু ভূমি অত্যাবশ্যকীয় ততটুকু জমি ব্যক্তি ভোগ করতে পারবে। এটাই আমরা ইসলামের ইতিহাসে দেখতে পাই। ইসলামের সেই প্রাথমিক পর্যায়ে যে সব অনাবাদী ভূমিকে তাঁরা আবাদ করে শস্য উৎপাদনের উপযোগী করতেন সেগুলোও আয়তনের দিক থেকে তেমন বড় ছিল না। মাত্র কতক শতাংশের সমষ্টি মাত্র ছিল। সুতরাং দেখা যায়, ইসলামী সমাজে রাষ্ট্রের নাগরিক বা অধিবাসীগণ দু'ভাগে রক্ষক হিসেবে জমির উপর তাদের অধিকার পায়:

১) যে সব জমি কৃষকেরা নবী করিম (স:) অথবা খুলাফায়ে রাশেদীনের নিকট থেকে দান অথবা জায়গীর স্বরূপ পেতেন অথবা,

২) যে সব অনাবাদী জমিকে তাঁরা আবাদ করে ফসলের উপযোগী করে তুলেছিলেন কেবলমাত্র সে সব জমিতেই তাঁদের ভোগ দখলের অধিকার দেওয়া হতো।

ইসলামি অর্থনীতিতে কৃষির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই এখানে কৃষির অর্থাৎ চাষাবাদের মাধ্যমে ফসল ফলানোর উৎসাহ প্রদান করা হয়। ইসলামি রাষ্ট্রে কৃষির উন্নতি এবং আবাদীর প্রচেষ্টাকে মৃতের জীবন দানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাই পতিত জমিকে চাষের উপযোগী করা হচ্ছে যেন তাকে পুণর্জীবন দান করা। কোন আবাদী জমি যাতে পতিত না থাকে সেদিকে ইসলামি অর্থনীতিতে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়; কারণ, অনুপযুক্ত জমিকে কৃষিকাজের উপযুক্ত করা এবং কাচাঁমাল দ্বারা দেশের সমৃদ্ধি আনয়ন করা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম অংশ। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর 'জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম' নামক গ্রন্থে আলোচনা করেছেন যে, পতিত জমি আবাদযোগ্য ও উত্তরাধিকার বিহীন অবস্থায় পড়ে থাকা জমির মালিকানার ক্ষেত্রে–ইসলামি অর্থনীতিতে দু'টো উপায় রয়েছে।

১) প্রথমত আমিরুল মুমিনিন দেশের জনসাধারণকে জমি আবাদের জন্য উৎসাহিত করবেন এবং এ মর্মে ঘোষণা করবেন যে, যে ব্যক্তি যতখানি পতিত জমি আবাদযোগ্য করে শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করবে, সে পরিমাণ জমির উপর তার অধিকার বর্তাবে।

২) শাসনকর্তার কর্তব্য, পতিত জমিকে যা উত্তরাধিকার বিহীন তথা অধিকার বিহীন জমিকে জায়গীরের মত দেশের জনগণের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া যাতে ঐ সব জমি কৃষির (আবাদের উপযুক্ত) হতে পারে এবং যা বিলি ব্যবস্থায় সাধারণ মুসলমানের উপকারে আসতে পারে।

ফিকাহ্ শাস্ত্রকারগণের মতে যদি এরূপ অনাবাদী জমি তৈরি করা অধিক কষ্ট এবং ব্যয়সাপেক্ষ হয়, তাহলে দু'তিন বছরের খাজনা মাফ করে দেওয়ার অধিকার শাসনকর্তার রয়েছে। এ সমস্ত জমি সম্বন্ধে হযরত রাসূলে করীম (সা:) নির্দেশ দিয়েছেন যে, যে জমির কোন স্বত্বাধিকারী নেই, এরূপ জমিকে কেউ কৃষিকার্যের উপযুক্ত করে নিলে সে ব্যক্তিই এ জমিনের স্বত্বাধিকারী (অবশ্য রক্ষক অর্থে) হওয়ার অধিকারী। যে ব্যক্তি মৃত জমিকে পুর্নজীবিত করে সে জমি তারই।
ইসলামি সমাজে জমি ভোগ দখলের ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি শর্ত তিনটি পালন না করে তাহলে সে জমি ভোগ দখলের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। নিম্নে শর্ত তিনটি আলোচনা করা হলো।

(ক) মৃত জমি অর্থাৎ সে সব জমিতে কোন ঘর-বাড়ির চিহ্ন থাকে না, গ্রামবাসিগণের কোন 'ফায়' সম্পত্তি (যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে প্রতিপক্ষ যে সম্পত্তি ফেলে রেখে যায়, কবরস্থান, চারণভূমি নয়, কারো স্বত্বাধিকার অথবা দখলাধিকার নয়, যে ব্যক্তি এরূপ জমিকে কৃষিকার্যের উপযোগী করে তুলবে তার উপর স্বত্ব বা (ভোগদখলের) অধিকার বর্তাবে।

(খ) যদি কেউ ইমামের (শাসনকর্তার) নিকট থেকে জমি অধিকার করার পর তিন বছর পর্যন্ত কোন শস্য উৎপাদন না করে বা পতিত ফেলে রাখে, তাহলে জমির উপর সে অধিকার হারাবে বা তার নিকট থেকে জমি নিয়ে নেওয়া হবে।

(গ) আবাদী জমির মধ্যে শহর, তালাব (দানকৃত সম্পদ) জলাশয়, 'হবীম' বা মসজিদ সংলগ্ন ভূমি থাকবে না। 'হবীমের' পরিমাণ হবে ৪০ গজ এবং ক্ষেতের জন্য নির্দিষ্ট ভূমির পরিমাণ হবে ৬০ গজ।

উপরিউক্ত শর্তসাপেক্ষে যে কেউ (মুসলিম/অমুসলিম) পতিত জমি আবাদ করলে তাতে তার ভোগ দখলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

এখন আলোচনার বিষয় হচ্ছে ইসলামি সমাজে একজন ব্যক্তি তার জীবন নির্বাহের জন্য কি পরিমাণ জমি ভোগ-দখল করতে পারবে। এ ক্ষেত্রেও ইসলামি সমাজে বা রাষ্ট্রে ভূমি ভোগ-দখলের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি বা তার পরিবারের জীবিকার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ জমি দরকার তাকে সে পরিমাণ জমিই দেওয়া হবে। কোন মতেই তাকে/তাদের তার বেশী ভোগ-দখলের অধিকার দেওয়া হবে না। হযরত উমর ফারুক (রা:) এর কার্যাবলী থেকে এ নীতির সমর্থন পাওয়া যায় যাতে কোন অবস্থায়ই বড় বড় জোতদারি বা জমিদারির সৃষ্টি না হয়। এদিকের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেই তিনি ইসলামি রাষ্ট্রে ভূমি বন্টনের ব্যবস্থা করেছেন। ইরাক ও সিরিয়া বিজিত হলে তিনি সাহাবীদের জায়গীরস্বরূপ কোন ভূমি দান করেননি, এমনকি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে হযরত বিলালের জায়গীর প্রাপ্ত জমি থেকে একটি অংশ কেটে নিয়ে তিনি প্রকৃত হকদারের হাতে তুলে দিয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্রে কেউ জীবন-ধারণের জন্য যা দরকার তার চেয়ে অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করতে পারে না, ফলে সমাজে পূজিঁবাদীর সৃষ্টি হয় না যার পরিণতিতে মানুষের মধ্যে আর্থিক সমতা বিরাজ করে। কেউ কাউকে শোষণ করতে পারে না আর সমাজে শান্তি এভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট হবার পর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জমি থেকে কিভাবে ফসল উৎপদিত হবে অর্থাৎ ফসল উৎপাদনের নীতি সম্পর্কে আলোচনাঃ
জমি থেকে ফসল উৎপাদনের নীতি ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়। ভোগ-দখলের জন্য চাষী যে পমিমাণ জমি (ভূমি) পেল তাতে কিভাবে ফসল উৎপাদন করবে বা কোন নীতিতে উক্ত জমিতে ফসল উৎপাদন করা হবে সে সম্পর্কেও ইসলামে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।

চাষীরা তার নিজের প্রাপ্ত জমিতে নিজেই-চাষাবাদ করে, তা থেকে ফসল উৎপাদন করবে, যদি কোন কারণবশতঃ তাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্বক অপর ভাইকে চাষ করতে দেবে। এ সম্বন্ধে হযরত রাফে বিন খাদিজ বলেন যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমাদের এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, যাতে বাহ্যত আমাদের উপকার হতে পারে, যেমন, আমাদের মধ্যে যদি কারো জমি থাকে, তবে সে জমিকে ভাগে অথবা লগ্নিতে দিতে পারবে না। হযরত (সঃ) বলিয়াছেন যে, যার জমি আছে সে নিজেই চাষ আবাদ করবে অথবা মুসলমান ভাইকে বিনা লাভে সহানুভূতিপ্রদর্শন পূর্বক চাষ করতে দেবে।

...হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেনঃ

> আল্লাহর রাসূল (সঃ) ফরমায়েছেন যার জমি আছে সে নিজেই তা চাষাবাদ করবে বা অন্যকে বিনা লাভে সহানুভূতি প্রদর্শন করে চাষ করতে দেবে। অস্বীকার কারীর প্রতি হযরত (সঃ) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন।"... হযরত আবু জর গিফারী (রাঃ) এর মত এই যে, জমি লগ্নি বা ভাগে দেওয়া নাজায়েজ এবং জমিদারি প্রথা কোন অবস্থায়ই জায়েজ নয়। [২]

[২] প্রাগুক্ত, জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম, পৃঃ ১৩০

এখানে আরও একটি আলোচ্য বিষয় হচেছ, কোন ব্যক্তি অসুস্থ হবার ফলে তার প্রাপ্ত জমি যদি সে চাষাবাদ না করতে পারে, অথচ জমি চাষ-আবাদ না করতে পারলে বা জমি চাষাবাদ করে শস্য উৎপাদন না করলে তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রে কী পন্থা গ্রহণ করা হবে? এক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে ভ্রাতৃত্ববোধের আলোকে যে ব্যক্তি চাষাবাদ করতে অক্ষম তার পাড়া প্রতিবেশীরা তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্বক তার জমি বিনা লাভে চাষাবাদ করে দিবে যাতে ঐ ব্যক্তি বেঁচে থাকতে পারে। আমাদের ভারতবর্ষের স্বনামধন্য মাওলানা শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (র:)ও ইজারা দেওয়াকে বিশেষ গর্হিত কাজ বলে অভিহিত করেছেন।

অতএব, দেখা যাচ্ছে ইসলামি সমাজে শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যার জমি তার নিজেরই চাষাবাদ করতে হবে। অন্যকে ইজারা বা লগ্নি দিয়ে লাভবান হওয়া যাবে না বা বসে বসে সে জমির লভ্যাংশ ভোগ করা যাবে না । যদি কারো জমি চাষের সামর্থ না থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে প্রতিবেশীরা চাষাবাদ করে দিবে, আর যদি কোন ব্যক্তি সচ্ছল অথচ ব্যস্ততার জন্য চাষাবাদ করতে না পারে, সে ক্ষেত্রে বিনা লাভে অন্যকে চাষাবাদ করার জন্য দিয়ে দেবে। আর যদি চাষাবাদ না করে ঐ জমি সে তিন বছর পতিত ফেলে রাখে, তাহলে ঐ জমির উপর সে তার অধিকার হারাবে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, প্রকৃত ইসলামি নীতি মেনে চললে কোন মানুষ বেশী পরিমাণ জমির মালিক হতে পারবে না। আর কোন ব্যক্তির জমির পরিমাণ বেশী না হলে সে অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় করতে পারবে না। আর বেশী সম্পদ না থাকলে তার যথেচ্ছা ব্যবহারও সে করতে পারবে না । ফলে সমাজের অন্যান্য মানুষকে শোষণ করা সম্ভব হবে না। তাই আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়ও যদি ইসলামি ভূমিনীতি বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে সমাজে ধনী গরিবের ভেদাভেদ দূর হবে। সমাজে সম্পদের সাম্য ফিরে আসবে।

আজরফের মতে, মানব জীবনে চাহিদার শেষ নেই। আর মানজীবনের নানাবিধ চাহিদা পুরণ করতে গেলে প্রথমেই অর্থনীতির কথা এসে পড়ে। আর অর্থনীতির আলোচনা করতে গেলেই উৎপাদনের কথা এসে যায়। অর্থনীতিতে উৎপাদন হচেছ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জীবনের নানাবিধ চাহিদার মধ্যে একটি অন্যতম চাহিদা হচ্ছে ক্ষুধা নিবৃত্তি। আর এই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই মানুষ উৎপাদন করে। এ লক্ষ্যে উৎপাদন করতে গেলে তাকে সমাজের অন্য দশজনের সঙ্গে নানাবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে জীবনের পুনর্বিন্যাস করতে হয়। এই জন্য দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মানবজাতির ইতিহাসকে জীববিদ্যা ও অর্থনীতির ইতিহাসের এক সমন্বয় বলে মনে করেন। দেওয়ান আজরফের ভাষায়:

> প্রকৃতির বুক থেকে মানুষ যে' দিন খাদ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে সেদিন থেকেই তার জীবনে দেখা দিয়েছে এক নতুন অধ্যায়। প্রকৃতি থেকে উৎপাদন কালে একদিকে যেমন গবাদি পশু পালন তার পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে তেমনি সে পশুকে হিংস্র বন্য পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, তাদের আহার যোগানো, তাদের আশ্রয় দান যেমন তার পক্ষে কর্তব্য হয়ে পড়েছে। তেমনি উৎপাদিত সে শস্যকে সঞ্চয় করা বা রান্না বান্না করাও তার কাছে প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ অধ্যায়েই তাই শুরু হয়েছে শ্রম বিভাগ। নানাবিধ পেশার লোকের যেমন এ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, তেমনি নারী পুরুষের শ্রমবিভাগ অনিবার্য হয়েছে। [৩]

এই শ্রম বিভাগ অনুসারে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারীরা এক ধরনের কাজ করে, পুরুষেরা অন্য ধরনের কাজ করে। আর এই উভয়ের সম্মিলিত কর্মের ফলেই বিভিন্ন জিনিস উৎপাদিত হয়। এটা ছিল আদিম বা পূর্বের উৎপাদন ব্যবস্থার স্বরূপ। আধুনিক যুগে আদি কালের সে শ্রমবিভাগ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। সমাজে কর্মের ধারা অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণিরও সৃষ্টি

---

[৩] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, **জীবন দর্শনের পুনর্গঠন**, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ. ৪৪-৪৫

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে, যেমন: কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী ইত্যাদি। আবার শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের শ্রমকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে এক এক শ্রমিককে এক এক অংশের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এভাবে কৃষি, শিল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদন হচ্ছে। তবে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাঁর বই-এ মূলত শস্য উৎপাদনের কথা বলেছেন।

উৎপাদন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে গিয়ে তাঁর মনে একটি প্রশ্ন জাগ্রত হয়েছে, সে প্রশ্নটি হলো: উৎপাদিত শস্যের মালিকা কে হবে? আর এর বন্টন নীতিটাই বা কী হবে? তাঁর মতে সুদূর অতীতেও এ প্রশ্নটা ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সুদূর অতীত থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত এ সমস্যাটির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, কোন মতামতই সুষ্ঠ বন্টনের মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত সমস্যার সমাধান করে শান্তি দিতে পারে নি তাই তিনি মনে করেন যে, একমাত্র ইসলামের বন্টন পদ্ধতিই এর সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো দেখিয়েছেন বন্টনের ক্ষেত্রে অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থার সাথে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার কতটুকু পার্থক্য রয়েছে ।

দেওয়ান আজরফের মতে, বর্তমানে উৎপাদন এককভাবে খুব কমই হয় অথচ যার দ্বারা প্রথমে উৎপাদন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় বা ভূমি যার অধিকারে থাকে , তাকে উৎপাদিত শস্যের মালিক বলে আদিকাল থেকে বন্টন নীতি গৃহীত হয়ে আসছে এবং আজও পৃথিবীর অনেক দেশেই এ নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। উৎপাদক তাঁর নিজের ও পরিবারের জন্যে যথোপযুক্ত খাদ্যশস্য অধিকারে রাখার যেমন দাবী করে, তেমনি অতিরিক্ত শস্যও তার ইচ্ছা মাফিক কাউকে দিয়ে দেওয়া বা বিক্রি করে তা থেকে লাভবান হওয়া তার ন্যায়ত দাবী বলে মনে করে। অতি প্রাচীন কালে ব্যক্তির জীবন ও তার সহায় সম্বলকে রক্ষার দায়িত্ব যারা গ্রহণ করেছিল- তারা রাজা বা সামন্ত প্রভু হিসেবে আধিপত্য বিস্তার করে তার উৎপাদিত ফসল তাদেরই গোলায় (শস্য ভান্ডারে) জমা করতে বাধ্য করে।

বর্তমান কালে সে বাধ্যবাধকতা না থাকলেও উৎপাদনের জন্যে অন্যের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে হয় বলে, তাকে বাধ্য হয়েই তার উৎপাদনের বড় একটা অংশ অন্যের হাতে তুলে দিতে হয়। প্রাচীন কালে সামন্ত সর্দার বা রাজারা যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন, বর্তমান কালেও লগ্নী ব্যবসায়ীরা দাদন ইত্যাদি প্রথার মাধ্যমে সে ভূমিকা পালন করছেন।

এখন মূল আলোচ্য বিষয় হচেছ উৎপাদিত ফসলই হোক বা যে কোন দ্রব্যই হোক তা কে পাবে? যুগ যুগে এ প্রশ্নের উত্তর বিভিন্নভাবে দেয়া হয়েছে। প্রাচীনপন্থীদের মত হচেছ উৎপাদকই উৎপাদিত ফসল পাবেন। আধুনিক কালের প্রারম্ভে বলা হয়েছে এর প্রকৃত মালিক উৎপাদক; তবে বন্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে । অতি আধুনিক যুগেও বলা হচ্ছে উৎপাদন ও বন্টন উভয়ই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হলে এ দ্বন্দ্বের অবসান হবে। এ সম্পর্কে দেওয়ান আজরফ বলেন:

> এ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম প্রণিধাণযোগ্য বিষয় হচেছ মানব-প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং তারই আলোকে এ বিষয়ের মীমাংসা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ব্যক্তি ও সমাজের দাবীর সুষ্ঠু সমাধান। মানুষ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এককভাবে কোন দিন সফলকাম হতে পারেনা। তার সাহায্যের জন্য আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অনেক লোকেরই সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তার প্রকৃতিতে উৎপাদিত শস্য বা দ্রব্য একান্ত এককভাবে ভোগ করার একান্ত প্রবৃত্তি সুদুর অতীতেও ছিল না, বর্তমানেও নেই। প্রত্যেক উৎপাদকই চায় তার স্ত্রী–পুরুষ পরিবার বা আত্মীয়–স্বজনসহ সে উৎপাদিত দ্রব্য ভোগ করবে। এতে অংশ নির্দেশে তারতম্য হতে পারে তবে একা সর্বস্বই সে ভোগ করবে এরূপ মনোবৃত্তি কোন মানুষেরই কোন-কালে ছিল না, আজও নেই। প্রশ্ন ওঠে তাহলে মানুষ সঞ্চয় করতে চায় কেন এবং সঞ্চিত অর্থকে পুঁজি করে নানাবিধ সম্পদের অধিকারী হতে মরিয়া হয়ে ওঠে কেন? তার উত্তরে বলা যায় মানুষের মধ্যে প্রেম, দয়া, মায়া, মমতা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি রয়েছে সত্যি, তবে বিত্তবান হওয়া বা অপরকে শোষণ করে লাভবান হওয়ার প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে এখনও বর্তমান রয়েছে। সে প্রবৃত্তির বশবর্তী হওয়ার ফলেই মানুষের মনে দেখা দেয় উদগ্র আকাঙ্ক্ষা, যার কোন সমাপ্তি নেই। সে বাসনার ফলেই সমাজের অন্য দশজনের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। [৪]

[৪] ঐ, পৃ. ৪৫-৪৬

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে মানুষকে এককভাবে উৎপাদন করার সুযোগ দিয়ে তাকে নি:স্বার্থ বা মানব প্রেমিক করে তোলার কোন উপায় আছে কিনা? এরই ক্রমধারায় আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, উৎপাদন কি ব্যক্তির না রাষ্ট্রের অধীনে থাকবে? মানব মনে পরার্থপরতার প্রমাণ আমরা সর্ব কালের নবী রাসূল বা মহামানবগণের জীবনকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই। এ সম্পর্কে বলা যায়, সব মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ নি:স্বার্থ হয়ে উৎপাদন করা কোন যুগেই সম্ভবপর ছিল না, বর্তমান কালেও নেই। শিশুকাল থেকে মানুষকে এ বিষয়ে শিক্ষাদান করলেও তার মননকে সম্পূর্ণভাবে নি:স্বার্থ করা সম্ভবপর কিনা তা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে যেসব দেশে বর্তমানে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন সে সব দেশেও মাঝে মাঝে স্বার্থপরতার নজির পাওয়া যায়। এজন্য সে সব দেশে এসব লোকদের কঠোর হস্তে দমনের জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে । মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায়ও সম্পূর্ণরূপে পরার্থপর হওয়ার উদাহরণ পাওয়া যায় নি। কাজেই মানব প্রকৃতিকে সমূলে বিনাশ করে উৎপাদন ব্যবস্থায় তাকে নিয়োগ করতে গেলে সুষ্ঠু উৎপাদন হবে এরূপ আশা করা যায় না। অপরদিকে, মানব জীবনে অবাধ স্বাধীনতার নামে ব্যক্তি বা দেশকে শোষণ করা কোন মানবীয় আদর্শ হতে পারে না। এ দ্বন্দ্বের অবসান হতে পারে, যদি ব্যক্তিকে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রেখে উৎপাদনের উদ্বৃতাংশ ব্যবহার করে কেউ যেন অন্য কাউকে শোষণের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে।

অপরদিকে, ব্যক্তি জীবনের স্বার্থপরতা সমষ্টি বা রাষ্ট্রীয় জীবনেও দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে পার্থক্য শুধু একটাই যে, ব্যক্তিকে প্রাথমিক সংখ্যা হিসেবে গণ্য না করে রাষ্ট্রকে প্রাথমিক সংখ্যা হিসেবে গহণ করা হয়েছে। ব্যক্তি জীবনে যদি স্বার্থপরতা দেখা দেয়, রাষ্ট্র যেহেতু ব্যক্তি দিয়েই গঠিত হয় তাহলে তা রাষ্ট্রীয় জীবনেও দেখা দিতে পারে। এ সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন:

ইসলামি অর্থনীতির যোগ রয়েছে মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে। এজন্য মানব প্রকৃতিতে উৎপাদন না করে কিভাবে তাকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সফল ও বন্টনের ক্ষেত্রে পরার্থপর করে তোলা যায়, তাঁর রয়েছে নীতি নির্দেশ। প্রকৃত পক্ষে ইসলাম যে সমাজ বা রাষ্ট্র গঠন করতে চায়-তা আদর্শিক বটে, তবে তার জন্য মানব সকলকে প্রস্তুত করে তোলে। ইসলাম যে দিক দৃষ্টির প্রবর্তন করেছে তার সর্বপ্রথম মন্ত্র হ'ল, আল্লাহর ঐক্য ও নানাবিধ গুণাবলির সমাবেশ। মানুষের জীবন তার জীবন-দর্শনের আলোকে পরিচালিত হয় বলে- ইসলাম সর্বপ্রথমে একটি বিশিষ্ট জীবন-দর্শন মানব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে- তারই আলোকে অর্থনীতি পরিচালনা করার চেষ্টা করেছে। সর্বপ্রথম আল- কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে, 'আসমান জমিনের সবকিছুর মালিকানাই আল্লাহর।' ৯৪:১৯:১৩১০। [৫]

দেওয়ান আজরফ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অর্থনীতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তার সাথে মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য যোগ করে দেখিয়েছেন যে, এই সব মানব সৃষ্ট মত ও পথ দিয়ে কোন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুললে তার মাধ্যমে মানুষের কাঙ্ক্ষিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সুদূর পরাহত। কারণ মানুষের পিছনে যদি কোন আদর্শ না আর থাকে তাহলে মানুষ কখনও পুরোপুরিভাবে নিজের স্বার্থকে ত্যাগ করতে পারে না। মানুষ তার স্বার্থকে ত্যাগ করতে না পারলে যত রকমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথাই বলা হোক না কেন-তার মাধ্যমে কোন দিনই মানুষের শান্তি আসতে পারে না।

তাই দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ যেমন তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ধারার মধ্যে ইসলামি গণতন্ত্রের প্রাধান্য দিয়েছেন তেমনি সেই গণতন্ত্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ইসলামি অর্থনীতির কথা বলেছেন। ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যক্তি জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবন বাস্তবায়িত করতে হলে মানুষকে কী ধরনের হতে হবে, তিনি সম্পর্কে প্রকৃত ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী রকম ছিল অর্থাৎ সাহাবীরা কিভাবে সেটা বাস্তবায়ন করেছিলেন তার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং সেই অর্থনীতি বাস্তবায়ন করতে গেলে মানুষকে কি রকম হতে হবে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

---

[৫] ঐ, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং দেওয়ান আজরফের মতে, ইসলামি অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্য মানুষকে মননের দিক থেকে পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে হবে এবং এ কথা অন্তরে ধারণ করতে হবে যে, এ জগতের যে কোন বিষয় বস্তুর উপর ব্যক্তির, সমাজের বা রাষ্ট্রের মালিকানা বিলোপ করে একমাত্র আল্লাহর মালিকানাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কাজেই ব্যক্তির উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভূমি , শস্যাদি বা যন্ত্রপাতির মালিক যেমন ব্যক্তি নয় তেমনি উৎপাদিত শস্য বা দ্রব্যের মালিকও সে নয়। তাকে কোন ভোগদখলকারী রূপে বা সংরক্ষণকর্তা রূপে গণ্য করে ইসলামি অর্থনীতির বন্টন নীতি পরিচালনা করা হয়। ভোগদখকারী রূপে সে তার ভোগের অংশ কতটুকু পাবে তারও স্পষ্ট নির্দেশ ইসলামে রয়েছে। আল কুরআনে আল্লাহ তাঁর রসূলকে বান্দার ভোগদখল সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর শিখিয়ে দিয়েছেন এভাবে:

> আল্লাহ বলেন তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, তারা কি পরিমাণ ব্যয় করবে? আপনি বলুন, ''তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছু। (২:২৭:২১৯) প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছু সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জাহেরী মাজহাবের ইমাম ইবনে হাজম-যে ভাষ্য করেছেন তা অতিশয় স্পষ্ট, তাদের জীবিকার নির্বাহের জন্য অত্যাবশ্যক অর্থাৎ যা না হলে নয়, তা হলো- ক্ষুধার অন্ন, পরিধানের বস্ত্র এবং ঝড়-বৃষ্টি, গরম রোদ ও প্লাবন থেকে রক্ষা করতে পারে-এমন বাসগৃহ।'' [৬]

কাজেই উৎপাদকের পক্ষে মোটামুটিভাবে জীবিকা সংস্থানের জন্য যা দরকার তা রেখে বাকিটুকু দান করা অবশ্যই কর্তব্য। এ সম্বন্ধে জনাব রাসূলে আকরামের বাণী ও সাহাবীদের উক্তি নিম্নরূপঃ

হযরত আবু সাইদ খুদরী বলেন, নবী করিম যেভাবে উল্লেখ করেছেন-তাতে আমাদের ধারণা জন্মেছে যে: "আমাদের মধ্যে কারো কোনো প্রকারের মালের উপর হক বা দাবী থাকতে পারে না"। তাহলে এ কথা সত্যই প্রমাণিত হচ্ছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদিত শস্য বা দ্রব্য ব্যক্তিকে সমাজের অপরাপর সদস্যের প্রয়োজনে অকাতরেই বিলিয়ে দিতে হবে। [৭]

---

[৬] ঐ, পৃ. ৪৮
[৭] ঐ, পৃ. ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

তাই বলা যায় কোন রাষ্ট্রে যদি এ রকম আদর্শের মানুষ থাকে এবং তাদের মধ্যে যদি এ ধরনের মনোভাব জাগ্রত হয় তাহলে কোন মানুষের মধ্যে দু:খ-কষ্ট থাকবে না। রাষ্ট্রে সবাই সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

উপরের আলোচনায় যে উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে, তাতে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে উৎপাদন এককভাবে না সমষ্টিগতভাবে হবে? এর উত্তর আমরা হুজুর (সা:) এর জীবনীর মধ্যে লক্ষ করি যে সংঘবদ্ধভাবে উৎপাদন ব্যবস্থাও ইসলাম অনুমোদন করে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, রাসূল (সা:) হিজরতের পরে মদীনার আনসারগণ মোহাজিরদের সর্বদিক দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। অর্থ, সম্পদ, খাদ্য, বস্ত্র, গবাদি পশু ইত্যাদি দিয়েও তারা সহযোগিতা করেন। অবশিষ্ট থাকে কতগুলো খেজুর গাছ যেগুলোর ফল আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে-ভোগ করার ব্যবস্থা করা হয়। একদিন একজন আনসার সেই খেজুর গাছগুলোও ভাগ করে দেবার জন্য অনুরোধ করলে আল্লাহর রাসূল (সা:) তাতে বিরক্ত হয়ে বলেন, তোমরা খাচ্ছ, আমরাও খাচ্ছি, এতে ভাগাভাগির কেন প্রয়োজন? এটাই ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের মানুষের আদর্শ। একজন সুখে থাকবে আর তার অপর ভাইয়েরা কষ্ট করবে এটা সাহাবীরা কখনও চিন্তা করতে পারতেন না। তাই তাঁরা নিজেদের সম্পদ, স্ত্রী, এমনকি নিজেরা নিজেদের জীবনও অপর ভাইয়ের জন্য বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

এ দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে উৎপাদিত শস্য কোন দেশের লোক সমানভাবে ভোগ করার সুযোগ পায়, তা'হলে সমষ্টিগতভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

এ নীতিকে আরও সম্প্রসারিত করে উৎপাদনের সব উপকরণই রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়ে সব মানুষকেই সমানভাবে ভোগ করার অধিকার দেয়া যেতে পারে। তবে কোন বিশেষ দেশের

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের মধ্যে একজন যেন অপর জনকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে সেদিকে ইসলামি রাষ্ট্রের শাসন কর্তার সতর্ক থাকতে হবে।

সুতরাং রাসূলে আকরাম (সা:) অথবা খোলাফা-ই-রাশেদীনের আচরণ থেকে লক্ষ করা যায় যে, ইসলামি রাষ্ট্রে উৎপাদন পদ্ধতি ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত উভয় ভাবেই হয়েছে। যে সব ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তির অধীনে সে সব ক্ষেত্রে যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছুই সমাজের কল্যাণে ব্যবহার হয় তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো; যার ফলে রাষ্ট্রে সবু মানুষ সুখে বসবাস করতে পেরেছে, কেউ কারও প্রতি কোন অভিযোগ আরোপ করেনি। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রের অধীনে যে সব ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পন্ন হতো, সে সব ক্ষেত্রেও উৎপাদনের বাড়তি অংশ যাতে অন্য দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হয় তার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হতো।

এ প্রসঙ্গে দেওয়ান আজরফ তাঁর 'জীবন দর্শনের পূর্নগঠন'- বই এ সুরা ইউসুফের একটি ঘটনা উল্লেখ করে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সূরা ইউসুফ যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাত বছরের কাহাত মালি বা দুর্ভিক্ষের বর্ণনা রয়েছে, তাতে বলা হয়েছে পরবর্তী সাত বছরের উদ্বৃত্ত যেন সঞ্চয় করা হয় অন্যান্য ঘাটতি দেশের লোকদের প্রয়োজনে। এ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ হিসেবে আমরা পরস্পর ভাই ভাই এবং আমাদের মধ্যে যারা উদ্বৃত্ত অঞ্চলের লোক তাদের পক্ষে ঘাটতি অঞ্চলের লোকদের আহার্য দ্রব্য তথা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা অবশ্য কর্তব্য। মূল কথা হলো, মালিকানা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছুরই দাবী না করে উৎপাদন ব্যবস্থা প্রয়োজনে ব্যক্তির হাতে বা অবস্থা বিবেচনায় সমষ্টির হাতে ছেড়ে দিতে ইসলামি অর্থনীতিতে কোন আপত্তি নেই।

ব্যক্তির হাতে উৎপাদন বা উপার্জনের অধিকার ছেড়ে দেওয়ার পরও যে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তির পক্ষে উৎপাদন করে জীবিকার সংস্থান করা সম্ভবপর হয় না, সে সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

তা পরিপূর্ণ করে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। এ ছাড়া অন্ধ, বিকলাঙ্গ, পঙ্গু, আতুর প্রভৃতি উপার্জনে অসমর্থ লোকদের ভরণ-পোষণের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করা ইসলামি রাষ্ট্রের কর্তব্য । অন্যদিকে যাদের উৎপাদন বা উপার্জন তাদের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্ঠ নয়, ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের আয়ের পরিপূরণ করা অবশ্য কর্তব্য। উৎপাদন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হলে প্রত্যেক ব্যক্তির আহারের ব্যবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা, ওষুধ পথ্যাদির ব্যবস্থা অর্থাৎ মানব-জীবনের মৌলিক চাহিদা পুরণের জন্য যাবতীয় কিছুর ব্যবস্থা করা ইসলামি রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ আধুনিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি অর্থাৎ পুজিঁবাদ, সমাজতন্ত্র ও এদের সাথে ইসলামি অর্থনীতির তুলনামূলক আলোচনা করে ইসলামি অর্থনীতি যে মানুষের জন্য অধিকতর কল্যাণ বয়ে আনতে পারে তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর ভাষায়:

> আধুনিক অর্থনীতি বা রাজনীতির আলোকে বিচার করলে ইসলামি অর্থনীতিকে কোন এক বিশেষ আখ্যায় আখ্যায়িত করা যায় না। এ নীতি পূঁজিবাদমূলক নয়, নিরীক্ষরবাদী সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তিগত মৌলিক সূত্র হচ্ছে ব্যষ্টির মালিকানা বা সমষ্টি মালিকানা। পূঁজিবাদে ব্যষ্টিকে তার পূঁজি বা ক্যাপিটালের মালিক হিসেবে তাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তেমনি নিরীশ্বরবাদী সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের যাবতীয় বস্তু ও সরঞ্জামের মালিক হিসেবে রাষ্ট্রকে গণ্য করে উৎপাদিত বিষয়ের মালিকানা রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করা হয়েছে। ইসলামি অর্থনীতিতে কোন অবস্থায়ই মালিকানা আল্লাহ ব্যতিত অপর কারো উপর ন্যাস্ত করা হয় নি। [৮]

পূঁজিবাদী অর্থনীতিতে পূর্বেই ধরে নেওয়া হয়েছে মানুষ সর্বাবস্থায় স্বার্থপর জীব, তার পক্ষে স্বার্থপরতা ত্যাগ করে পরার্থপর হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই উৎপাদন বন্টন উভয় ক্ষেত্রেই সে তার নিজের সুখ-সুবিধা দ্বারা পরিচালিত হয়।

[৮] ঐ, পৃঃ ৫০-৫১

Dhaka University Institutional Repository

নিরীশ্বরবাদী সমাজতন্ত্রে ধরে নেওয়া হয়েছে মানুষকে শিক্ষা-দীক্ষায় দীক্ষিত করলে সে পরার্থপর হতে বাধ্য। কাজেই উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের করায়ত্ত হলে সে যেমন নিজের জন্য উৎপাদন করবে তেমনি অপরের জন্যও উৎপাদন করবে।

ইসলামি অর্থনীতিতে এরূপ কোন স্বত:সিদ্ধ বিধি বিধান গ্রহণ করা হয়নি। মানুষকে নানাবিধ দোষ ও গুণের অধিকারী রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। তার কু-প্রবৃত্তিগুলো যাতে সু-প্রবৃত্তিতে পরিণত হয় তার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা রয়েছে। যাতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা দ্বারা প্রণোদিত না হয়ে সে নিজের ও অপরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ রেখে অগ্রসর হয় এজন্য গোড়াতেই এ বিশ্বের মালিকানা আল্লাহর হাতে অর্পণ করা হয়েছে। এতে ব্যষ্টি স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখেও যাতে শোষণের কোন অবস্থান না থাকে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

অপরদিকে, উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে থাকলেও যে সমস্ত দেশ অধিক উৎপাদন করে তারা যেন অন্য দেশকে শোষণ করতে না পারে তার বিধি-বিধান রয়েছে। মোদ্দা কথা হল, ইসলাম এমন একটি দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে চায় যাতে মানুষ তার পশু প্রবৃত্তিকে সংযত করে প্রকৃত মানবিক বৃত্তি জাগ্রত করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মানব জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় তার জীবন-দর্শনের আলোকে। সে জীবন দর্শনে শোষণের কোন সুযোগ না থাকলে ধনী-দরিদ্রের এত ভেদাভেদ থাকত না। একথা আজ সবাই অবগত যে, হযরত রাসূলে আকরামের (দ:) সাহাবীদের মধ্যে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা:) অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। অপরদিকে হযরত আলী (রা:) এবং আবুজর গিফারী (রা:) বিত্তহীন ছিলেন। অথচ ইতিহাস পাঠে জানা যায়- হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফের জীবন যাপনের মান হযরত আলী (রা:) এবং হযরত আবুজর গিফারী থেকে উন্নততর ছিল না। তিনি প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন; তবে এগুলো তিনি নিজের বা পরিবার-পরিজনের জন্য সংগ্রহ করেননি বরং এগুলো মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

কল্যাণের জন্য সঞ্চয় করেছেন। তিনি মহামারী, দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা বা ইসলাম প্রচার-প্রসার, প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষার জন্য তা অকাতরে খরচ করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত ধনাগার ও সরকারী বায়তুল মালের মধ্যে তফাৎ ছিল এতটুকু যে, তিনি ইচ্ছে মত তাঁর নিজের ও পরিবারের সুখ-সুবিধার জন্যও ব্যয় করতে পারতেন; কিন্তু বায়তুল মালের অর্থ কেবলমাত্র সর্ব সাধারণের কল্যাণে ব্যয় করা হত।

হযরত উমর (রা:) এর লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের সমস্ত মুসলিম অধিবাসীকে রাষ্ট্রের অঙ্গ জ্ঞান করে রাষ্ট্রগত প্রাণ করে তোলা। সেজন্য তিনি তাদের প্রত্যেকের বৃত্তি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যাতে তারা জীবিকা সংস্থানের জন্য নির্ধারিত কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে লিপ্ত না হয়; এ দিকে তিনি কড়া দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর খিলাফতের সময় কোন অমুসলিম মুসলমান হয়ে গেলে তার সম্পত্তি দেশের লোকদের মধ্যে বন্টন দেওয়া হতো।

এ রাষ্ট্রে যাতে কোন অবস্থায় কোন লোকের হাতে অতিরিক্ত পূঁজি সঞ্চিত না হয় সেজন্য আদেশ করা হয়েছে: ''এবং যারা সোনা-রুপা সঞ্চয় করে আল্লাহর পথে (মানবতার কল্যাণের জন্য) ব্যয় করে না তাদের নিকট এক কষ্টদায়ক শাস্তি ঘোষণা করে দাও''। [৯]

এ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাসূল আকরাম (স:) যা বলেছেন, সাহাবী আবু হুরায়রা (রা:) তা বর্ণনা করে বলেন: ''রোজ কিয়ামতে এ সকল লোকদের পার্শ্বদেশ, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে''।

---

[৯] সূরা-তওবা, ৯:৫:৩৪

উমাইয়াদের আধিপত্য বিস্তারের সুচনায় এবং সিরিয়াতে মু'আবিয়া গভর্ণর থাকাকালে এ আয়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করে হযরতের প্রিয় সাহাবী হযরত আবু জর গিফারী (রা:) বিপ্লবের সুচনা করেন। তার সুদৃঢ় অভিমত ছিল: ''প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন বিত্তই কেউ রাখতে পারবেনা।''

ইসলাম মানুষকে জীবনযাপনের জন্য যে নিয়মনীতি নির্ধারণ করেছে সে নীতি অনুসারে জীবন-যাপন করলে কোন অবস্থায়ই মানুষের হাতে পূঁজি সঞ্চিত হতে পারে না। যাকাত ছাড়াও আরও অনেক ধরনের দান সব সময়ই সম্পদশালী ব্যক্তিকে করতে হবে। যাবিল কুরবা (নিকট আত্মীয়), ইয়াতিমা, মাসাকিনা (নি:স্ব) ও ইবনে সাবিল (পথিক)অর্থাৎ পিতৃমাতৃহীন ছেলে-মেয়ে, বিত্তহারা ও সহায়-সম্বলহীন পথিকের অধিকার রয়েছে ধনীর মালের উপর। আল-কুরআনে তাদের প্রাপ্য প্রদান করার জন্য জোর তাগিদ রয়েছে। কেবল কুর-আনেই নয়, হাদীস শরীফেও দানের ফজিলত (পুরস্কার) ঘোষণা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রা:) এর বর্ণনা:

> আল্লাহর রসূল (স:) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, 'হে বনি আদম আমি পীড়িত ছিলাম। কিন্তু তুমি আমায় দেখোনি।' সে উত্তর করবে, 'হে আমার প্রভু, আমি তোমাকে কিভাবে দেখবো, তুমি যে নিখিল বিশ্বের প্রভু?' তিনি (আল্লাহ) বলবেন, 'তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দা পীড়িত ছিল, কিন্তু তুমি তাকে দেখোনি, তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে দেখতে (শুশ্রুষা করতে) তা'হলে তার মাঝেই আমাকে পেতে? হে বনি আদম। আমি তোমার কাছে আহার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমায় আহার দাওনি।' সে উত্তর দেবে, 'হে আমার প্রভু, আমি তোমাকে কিভাবে খেতে দিতে পারতাম-যেহেতু তুমি সমস্ত ভূবনের প্রভু? তিনি (আল্লাহ) বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে চাওয়া সত্ত্বেও তুমি খেতে দাও নি-তুমি কি জানতে না যদি তুমি তাকে খেতে দিতে তাহলে আমাকেই খেতে দিতে? [১০]

[১০] গৃহীত, জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

এতসব আইন কানুন থাকা সত্ত্বেও যদি মানুষের মধ্যে সঞ্চয় করার প্রবৃত্তি জেগে উঠে তাহলে প্রয়োজনবোধে খলীফা বা আমির ধনীদিগকে দরিদ্রদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য করতে পারেন। ইবনে হাজম এ আদেশের (অর্ডিন্যান্স) এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন:

> প্রত্যেক মহল্লার ধনীদের উপর গরিব-দু:খীদের জীবিকার জন্য দায়ী (জামিন) হওয়া ফরয (অবশ্য কর্তব্য)। যদি বায়তুল মালের আমদানী ঐ গরিবদের জীবিকার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তাহলে শাসক বা আমির ধনীদের এ কাজের জন্য বাধ্য করতে পারেন। অর্থাৎ তাদের অতিরিক্ত মাল বলপূর্বক গরিবদের প্রয়োজনে খরচ করতে পারেন। তাদের জীবিকার সংস্থানের জন্য আবশ্যক-ক্ষুধায় অন্ন, পরিধানের বস্ত্র এবং ঝড়-বৃষ্টি, গরম রোদ ও প্লাবন থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে এমন বাসগৃহ। [১১]

ইসলামি অর্থনীতির গোড়ার কথা হচ্ছে ইসলামের বিশ্বদৃষ্টি। তাতে এ ভূমন্ডলের সবকিছু আল্লাহর মালিকানা ভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের মনে হয় এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তিলাভ সম্ভবপর হবে না। কারণ ব্যক্তিগত মালিকানাকে সমষ্টিগত মালিকানায় পরিণত করলেও এ মালিকানা থেকেই উৎপত্তি লাভ করে দেশে দেশে দ্বন্দ্ব যার ফলে মানুষের মধ্যে শান্তি আসতে পারে না।

কাজেই উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যাতে কেউ হাতে না রেখে অন্যের প্রয়োজনে দান করে অথবা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা রাখে। তাহলে অন্যের প্রয়োজন মিটবে; অভাব দূর হবে। একে অপরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে। তাই দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ অর্থনীতির কথা বলতে গিয়ে ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মানব-প্রকৃতি এবং বিভিন্ন দেশে প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত সমস্ত শাসন পদ্ধতি ও অর্থনীতির বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে যত রকমের অর্থনৈতিক

---

[১১] গৃহীত, জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ধতি আছে তাদের মাধ্যমে মানুষের পুরোপুরি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসেনি বরং ইসলামি অর্থনৈতিক পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে যুগে মারামারি হানা-হানি, যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকতো, মানুষ প্রকাশ্যে একজন অন্যজনকে হত্যা করতো, মানুষ জীবন্ত মেয়ে সন্তানকে কবর দিয়েছে, সে যুগে একজন অন্যজনকে নিজের সম্পদ দান করেছে, যাতে কেউ ভুখা থাকে নি । তাই অধ্যক্ষ আজরফ মনে করেন , ইসলামি অর্থনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে ও রাষ্ট্রে মানুষে মানুষে সম্পদের ভেদাভেদ দূর করে শান্তি -সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনা সম্ভব। বস্তুত ইসলামি অর্থনীতির মূলসূত্র ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিরই ফলশ্রুতি। এখানে জোতদারের পক্ষে ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করার যেমন কোনো সুযোগ থাকে না, ঠিক তেমনি থাকে না শুধুমাত্র নিজেদের ধন সম্পদের প্রাচুর্য ও তার থেকে আনন্দ ভোগ করার সুযোগ। ইসলামি রাষ্ট্রে ধনীদের ধন-সম্পদে গরিবদের হককে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, ' তিনি পৃথিবীর সব কিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন; অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পৃথিবীর সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন। কোন কিছুই সৃষ্টিগতভাবে ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নয়; বরং প্রয়োজন মেটানোর জন্য সকলেরই সম্পত্তি বটে। সব কিছু যেহেতু মানুষের কল্যাণার্থে ও মঙ্গল সাধনার জন্য সৃজন করা হয়েছে, সে কারণে সব কিছুতেই সব মানুষের ভোগ-দখলের অধিকার সংরক্ষিত।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, যদিও দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ একজন সাম্যবাদী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ছিলেন, তথাপি তিনি সমাজের বা রাষ্ট্রের পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থনীতি যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি নিয়ে বিশ্লেষণ করে এমন একটি অর্থনৈতিক পদ্ধতি উপহার দেবার চেষ্টা করেছেন; যেখানে উৎপাদন, বন্টন পদ্ধতি, ভূমি আইন এবং ভূমি ভোগ দখলের অধিকার এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যেটার বাস্তবায়ন হলে সমাজে বা রাষ্ট্রে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সমতা ফিরে আসবে। রাষ্ট্রে যদি জনসাধারণের মধ্যে আর্থিক সমতা বিরাজ করে তাহলে

Dhaka University Institutional Repository

মারামারি হানাহানি ইত্যাদি থাকে না। যদি সমাজ বা রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তাহলে মানুষের মধ্যে সুখ শান্তি বিরাজ করে। এই দিক বিবেচনা করে দেওয়ান আজরফ উপরিউক্ত অর্থনৈতিক রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মূলত একজন সমন্বয়বাদী দার্শনিক। পূর্বেই উল্লেখ করেছি তিনি প্রায় শতাধিক খানেক পুস্তক এবং সহস্রাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর রচিত অন্যতম প্রসিদ্ধ পুস্তক হচ্ছে; **জীবন দর্শনের পূর্নগঠন, জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম** এবং **'ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে'** এসব পুস্তকে এবং অনেকগুলো প্রবন্ধে তিনি অর্থনীতি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর অর্থনৈতিক আলোচনা হচ্ছে মূলত ইসলামিক অর্থনীতি নিয়ে।

অনেকে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের এভাবে সমালোচনা করেন: তিনি হচ্ছেন দর্শনের ছাত্র এবং পরবর্তীতে দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁর বিষয় অর্থনীতি নয়; তাহতো তিনি অর্থনীতিবিদ নন। কাজেই অর্থনীতি সম্পর্কে তিনি যে মতবাদ দিয়েছেন এটা ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয়না। তাছাড়া তিনি শুধু ইসলামের প্রাথমিক যুগে কিভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে মানুষের মধ্যে আর্থিক সমতা বিরাজ করেছিল, মানুষ কিভাবে সুখে শান্তিতে বসবাস করেছিল সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই চৌদ্দশত বৎসর পূর্বের সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা কিভাবে সম্ভব বা বর্তমানে সেই অর্থনীতির রূপরেখা কেমন হবে এ সম্পর্কে কোন দিক নির্দেশনা দেননি।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন শতাব্দীর সাক্ষী। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় দুটো বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন। বৃটিশ আমল, পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও একজন দার্শনিক ও চিন্তাবিদ হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাছাড়া ছোট সময় থেকেই তিনি বামপন্থী রাজনৈতিক চিন্তার সাথে জড়িত ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি প্রচুর দেশী, বিদেশী ও মার্কাসীয় দর্শন, ও অর্থনীতি এবং সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। ফলে দর্শন ও ধর্মের পাশাপাশি অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কেও তাঁর প্রচুর জ্ঞান ছিল এবং এ সম্পর্কে তিনি প্রচুর

Dhaka University Institutional Repository

লিখেছেন। তিনি তাঁর লেখনীগুলোতে সারা বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে প্রচলিত অর্থনীতির কারণে পৃথিবীর প্রায় শত ভাগ দেশে শোষণ-নির্যাতন, মারামারি, হানাহানি চলছে। বেশিরভাগ দেশের মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারছে না। রাশিয়ার মতো দেশ ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। চীন ও জাপানের মতো উন্নত দেশেও হতাশাজনিত কারণে আত্মহত্যার হার অনেক বেশী।

তাই দেওয়ান আজরফ তাঁর আলোচনার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে সত্যিকার ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে আইয়ামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ স্বর্ণযুগে পরিণত হয়। সে সময়ে মানুষের মধ্যে এমন সম্পর্ক কায়েম হয়েছিলো যে একজন মানুষ অপর একজন মানুষের জন্য তাঁর সম্পত্তি থেকে শুরু করে ঘরবাড়ি এবং এমনকি নিজের স্ত্রীকে ক অপর ভাইয়ের প্রয়োজনে নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত প্রয়োজনে অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে বিবাহ দিয়েছে। এরূপ সমাজে শোষণ, নির্যাতন বলতে কিছুই ছিল না। একজন অপরজনের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করতো না।

দেওয়ান আজরফ মনে করেন, সেই সময়ের মতো যদি অর্থনৈতিক পদ্ধতি সমাজে চালু হয় তাহলে আবার সেই রকম সামাজিক পরিবেশ ফিরে আসা সম্ভব। যারা এ সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেন তিনি তাদের সাথে একমত পোষণ করেন না। কারণ তাঁর মতে সাহাবীরা যে রকম রক্ত মাংসের মানুষ ছিল আমরাও সেই রকম রক্ত মাংসের মানুষ। আমরা যদি আমাদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে পারি তাহলে আমাদের দ্বারাও সেই সময়ের মতো অর্থনৈতিক পদ্ধতি চালু করা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ধর্মীয় চিন্তাধারা: ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন

বাংলাদেশের মনীষীদের মধ্যে যে'কজন আপন ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যে স্বজাতির হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে আছেন অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁদের অন্যতম। তিনি বহু প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সূফী সাধক হাছন রাজার নাতি। তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের জীবন ঘনিষ্ঠ দার্শনিক, উঁচু স্তরের সূফী সাধক এবং একজন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ। তাঁর মতে ধর্ম হচেছ মানুষের সবচেয়ে জীবন ঘনিষ্ট বিষয়। তাই তিনি ধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ, মানব জীবনে এর গুরুত্ব এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলোর তুলনামুলক আলোচনা করে কোন ধর্ম যুগোপযোগী তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

আমরা এ অধ্যায়ে তাঁর ধর্মীয় চিন্তাধারার ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব। এ ক্ষেত্রে আমি তাঁর চিন্তাধারাকে ব্যাপক ভিত্তিক করার জন্য তাঁর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ, পুস্তক এবং তাঁর সহপাঠী, সমসাময়িক ব্যক্তি, তাঁর ছাত্র ও বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের লেখা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে দেওয়ান আজরফ: মানব সৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মানুষ যখন গুহায় বা বনে-জঙ্গলে বসবাস করেছে তখন সে তাকে অসহায় বা সসীম মনে করেছে। এ কারণে সে কখনো সূর্য, কখনও চন্দ্র,আবার কখনও বা বড় গাছ বা পাহাড়ের নিকট মাথা নত করেছে, নিজেকে সপে দেবার চেষ্টা করেছে। এ থেকেই অনুমান করা যায় ধর্মীয় অনুভূতি বা ধর্মের অস্তিত্ব মানুষের মধ্যে জন্ম লগ্ন থেকেই অন্তর্নিহিতভাবে বিরাজমান।

Dhaka University Institutional Repository

তাই বলা যায় মানুষের জীবনের সবচেয়ে পুরনো ও অনিবার্য বিষয় হলে ধর্ম। প্রাগৈতিহাসিক, ঐতিহাসিক, প্রাচীন ও আধুনিক জীবনেও মানুষের মধ্যে কোন না কোন ভাবে ধর্মের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সর্ব যুগে সংস্কৃতি বিকাশের সব স্তরে সমস্ত মানবজাতির মধ্যে ধর্মীয়বোধ বিদ্যমান। তাই ধর্ম মানব জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অদ্যাবধি আবিষ্কৃত সব সমাজেই কোন না কোন ভাবে ধর্মীয় ধারণা কিংবা অতি প্রাকৃতিক শক্তির কল্পনার উপস্থিতি ছিল। আদিম সমাজেও ধর্ম ছিল তাদের কর্মতৎপরতার অন্যতম প্রভাবক শক্তি।

তাই ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ প্রথমে মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য, তারপর মানুষের আদি প্রবৃত্তি, অত:পর ধর্মীয় চেতনার উৎপত্তি ও বিকাশ এবং তারপর ধর্মজগতে বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এর পর মানব জীবনের জন্য ধর্মের প্রয়োজনীয়তা এবং ধর্মের কল্যাণকর দিক ও বাস্তব জীবনে ধর্মকে ধারন করলে যে দুনিয়ার জীবনে শান্তি ও আখেরাতের জীবনে মুক্তি রয়েছে সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

দেওয়ান আজরফের মতে, মানব-জীবনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করলে যা আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় তা হলো: মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী। মানবেতর প্রাণীর সাথে মানুষের জীবনের পার্থক্য রয়েছে। যে সব জিজ্ঞাসা অন্যান্য প্রাণীর জীবনে দেখা দেয় না, তা মানব জীবনে অতি শৈশবেই দেখা দেয়। জীবনের প্রারম্ভেই মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে, আমি কোথা হতে এলাম? কোথায় ছিল আমার পূর্বের বাসস্থান ও কোথায়-ই-বা আমি ফিরে যাব? আমার চারদিকে যে সব বস্তু রয়েছে ওরা আমার শত্রু না মিত্র? আমার সম্মুখে যে সব লোক মৃত্যু মুখে পতিত হলো, ওরা কোথায় গেল? তারা কি আমাদের কাছে ফিরে আসবে, না আসবে না?

Dhaka University Institutional Repository

শৈশব কাল অতিক্রম হবার পর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন কাজকর্মে লিপ্ত হবার ফলে উপরিউক্ত প্রশ্নসমূহ সাময়িকভাবে ধামাচাপা পড়ে যায়। যে শিশু খেলাধুলায় রত থাকত সেই শিশুই যৌবনে নানাবিধ জৈবিক চাহিদার সম্মুখীন হয়। কী করে খাবার যোগাবে, কী করে অন্য দশজনের মতো বেঁচে থাকবে বা আরও উন্নততর জীবন যাপন করবে ইত্যাদি চিন্তা ভাবনা তার মনে জাগ্রত হয়। তাছাড়া যৌবনে যৌন আবেগ ও বিপরীত লিঙ্গের নর অথবা নারীর সঙ্গে মিলনের বাসনা মানুষের মধ্যে দেখা দেয়। এর পাশাপাশি ভোগ বিলাসের বাসনাও দেখা দেয়। সামাজিক রীতিনীতি পালন করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে- অর্থলাভের বাসনা ও প্রয়োজনীয়তা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে সন্তান-সন্ততি লাভের পর পিতা মাতা কেবল নিজেদের জন্য এসব কামনা করে না। তাদের সন্তানদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য নানাবিধ বিষয় আশা করে। কিন্তু এতসব ব্যস্ততার মাঝেও মানুষের মনে সে সব আদিম বিষয়ের বা প্রশ্নের চিন্তা সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয় না। সে যখন অবসরে একাকী নীরবে নিভৃতে ভাবতে থাকে তখন ক্ষণিকের জন্যে হলেও এ সব চিন্তা তার মনের মধ্যে পুনরায় দেখা দেয়। মানুষের বয়স পঞ্চাশের উপরে হলে শৈশবের সেই চিন্তাগুলো আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। মানব জীবন স্থায়ী নয় বরং অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী সে সম্পর্কে তার আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। মানুষ আবার সেই আদিম প্রশ্নগুলো মীমাংসার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে। কেউ কেউ বিভিন্ন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, আবার কেউ বা পূর্ববর্তীদের অভিজ্ঞতার আলোকে সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সেগুলোর সমাধান চায়। আবার কেউ বা সেগুলোকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, নতুনভাবে তার নিজস্ব মতবাদ প্রচার করে থাকে।

তবে উপরের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানুষকে সাধারণ ধারার মানুষ বলে আখ্যায়িত করা যায়। এছাড়া অন্য এক শেণির মানুষ রয়েছে তাদের জীবনে পূর্বে উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর কোন মূল্য নেই। তারা এখনও বিভিন্ন অস্ত্র যেমন বল্লম দিয়ে পশু শিকার করে তাদের মাংস ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করে। মৃত্যু কেন হচ্ছে বা মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তির স্থান কোথায় হবে? সে সম্পর্কে

অস্পষ্ট ধারণা থাকলেও, জীবন সংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকার ফলে তারা সে সব প্রশ্নের সমাধানের নিমিত্তে তারা চিন্তা-ভাবনা করে না। তবে এ সম্পর্কে তাদের প্রশ্ন করা হলে তারাও চমকে ওঠে। তারাও উপলব্ধি করতে পারে যে, প্রশ্নগুলো স্বাভাবিক। এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, তাদের মনের গভীরে এসব প্রশ্ন রয়েছে। তবে তাদের দৈনন্দিন জীবনে অত্যধিক ব্যস্ততার জন্যে তারা এসব প্রশ্নের সমাধানে প্রবৃত্ত হয় না।

পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলো থেকেই মানব-জীবনে ধর্মের উৎপত্তি হয়। এ প্রশ্নগুলো আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করলে ধর্ম সম্বন্ধে আমরা অবহিত হতে পারি। তবে এ প্রসঙ্গে আমাদের আরো বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। মানুষ তার কোন্ প্রবৃত্তির তাড়নায় এ সকল প্রশ্নের সমাধানের সম্মুখীন হয়, সেটাও আমাদের জানার বিষয় হয়ে পড়ে। এ সব প্রশ্নের সাথে জড়িত আরো কিছু সমস্যা রয়েছে। মানব-জীবনের সাথে তত বেশী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত না হলেও তাদের ক্রিয়াশীলতা মানব জীবনে বিদ্যমান। যেমন মানব জীবনে ভালো ও মন্দ, সৎ ও অসৎ, মনোহর ও কুৎসিৎ বলে যে ভেদাভেদ রয়েছে এগুলো সম্পর্কে জানা মানুষের পক্ষে এক ধরনের কর্তব্য হয়ে পড়ে। এতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের মীমাংসার জন্যেই এ জগতে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে।

মানব সমাজে প্রত্যয় ও যুক্তির স্থান নির্ণয়ের জন্য আমাদের জীবন্ত ও প্রচলিত ধর্মগুলোর ইতিহাস ও ঐতিহ্য পাঠ করা উচিত। কারণ, মৃত ধর্মের অর্থাৎ সে সব ধর্মের কোন অনুযায়ী নেই বা যে সব ধর্ম নিয়ে তেমন আলোচনা হয় না সেগুলোকে মোটামুটিভাবে মৃত ধর্ম বলে আখ্যায়িত করা হয়। তাই মৃত ধর্মের সবগুলো বিষয় ও পর্যায় সম্বন্ধে সঠিক আলোচনা সম্ভবপর নয়। আবার ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে মৃত ধর্মের অবদান নির্ণয় করাও সহজ নয়। ধর্মের উৎপত্তি ও মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে দেওয়ান আজরফ তাঁর বিভিন্ন

লেখায় আলোচনা করেছেন। তাঁর ধর্মীয় ভাবনা অনুধাবন করতে হলে সে সম্পর্কে তথা বৃহৎ ধর্ম সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। সময়ের ক্রম অনুসারে জীবন্ত ধর্মগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথমে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয়। তার পরে বৌদ্ধ, তাওবাদ, কনফিউসিয়াসের মতবাদ, ইহুদী ধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয়।

হিন্দুধর্ম: হিন্দু ধর্মে সততা, ন্যায় পরায়ণতা ও মানবতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ ধর্মের মূলগ্রন্থ বেদ-এ যেমন আছে নানা দেবতার সঙ্গে এক ইশ্বর আরাধনার কথা, আবার তেমনি আছে ন্যায়পরায়ণতা ও মানবতার কথা। সেখানে দেব-দেবীর আরাধনার আদেশের সাথে সাথে করা হয়েছে মানবতার জয়গান।

হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি বেদান্তের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বর্তমান, তাতে জীবাত্মার যে স্বরূপ বর্তমান- তা সম্পূর্ণরূপে অধ্যাসপ্রসূত। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের মধ্যে মায়ার প্রভাবের ফলে জীবাত্মা ব্রহ্ম থেকে পৃথক সত্তারূপে প্রতিভাত হয়। জীবাত্মার লক্ষ্য হচ্ছে এ মায়া থেকে মুক্তি লাভ। একেই হিন্দুধর্মে বলা হয়ে মোক্ষ।

যদিও এ মতবাদকে বৈদান্তিক ধর্ম বলা হয়, তবুও হিন্দুধর্মের অপর শাখাগুলো যথা- বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব- শাখাতেও এ পৃথিবী বা জীবাত্মার অনিত্যতা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ রয়েছে। এখানে মোক্ষ বা মুক্তি লাভের জন্য নৈতিক পথকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। উপনিষদে বলা হয়েছে, যে নিজেকে পাপ থেকে বিরত রাখে না, নিজের ইন্দ্রিয়কে সংযত করে না এবং যার মন প্রশান্ত নয়, তার ব্রহ্মোপলব্ধি হবে না। আরও বলা হয়েছে ঈশ্বরের করুণা ছাড়া মোক্ষ সম্ভব নয়। আর ঈশ্বরের করুণা লাভের শর্ত হলো নৈতিক জীবন। গীতায় মুক্তি লাভের জন্য চারটি পথের কথা বলা হয়েছে- রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ; আর এর

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেকটির পূর্বশর্ত হলো আত্মশুদ্ধি ও আাত্মসংযম। ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মানবতা ও নৈতিকতার মূল্য সম্বন্ধে রামায়ণেও আলোচনা করা হয়েছে।

বৌদ্ধধর্ম: বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন গৌতমবুদ্ধ। তিনি মূলত একজন নৈতিক শিক্ষক ও সমাজ সংস্কারক। বৌদ্ধধর্মে বেদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ রয়েছে, তা সত্ত্বেও এতে বিশ্বাস থেকে যুক্তির প্রাধান্য বর্তমান। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যগণকে কোন তত্ত্বীয় সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করতে আদেশ করেননি। তিনি জীবনের সংঘটিত কতগুলো সত্যকে প্রাথমিক পর্যায়ে-স্বীকার করে নিয়েছেন। সে সত্যগুলো কোন সময়েই অস্বীকার করার উপায় নেই; যেমন, মানব জীবনে কর্তব্য জরা, ব্যধি এবং মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার সহজাত বাসনা রয়েছে। এসব থেকে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যমও অনেকটা প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। তিনি নির্বাণের যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রধান প্রধান অনুসারীদের মধ্যে যাঁরা এ অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন তাদেরকে এ ক্ষেত্রে প্রমাণযোগ্য বলা যায়। তাছাড়া সমাজে এর একটা প্রায়োগিক মূল্য রয়েছে। তাঁর মতবাদের তত্ত্বীয় দিকটাকে শূণ্য বলা হয়। এ শূণ্যকে এ পথের পথিকদের দ্বারা পরীক্ষণের একটা প্রকল্প বলা যায়। বৌদ্ধধর্মের আচরণকে অনেকটা আরোহ পদ্ধতি হতে উৎপন্ন বলা যেতে পারে; কেননা-তাদের বিশ্বাস যুক্তির উপর নির্ভরশীল। সঙ্গে সঙ্গে এ ধর্মকে সঠিকভাবে বিশ্বাসের প্রাধান্য অবমুক্ত হবার জন্যে এক ধরনের বিদ্রোহ বলা যায় এবং এখানে নৈতিক যুক্তিকে বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল না করে, তার নিজস্ব স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্যে এক বিপ্লব বা আন্দোলন বলা যায়।

গৌতমবুদ্ধের ধর্মীয় আলোচনার মূল বিষয়ই ছিল জরা, ব্যধি বা দু:খ থেকে মুক্তি লাভ করা। আর এই মুক্তি লাভের জন্য তিনি আটটি পথের কথা বলেছেন যথা:

(১) সম্যর্ক দৃষ্টি, (২) সম্যক সংকল্প, (৩) সম্যক বাক, (৪) সম্যক কর্মান্ত, (৫) সম্যক আজীব, (৬) সম্যক ব্যায়াম, (৭) সম্যক স্মৃতি এবং (৮) সম্যক সমাধি। এর অধিকাংশ পথই আমাদেরকে সৎ, চরিত্রবান এবং আত্মত্যাগী হতে শিখায়। ফলে নির্বাণ লাভ সম্ভব হয়।

তাওবাদঃ তাওইজম (তাওবাদ) এর প্রতিষ্ঠাতা লাওযু। এটা একটা খুবই প্রাচীন ধর্ম। তাওবাদ মূলত নৈতিক শিক্ষার ধর্ম। এ মতবাদ অনুসারে পাঁচটি কাজ বর্জনীয় এবং দশটি কাজ বাঞ্চনীয়। বর্জনীয় কাজ হচ্ছেঃ (১) মাদকদ্রব্য, (২) হত্যা, (৩) মিথ্যাবলা, (৪) চৌর্য্যবৃত্তি এবং (৫) ব্যভিচার; আর বাঞ্চনীয় কাজগুলো হচ্ছেঃ (১) জনক-জননীর প্রতিশ্রদ্ধা; (২) সম্রাট ও গুরুর প্রতি আনুগত্য, (৩) সর্বজীবে দয়া; (৪) ধৈর্য্য ধারন করা ও ভুল কাজ থেকে বিরত থাকা; (৫) আত্মত্যাগ; (৬) দাসকে মুক্তি দেয়া; (৭) কূপ খনন ও রাস্তা নির্মাণ; (৮) জ্ঞানহীনকে জ্ঞান দান করা; (৯) সামাজিক মঙ্গল সাধন এবং ধর্মপুস্তক পাঠ।

তাওইজমের প্রতিষ্ঠাতা লাওযু বলেন যেঃ

> আমার কাছে কয়েকটি মূলনীতি আছে যেগুলো আমি অনেক শক্ত করে ধরে রেখেছি । এবং যাদের আমি অনেক মূল্য দেই। এর প্রথমটি হলো ভদ্রতা; দ্বিতীয়টি, মিতব্যয়িতা এবং তৃতীয়টি হলো বিনয় এগুলো আমাকে অন্যদের কাছে বড় করে দেখানো থেকে বিরত রেখেছে। তোমরা ভদ্র হও, তাহলে সাহসী হতে পারবে; মিতব্যয়ী হও তাহলে উদার হতে পারবে; অন্যদের কাছে নিজেকে বড় করা থেকে বিরত থাকো তাহলে তুমি নেতা হতে পারবে। পুণ্যের পথ থেকে দূরে সরে যেও না। স্বার্থপরতা থেকে সংযত থাক এবং কামনা-বাসনার পরিমাণ কমাও। [১]

[১] দেখুন, আজিজুন্নাহার ইসলাম ও ড.কাজী নুরুল ইসলাম, **তুলনামূলক ধর্ম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ**, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০২, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

কনফিউসিয়াসের মতবাদ: কনফিউসিয়াস যে ধর্মের বাণীগুলো প্রচার করেছেন সেগুলো ছিল মূলত নৈতিক শিক্ষা। সমাজে বসবাসকারী মানুষ যেন সব রকমের খারাপ জিনিস বর্জন করে চলতে পারে, এই শিক্ষাই তিনি দিতেন। তিনি মানুষের নৈতিকভাবে জীবন-যাপনের প্রতি উৎসাহিত করতেন। তিনি ধর্মের তত্ত্বীয় দিকের প্রতি তেমন আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর মতে সেই ব্যক্তিই সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যিনি সৎ ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। জ্ঞান ও উদ্দেশ্যের প্রতি আন্তরিক, সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে সমন্বয় করেন এবং বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করেন। কনফুসিয়াস বলেন, একটি ক্রমসুন্দর নরম হৃদয় হচ্ছে ভালবাসার বীজ; লজ্জা ও ঘৃণার জন্য হৃদয় সত্যের বীজ; ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধের জন্য হৃদয় বুদ্ধিমত্তার বীজ [Mencius 3.6] তিনি আরও বলেন, "স্বর্গকে পেতে হলে মানুষকে জয় করো; মানুষকে জয় করতে হলে তার হৃদয়কে জয় কর; মানুষের হৃদয়কে জয় করতে হলে তাদের জন্য একত্রিত হও এবং তারা যা পছন্দ করে তাদেরকে তাই দাও, তারা যা অপছন্দ করে তা থেকে বিরত থাকো।" [২]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাঁকে এমন এক প্রত্যয়শীল ব্যক্তি বলে গ্রহণ করা যায়, যিনি এমন সব মূল্যমানে বিশ্বাসী ছিলেন যার ফলে মানুষ মৃত্যুর পরও জীবন্ত থাকবে। সুতরাং আমরা দেখতে পাই, ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তির প্রাধান্য রয়েছে। তবে এতে নৈতিক মূল্যমানগুলোকে প্রত্যয় বলে গ্রহণ করা হয়। তাই কনফুসিয়াসের ধর্মকে মানুষের নৈতিক চেতনার উৎকর্ষ সাধনের ধর্ম বলা যায়।

উপরে বর্ণিত তিনটি ধর্ম ছাড়াও আরও তিনটি উল্লেখযোগ্য ধর্ম রয়েছে। এ ধর্ম তিনটি সম্পর্কে দেওয়ান আজরফ বলেন:

---

[২] Mencius 3.6 & 7.9

ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম বিশ্বসভ্যতায় সেমেটিক ধর্ম নামে পরিচিত। সেমেটিক ধর্মগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ইহুদী ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা যায়। এ তিন ধর্মের মধ্যে একটা সাধারণ ঐতিহ্য বর্তমান। এ তিন ধর্মেই এ বিশ্বের স্রষ্টা হিসেবে একজন পরম ব্যক্তিত্বশালী সর্বকর্তৃত্বময় সত্তাকে স্বীকার করা হয়েছে। তিনিই ইহুদীধর্মে জিহোভা, খ্রিষ্টধর্মে গড এবং ইসলাম ধর্মে আল্লাহ নামে পরিচিত। নামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে গুণের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তবে এ পরিবর্তন সত্ত্বেও এ তিনটি ধারণাকে গ্রীকদের নির্বিশেষ ও হিন্দুদের উপনিষদে বর্ণিত পরম ব্রহ্মের ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলা যায়। কারণ নির্বিশেষে বা পরম ব্রহ্মের মধ্যে ব্যক্তিত্ব নেই। অপরদিকে জিহোভা, গড ও আল্লাহর মধ্যে ব্যক্তিত্বের চরম অভিব্যক্তি বর্তমান। [৩]

ইহুদি ধর্ম: ইহুদি ধর্ম মূলত হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণাকে সমুলে বিনাশ করে প্রেম ও ভালবাসার মাধ্যমে সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এ ধর্মের লক্ষ্য হচ্ছে জিহোভার মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে এবং মানুষের মধ্যে, ইতিহাসের মধ্যে, ন্যায়বিচারের মধ্যে এবং দু:খ কষ্টের মধ্যে অর্থ খুঁজে বের করা। এতে বলা হয়েছে মানুষ শুধু নিজের জন্যই চিন্তা করবে না। নিজের পাশাপাশি অন্যের জন্যও ভাবতে হবে। এ ধর্মে মানুষকে কখনও সৃষ্টিকর্তারূপে মনে করা হয় না। এখানে মানুষ নিজেকে সসীম মনে করে। তাই এ বিশ্বের মূলে একজন সৃষ্টিকর্তা আছে বলে এ ধর্মে ধারণা করা হয়। এ ধর্মে বলা হয়: প্রেমময় কাজ ঈশ্বরের বাণীর সমতুল্য। নৈতিকতা ছাড়া কোন ধর্মই ধর্ম নয়। তোমার জন্য যা ক্ষতিকর, অন্যের জন্য তা করো না। যেখানেই একজন মানুষের পদচিহ্ন প্রত্যক্ষ করবে সেখানেই ভাববে হবে ঈশ্বর আছেন। যে নিজের ক্রোধকে সংবরণ করতে পারে সেই শক্তিশালী। মানুষ যা করতে পারে তার মধ্যে সবচেয়ে মহৎ কাজ হলো ক্ষমা করা। [৪]

---

[৩] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ধর্ম ও দর্শন, প্রথম প্রকাশ ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

[৪] দেখুন, আজিজুন্নাহার ইসলাম ও কাজী নুরুল ইসলাম, **তুলনামূলক ধর্ম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

উপরের আলোচনায় দেখা যায় ইহুদি ধর্মের দার্শনিক ভিত্তিমূলে মানব-জীবন বিকাশের একটি মজবুত ভিত্তি রয়েছে। এ ভিত্তি নৈতিকতা ও ন্যায়ের অর্থ দ্বারা আরো মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহুদি ধর্মের দশটি মহা-আদেশ বলে দেয়, কিভাবে সে উদ্দেশ্যগুলো সাধিত হতে পারে।

খ্রিষ্ট ধর্ম: খ্রিষ্টধর্মও (সৃষ্টিকর্তা) আল্লাহ প্রদত্ত একটি ধর্ম। এ ধর্ম ঈসা (আ:) এর উপর নাযিল হয়েছিল। এ ধর্মে এমন কতগুলো সদুপদেশ রয়েছে যেগুলো প্রধানত: নৈতিকতা নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- 'তোমার নিজেদের মতো তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাস, তুমি যেভাবে অপর মানুষের নিকট থেকে কোনো ব্যবহার প্রত্যাশা কর।'[৫]

এগুলো মূলত সমাজের মানুষকে একতাবদ্ধভাবে বসবাসের জন্য উত্তম উপদেশ। এ উপদেশগুলো মেনে চললে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

যীশু খ্রিষ্ট তিনটি শত্রুর সাথে সংগ্রাম করার কথা বলেছেন- (১) জাগতিক বস্তুর দাসত্ব স্বীকার, (২) ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে, নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা মেনে নিয়ে ভবিষ্যতের মুখোমুখি হওয়া এবং (৩) স্বার্থপরতা। যীশু তাঁর শিষ্যদের সর্বোতভাবে প্রতিহিংসা বর্জন করতে বলতেন। তিনি বলতেন যে, কেউ যদি তোমাদের ডান গালে চড় মারে তাহলে তোমরা বাম গালটা বাড়িয়ে দিও। যে তোমার চাদর কেড়ে নেয়, তাকে জামাটিও নিতে বারণ করো না।

এ নৈতিক বিধানগুলো এমন এক সত্তা কর্তৃক নিদের্শিত যাঁর পক্ষে শাস্তি দেওয়াও সম্ভব। এতে আরও বলা হয়েছে যে, একমাত্র সত্যই মানুষকে সৎ পথে পরিচালনা করতে পারে। মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির পথে যতগুলো অন্তরায় রয়েছে সেগুলোকে দূরীভূত করার জন্যেই খ্রিষ্টের আবির্ভাব হয়েছিলো। যারা তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলো, তারা প্রত্যয়ের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিলো।

---

[৫] যেভাবে উদ্ধৃতি দেওয়া আছে, দেওয়ান আজরফ, **ধর্ম ও দর্শন**, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ধর্ম: ইসলাম ধর্ম হলো এক ঈশ্বরবাদী ধর্ম। ইসলামের মধ্যে এমন এক একেশ্বরবাদের সন্ধান পাওয়া যায় যে, আল্লাহর ধারণার সাথে কোন কিছুই সমান বলে গ্রহণীয় নয়; আবার কোন অবতারের ধারণাও ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। স্রষ্টার ব্যক্তিগত সত্তায় ও অস্তিত্বের মধ্যে তিনি এক ও অদ্বিতীয়; তাঁর সম্বন্ধে আস্থাবান লোকদের কাছে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য তাঁর পক্ষে কোনো মধ্যবর্তী মাধ্যমের প্রয়োজন নেই।

ইসলামের কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর কাছে ফেরেশতা জিব্রাইল ওহী বহন করে এনেছিলেন। নবী করিম (দ:) এ বাণী মানুষের নিকট প্রচার করেন। তবে 'ইলাহ'র বাক্যের মধ্যে দু'টো অর্থ রয়েছে, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের একমাত্র সার্বভৌম শক্তি। আল্লাহর এ দু'টো গুণের প্রকাশ মানব সমাজে দীর্ঘকাল থেকে রয়েছে। পুরাকাল থেকে সমাজে যে সব দেব-দেবীর ধারণা প্রচলিত ছিল এগুলো পরবর্তীতে একত্বের ধারণার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। ইসলামে এসে এ একত্বের নীতি পূর্ণ পরিণতি লাভ করে এবং পাশাপাশি সার্বভৌমত্ব তার সঙ্গে দেখা দেয়। ফলে সামগ্রিক ও রাজনৈতিক জীবনে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আর আল্লাহর রয়েছে নিরানব্বই নাম, এগুলো আল্লাহর গুণাবলী হিসেবে দুনিয়ায় প্রতিভাত হয়। এসব গুণাবলী সম্বলিত নামের মাধ্যমে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানও লাভ করা যায় এবং এগুলো মানব জীবনের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। এ ধারণা থেকে মানব জীবনে সন্তুষ্টি লাভ হতে পারে। তাছাড়া মানব জীবনের একান্ত কামনা হচ্ছে তার সব দিকের পূর্ণ সন্তোষ বিধান করা।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই বুঝা যায়, সব ধর্মের মধ্যেই বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়টা লক্ষণীয় যে, প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে একটা তাত্ত্বিক দিকও বিদ্যমান। বৈদান্তিক হিন্দু ধর্মের পরম ব্রহ্ম, শাক্তদের চন্ডী, বৈষ্ণবদের বিষ্ণু, শৈবদের শিবকে এ বিশ্বের মূলে অবস্থিত আদিসত্তা বলে মানুষ গ্রহণ করেছিলো। এদের সাথে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে মানুষ অমরত্ব লাভ করতে চায়। আবার বৌদ্ধ ধর্মে আদিসত্তা সম্বন্ধে

কোনো পরিষ্কার ধারণা না থাকলেও তার অন্তর্গত নির্বাণের ধারণার মধ্যে মানব-জীবনের চরম পরিণতি বর্তমান বলে তাতেও অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। যেহেতু নির্বাণের পরে জন্ম বা মৃত্যুর কোনো সম্ভাবনা নেই, এজন্য সে পর্যায়ে মানব জীবনের আর কোনো পরিবর্তন নেই বলে তাকে একটা স্থিতিশীল অবস্থা বলা যায়।

টাও-এর মতবাদ অনুসারে মানুষ উচ্চতর ছন্দ ও উচ্চতর নীতিকে মানব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে সত্যের মধ্যেও সে নীতি ও বিন্যাস স্বীকার করে নিতে হবে। একে মরমী অর্ন্তদৃষ্টির দ্বারা জানা যায়। তবে তাকে নৈতিক জীবনের সমর্থনের জন্যে প্রকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। এতে পরিষ্কার বুঝা যায়, নৈতিক জীবন তথা আদর্শগতভাবে জীবন ধারণের জন্য জীবনে একটি স্থিতির বা আশ্রয়ের প্রয়োজন। এ আশ্রয়ই হচ্ছে মানব-জীবনের সে অমরত্ব লাভের পক্ষে প্রয়োজনীয় মাধ্যম।

কনফিউসিয়াসের সর্ব প্রথম আকাঙ্ক্ষা ছিল মানুষের জন্যে একটা আদর্শিক সত্তা খোঁজ করা; তবে তিনি এমন কতগুলো মূল্যমানে বিশ্বাসী ছিলেন-যা মানব মৃত্যুর পরও জীবন্ত থাকে। এ মূল্যমানের প্রতি বিশ্বাস থাকার কারণে তাঁকে অমরত্ব লাভের জন্য আশাবাদী বলা যায়। অপরদিকে, তিনি স্বর্গ ও মর্ত বলতে কোনো বিশেষ স্থানকে নির্দেশ করেননি। স্বর্গ বলতে তিনি পূর্ব পুরুষকে নির্দেশ করেছেন। স্বর্গ যেমন মর্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তেমনি সে পূর্বপুরুষগণ সব সময়ই অমর। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, অমরত্বের ধারণা কনফিউসিয়াসের মধ্যে ছিলো এবং সে অমরত্বকে উচ্চস্তরে অবস্থিত বলে তিনি ধারণা করেন।

দেওয়ান আজরফ এর মতে, সেমেটিক ধর্মগুলোর মধ্যে ইহুদি ধর্মে এ বিশ্বকে জিহোভার একটা নাট্যমঞ্চ বলে ধারণা করা হয়েছে। অপরদিকে, সামাজিক ও নৈতিক জীবন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুধুমাত্র মায়া বা অবভাস বলে ধারণা করা হয়েছে। এ সব

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা। সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে মানুষের পক্ষে এ দুনিয়ায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই মানব জীবনে একটা স্থায়ী সংস্থার ব্যবস্থা করতে হবে। এ পৃথিবীকে নানাবিধ ক্রিয়াশীলতার নাট্যমঞ্চের সাথে তাল মিলিয়ে চললে হবে না। এসব আলোচনা থেকে বুঝা যায় এ পৃথিবী নামক নাট্যমঞ্চের অন্তরালে যিনি বিরাজ করেন, স্থায়ীভাবে টিকে থাকার জন্যে তাঁর সঙ্গে মরমী উত্তরণের প্রয়োজন হচ্ছে । দেওয়ান আজরফের মতে, যীশু সব প্রথার অমঙ্গল থেকে মুক্তি দেবার জন্য মানব জাতিকে আহ্বান করেছিলেন। স্বকীয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিক অবস্থা থেকে তিনি মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেলে মানুষের পক্ষে আর বাসনার দাস হয়ে থাকতে হয় না। তখন এ বিশাল বিশ্বের কোন সমস্যাই কিছুই আর তার কাছে সমস্যা হয়ে দেখা দেয় না আর এভাবে সে তার চেতনার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি লাভ করে, বৃহত্তর চেতনার মধ্যে অমরত্ব লাভে সমর্থ হয়।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বুঝতে পারি, কোনো ধর্মের উৎপত্তির মূলেই বিশুদ্ধ যুক্তি নেই। এ পৃথিবীর সব ধর্মই কোনো না কোনো বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত; তবে ধর্মের মূলনীতি প্রতিষ্ঠার পর তাকে যুক্তির দ্বারা মজবুত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ কথাটি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মহামতি তলস্তয়ের উক্তির দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তলস্তয় বলেছিলেন যে,

> ধর্মের উৎপত্তি অনুভূতি থেকে। তার প্রতিষ্ঠা হয় যুক্তি দ্বারা এবং তাকে প্রচার করার জন্যে নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।" তবে সকল ধর্মের মধ্যেই মানুষের অমরত্ব লাভের যে আদিম বাসনা কোথায়ও বাহ্য, আবার কোথাও বা উহ্য হয়ে রয়েছে। মানুষ এ বিশ্বচরাচর বা স্থিতিতে চিরন্তন হয়ে টিকে থাকতে চায় বলেই, সে ধর্মীয় স্বজ্ঞা বা প্রত্যয়ের মাধ্যমে সে চিরন্তন আদি সত্তাকে পেতে চায়। তার সঙ্গে মিলিত হয়ে যাতে সর্বপ্রকার ক্ষয়ক্ষতির উর্ধ্বে সে স্থিতিশীল থাকতে পারে এই হচ্ছে তার জীবনের সর্বপ্রধান কাম্য। [৬]

[৬] দেখুন, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ধর্ম ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ধর্ম সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে মানব প্রবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সব মনোবিজ্ঞানী মানব প্রবৃত্তি নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তিনি তাঁদের সাথে একমত পোষণ করেননি। যেমন, বিংশ শতাব্দীর সূচনায় সিগমুন্ড ফ্রয়েড- এর মতবাদ হচ্ছে কামসর্বস্ববাদ অর্থাৎ কাম সুখের জন্যই মানুষের জীবন আবর্তিত বা বিবর্তিত হচ্ছে। মায়ের দুধ পান করার সময়, মল-মূত্র নি:সরণ কালে শিশু কামসুখ উপলব্ধি করে বলে ফ্রয়েড ধারণা করেছেন। এ সম্পর্কে দেওয়ান আজরফের মত হচ্ছে, নারী অথবা পুরুষ হোক, জন্মের পরই শিশুর মানসে রয়েছে দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য এক প্রবল বাসনা তাকে খেলাস্থলে কোল থেকে ফেলে দিতে চাইলে সে তার আশ্রয় দাতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়; অথচ স্থান বা কাল সম্পর্কে তখনও তার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই তবুও সে আত্মরক্ষা করতে চায়। সুতরাং মানব মানসে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য প্রবল প্রবৃত্তি বর্তমান। তাছাড়া শিশুকে মায়ের বুকের দুধ পান করানোর সময় বঞ্চিত করলে তার মনে ক্রোধের সৃষ্টি হয়। সে ক্রোধ কাম বাসনা দ্বারা পরিচালিত এটা যুক্তির কষ্টি পাথরে সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। আবার অন্ধকারে কোনো শিশুকে শয্যাতে একা রাখতে চাইলে সে কোনো অদ্ভুত শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয় পায় এবং অপরিচিত ব্যক্তিকে শত্রু জ্ঞান করে তার প্রতি বৈরিভাব প্রকাশ করে; এগুলো কোনোভাবেই কামপ্রসূত চিন্তা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

ম্যাগডুগাল নামক বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদের মতে মানুষের আদি প্রবৃত্তি যুদ্ধস্পৃহা। এ ব্যাখ্যার সাথেও দেওয়ান আজরফ একমত পোষণ করেননি। তিনি মনে করেন, মানুষের মনে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। পরিণত বয়সেও মানুষ তার সন্তানের কৃতিত্ব বা প্রাধান্য বা জীবন সংগ্রামের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবেশীদের সাথে প্রতিযোগিতার মনোভাব পোষণ করে। মানুষের জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ বাল্যে, কৈশরে, যৌবনে প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি ভীষণভাবে প্রতিভাত হয়; যেমন, বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে, ঘোড়-দৌড় থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এটি প্রকাশিত হয়। এগুলোকে যদি আদিম ও হিংস্র যুদ্ধস্পৃহারই রূপান্তর বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে শৈশবে, কৈশরে ও যৌবনে অপরের

সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা যুদ্ধ স্পৃহার রূপ কিভাবে বলা যায়? আবার পৌঢ় বয়সে এবং বিশেষ করে বার্ধক্যে সমসাময়িক লোকদের সাথে একত্রে বসে অতীত দিনের কাহিনী আলাপ আলোচনা করা হচ্ছে মানব জীবনের এক অপ্রতিরোধ্য প্রবণতা। তাই এটিকে কোনোভাবেই যুদ্ধস্পৃহার রূপান্তর বলা যায় না।

বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী এ্যাডলারের মতে, মানব জীবনের আদি প্রবৃত্তি হচ্ছে শক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা। এ্যাডলারের এ আকাঙ্ক্ষার মূলে রয়েছে নেতিবাচক মনোবৃত্তি। কারণ মানুষ মনে করে যে কোন সময় বিরূদ্ধপক্ষীয় শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে এজন্য সে পূর্বেই শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে চায়। দেওয়ান আজরফের মতে, এতে আংশিক সত্য রয়েছে তবে ইহা পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। কারণ সমাজে আমরা দেখতে পাই মানুষ মিলেমিশে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজও করে। একটি শ্লোগানও রয়েছে, 'দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ'। কাজেই শুধু অপরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ শক্তি সঞ্চয় করে, এটা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। দেওয়ান আজরফ মনে করেন, এগুলো হচ্ছে এ জগতে টিকে থাকার জন্য অমরত্ব লাভের বিভিন্ন মাধ্যম মাত্র। কামবৃত্তি, যুদ্ধস্পৃহা ও শক্তি লাভের বাসনা প্রভৃতির মূলে রয়েছে অমরত্ব লাভের অদম্য বাসনা। এ সম্পর্কে আজরফ বলেন: ''মানব স্বেচ্ছায় এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না। তবে স্বেচ্ছায় সে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতেও চায় না। সে চায় অমর, অক্ষয় ও অব্যয় হয়ে এ পৃথিবীর বুকে টিকে থাকতে।'' [৭]

আজরফের মতে, যৌবনে কামবৃত্তির তাড়নায় মানুষ যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে উপস্থিত সন্তুষ্টি লাভের অন্তরালেও রয়েছে মানুষের অমরত্ব লাভের বাসনা। কারণ সন্তান-সন্ততি লাভের মাধ্যমে মানুষ চিরঞ্জীব হতে চায় আর এজন্য দাম্পত্য জীবনে সন্তান সন্ততি না হলে মানুষের জীবনে ভীষণ অশান্তি দেখা দেয়।

[৭] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, **জীবন দর্শনের পুর্নগঠন**, ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করন, ১৯৮০, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

শেষ পর্যন্ত সে দত্তক পুত্র বা কন্যা গ্রহণ করে অমরত্ব লাভের জন্য। আর এ অমরত্ব লাভের বাসনা জীবনের সব পর্যায়ে দেখা দেয়। যেমন, পাঠশালায় ছেলে-মেয়েরা তাদের ডেস্কের উপর নাম খোদাই করে; এভাবে পেপার পত্রিকায় লেখা, বৃক্ষরোপন করা, পুকুর খনন, মন্দির, মসজিদ, খানকা বিভিন্ন প্রকার কীর্তি নির্মাণ যেমন তাজমহল নির্মাণ, আবার বিভিন্ন প্রকার উপন্যাস এবং তার চরিত্র চিত্রন-এগুলোর মাধ্যমে মানুষের আদি প্রবৃত্তি তথা অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করতে চায়।

তাই দেওয়ান আজরফের মতে, মানুষের আদি প্রবৃত্তিকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধর্ম মানুষের আদি প্রবৃত্তির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। তাঁর মতে, মানব জীবন থেকে ধর্মকে বাদ দিলে মানুষ তার মূল বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। ধর্ম ছাড়া মানব জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না। তাই সৃষ্টিকর্তা যেমন মানুষ পাঠিয়েছেন, সে সাথে সে মানুষের জীবন কিভাবে পরিচালিত হবে তার জন্য দিক নির্দেশনা স্বরূপ ধর্মও দিয়েছেন। মানুষ যদি তার জীবনে ধর্মকে ধারন না করে তাহলে তার জীবন অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে।

আজরফের মতে, আজকের যুগে মানুষ সে ধর্মের জন্য অপেক্ষা করছে যে ধর্ম মানব জীবনের সবগুলি বৃত্তি ও প্রবৃত্তির সন্তোষ বিধানে সক্ষম হবে। তাতে থাকবে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সকল প্রকার মূল্যমানের একত্র সমাবেশ। আর সে ধর্মই হবে সমাজনীতি, রাজনীতি ও বিশ্বনীতির মূল উৎস। তার আলোকে আলোকিত হয়েই মানব জীবন বিকাশের চরম সোপানে আরোহন করতে পারবে।

প্রকৃতপক্ষে ধর্মের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপরিউক্ত ব্যাখ্যা পৃথিবীর সব ক'টি প্রত্যাদিষ্ট ধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এটিই ধর্মের অধিকতর গ্রহণযোগ্য ধারণা। তবে সর্বাধিক প্রচলিত ব্যাখ্যা হলেও এটিই ধর্মের একমাত্র ব্যাখ্যা নয়। পৃথিবীর আদি লগ্ন থেকে বিভিন্ন সময়ে ধর্মকে দেখা হয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই নৃতাত্ত্বিকের ধর্ম ও সমাজ বিজ্ঞানীর ধর্ম যেমন এক

Dhaka University Institutional Repository

নয়, তেমনি অস্তিত্ববাদীর ধর্ম, ফ্রয়েডীয় ধর্ম কিংবা মার্কসীয় ধর্মও এক নয়। আবার মরমীবাদী সুফিদের ধর্মবোধ, বৌদ্ধ, ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টানদের ধর্মও এক নয়। তবে ভিন্নমত সত্ত্বেও ধর্ম বলতে সাধারণ অর্থে প্রত্যাদেশসমৃদ্ধ মানবপ্রেমী ধর্মসমূহকেই ধরা হয়। ধর্মের সব বিধিবিধান এবং আচার অনুষ্ঠানেও মানুষের কল্যাণের এই দিকটি প্রতিফলিত । বাস্তবে মানুষের মুক্তির পথ প্রদর্শনে নিবেদিত ধর্মকেই দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ গ্রহণ করেছেন, ফলে তাঁর মতে, সব নবী রাসূল, সাধু, ব্যক্তিই আল্লাহর প্রতিনিধি-তাঁরা সকলেই আল্লাহর বার্তাবাহক ও প্রেরিত পথের দিশারী । তাঁদের প্রচারিত ধর্ম শুধুমাত্র আল্লাহর একত্ব কিংবা অন্য কোন উপাসনায় নিয়োজিত নয় বরং নিয়োজিত মানুষের জন্য এক উন্নতর জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের ইহজাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ বিধান নিশ্চিত করা। এ জন্যই এ কথাটি যথার্থ যে, ধর্ম মানুষের জন্য, ধর্মের জন্য মানুষ নয় ।

দেওয়ান আজরফের মতে, পূর্বে উল্লিখিত মানুষের চির অমরত্ব লাভের অর্থ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মধ্যেই রয়েছে মানুষের জীবনে চরম ও পরম সার্থকতা। মানুষের এ বাসনা যে সহজাত তাকেই ইসলাম স্বীকার করে নিয়েছে। জীবনের পরিণতিতে মানুষ কীভাবে সে সব চরম ও পরম বাসনার সন্তোষ বিধান করতে পারে ইসলামের নানাবিধ বিধান হচ্ছে তারই পথপ্রদর্শক। এজন্যই ইসলামকে বলা হয় দ্বীন-ই-ফিতরাৎ অর্থাৎ মানব প্রকৃতির ধর্ম।

আজরফ মনে করেন মানব প্রকৃতির ধর্ম অর্থ এই নয় যে ইসলাম বলগাহারা অশ্বের মত মানুষকে তার স্বাভাবিক বৃত্তির সন্তোষ বিধানের সময় যাতে সে সব বৃত্তি ও প্রবৃত্তির মধ্যে বিরোধ দেখা না দেয়, সে সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করে। ইসলামের চরম লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ যাতে মানুষ তার চির আকাঙ্ক্ষিত অমরত্ব লাভে সফল হয়। আজরফের মতে ইসলাম মানব জীবনের আদিতে বিদ্যমান সবগুলো বৃত্তি প্রবৃত্তিগুলোকে নি:সন্দেহে স্বীকার করে নিয়ে তাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য প্রকৃত নীতি নির্ধারণ করে। আর সে সব নীতির মূল লক্ষ্য

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে, মানুষকে অমরত্ব লাভে সহায়তা করা। ইসলাম শিশুকে এমন সব খাদ্য খাওয়ানোর কথা বলে যাতে মানব শিশু সবল-সতেজ ও শক্তিশালী হয়ে গড়ে ওঠে, অন্য সব বালক-বালিকাদের সাথে প্রেম ও সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলে। এজন্য ইসলাম শৈশবকাল থেকেই তার যুদ্ধস্পৃহাকে আদর্শিক যুদ্ধে পরিণত করার শিক্ষাদান করে। তবে যে যুদ্ধের কথা দেওয়ান আজরফ বলেছেন, সে যুদ্ধ যার তার সাথে যুদ্ধ নয়, সে যুদ্ধের প্রতিপক্ষ হচ্ছে তার নিজের মানসে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের অসৎ প্রবৃত্তি। আর অপর প্রতিপক্ষ হচ্ছে পৃথিবীর ঐ সব মানুষ যারা মানুষের সেই চির আকাঙ্ক্ষিত অমরত্ব লাভের স্বপ্নকে বানচাল করে দিতে চায়।

দেওয়ান আজরফের মতে ইসলাম মানুষের কামশক্তির কার্যকারিতা অস্বীকার করেনা; বরং সে আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকার করে নিয়ে তা চরিতার্থ করার পদ্ধতি বাতলে দেয়। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে নারী পারমার্থিক উন্নতির পক্ষে প্রতিবন্ধক নয় বরং সহায়ক। আল্লাহর রাসূল (স:) বলেছেন যে, নিকাহ্ বা বিবাহ ঈমানের অর্ধেক। ঈমান এক সর্বাত্মক প্রত্যয় যাতে বিশ্বাসের সঙ্গে কর্মের সম্পূর্ণ যোগ থাকা আবশ্যক। এর কারণ হচ্ছে ঈমান বা বিশ্বাস নিকাহ্ বা বিবাহ ব্যতীত সম্পূর্ণ হতে পারে না; আর অতৃপ্ত কামনার ফলে মানবজীবনে অশান্তি অরাজকতা দেখা দেয়।

আবার এ বিবাহের ফলে সন্তান-সন্ততি উৎপাদনের মাধ্যমে জৈব অমরত্ব লাভও মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় । শক্তি লাভের বাসনা বা অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে এ দুনিয়ার বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কর্মীরূপে দেখা দেওয়াও ইসলাম স্বীকার করে নিয়ে ঘোষণা করেছে: ‘‘ মানুষেরা (মূলে) এক জাতি ছিল, তারাই তাদের মধ্যে বিভিন্নতার সৃষ্টি করেছে’’।[৮] এ ঐক্য সৃষ্টির জন্য তাগিদ প্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঐক্যের মাধ্যমেই কেবল মানবজাতি এ পৃথিবীতে দীর্ঘকাল বাস করতে পারে।

[৮] আল-কুরআন, ১০:১৯

ঐক্য বিহীন থেকে একে অপরের সাথে কোন্দলে লিপ্ত হলে মানুষ অতি অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবী থেকে ধ্বংস হয়ে যায়। দেওয়ান আজরফের মতে, এ সব নীতি ছাড়াও ইসলাম ভবিষ্যৎ জীবনের যে প্রকল্প দান করেছে তাতে পরকালীন জীবনকেও এ জীবনেরই পরবর্তী সংস্কাররূপে ধারণা করা হয়। এটাই হচ্ছে ধর্ম হিসেবে ইসলামের স্বাতন্ত্র্য। ইসলাম মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে এ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বা ভিন্ন মনে করেন নি; বস্তুত, মূল জীবনের একটা পর্যায় হচ্ছে ইহকালীন জীবন এবং পরবর্তী জীবন হচ্ছে মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবন। সে অনন্ত জীবনের সুখ শান্তি উপভোগ করতে হলে মানুষকে এ জীবনে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হতে হবে, তাকে এমন সব কাজ কর্ম করে যেতে হবে যাতে পূর্বে বর্ণিত অনন্ত জীবনে অমর হয়ে সে চিরস্থায়ী শান্তি ভোগ করতে পারে; আর যদি তা না করে তাহলে সে টিকে থাকলেও চিরস্থায়ী অশান্তির মধ্যে তাকে জীবন কাটাতে হবে।

এ সম্পর্কে দেওয়ান আজরফ বলেন যে:

> ইসলামের দৃষ্টিতে তাই আল্লাহর ধারণা হচ্ছে এই যে, তিনি অনন্ত জীবনের ধারক, বাহক ও বিবর্তনকারী। তাঁরই আদর্শের আলোকে মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হলে তাঁরই সান্নিধ্য লাভে মানুষ ধন্য হয়, সে তার আকাঙ্খিত উদ্দেশ্য পূরণে সমর্থ হয়, আর এভাবে তার জীবন হয় পূর্ণ । এ ধারণা ব্যতীত মানুষ তার অমরত্ব লাভের কোনো আশ্রয় স্থান খুঁজে পায়না বলে এ ধারণা মানব জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। [৯]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর ধর্মীয় চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে তাই ইসলাম ধর্মকেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম বা শ্রেষ্ঠ জীবন বিধান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। প্রত্যাদিষ্ট যতগুলো ধর্ম আছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ও পূর্ণতম সংস্করণের ধারক ও বাহক হিসেবে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা:) এর শিক্ষায় বাস্তব জীবনাদর্শ হিসেবে ইসলাম আত্মপ্রকাশ করেছে।

[৯] প্রাগুক্ত, জীবন দর্শনের পুনর্গঠন, পৃ. ২১

সংস্কৃত ধাতু থেকে যে ধর্ম এসেছে তার মধ্যে জীবন পদ্ধতির উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। তাই ইসলাম সংস্কৃত ভাষার অর্থে ধর্ম নয়। পাশ্চাত্যে যে অর্থে Religion শব্দটি ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তাতে সমষ্টি চেতনার কোনো অস্তিত্ব নেই, Religion শব্দের মধ্য কোনো রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডও নেই, Religion অর্থে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাই ইসলামকে শুধুমাত্র আরবী ভাষায় যাকে দ্বীন বলা হয় সে অর্থে ব্যবহার করাই যথার্থ; অন্য কোনো প্রতিশব্দ দিয়ে ইসলামের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না।

দেওয়ান আজরফ মনে করেন, প্রচলিত অর্থে ইসলাম কেবল একটি ধর্ম নয়, প্রচলিত অর্থে ধর্ম হচ্ছে পারমার্থিক জীবনে মুক্তি লাভের জন্য মানুষ যে কতগুলো বিশ্বাস পোষণ করে এবং সে লক্ষ্যে কিছু আচার পালন করে তাদের সমষ্টি। অন্য কথায়, প্রচলিত অর্থে ধর্ম মূলত মানুষ ও অতীন্দ্রিয় পরম শক্তির মধ্যে এক ধরনের বিশ্বাস ও সম্পর্ক বিশেষ। ইসলাম এ অর্থে একটি ধর্ম না হওয়ার কারণ হলো এ ধর্মে রয়েছে অসংখ্য রাজনৈতিক বিধানাবলী, নিজস্ব অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিস্তারিত নির্দেশ, সন্ধি তথা আন্তর্জাতিক বিষয়ে মূলনীতি সহ ইহজীবনের বাস্তব ও ব্যাপক পরিসরে কার্যকর করতে হবে এমন সব আইন কানুন। এ সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন:

> ইসলাম ইসলামই। তার জুড়ি এ দুনিয়ায় নেই। ইসলাম স্বয়ংসম্পূর্ণ (Self sufficient) গতিকে তার সঙ্গে অন্য কোনো মতবাদের ঐক্যমূলক তুলনা চলে না। ইসলাম এক দ্বীন। তাতে রয়েছে একটা প্রত্যয় (Faith), একটা জীবন পদ্ধতি (Code of life), সামাজিক ব্যবস্থা (Social organisation), অর্থনৈতিক মতবাদ (Economic order), রাজনৈতিক মতবাদ (Political creed) এবং জীবনাদর্শ (Idel of life) । অর্থাৎ সোজা কথায়, মানব জীবন যাপন করতে হলে যে সব সমস্যা বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তার সমাধান বা ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কিভাবে সুস্থ ও সফল জীবন যাপন করতে পারে-ইসলামের মধ্যে তার ব্যবস্থা রয়েছে। [১০]

[১০] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, 'ইসলামের সত্যিকার রূপ',ঢাকা, মাসিক মোহাম্মাদী ২৭ বর্ষ; ১১ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬৩, পৃ. ৭৩

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ইসলামকে স্বাভাবিক ধর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে এতে একটি ধুম্রজাল সৃষ্টি হতে পারে। কারণ, প্রকৃতিবাদ (Paganism) ও স্বাভাবিক ধর্ম বলেই দাবী করে। তাঁর মতে, প্রকৃতির বিভিন্ন দিকের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা প্রকৃতিবাদীদের জীবনের লক্ষ্য। গ্রীকদের মধ্যে প্রকৃতিবাদ কোন এক সময় প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইংরেজ কবি সুইনবার্নও (Swinburne) ছিলেন প্রকৃতিবাদী। বাংলাভাষী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও ছিলেন প্রকৃতিবাদী। ইসলাম প্রকৃতিবাদীদের অর্থে স্বাভাবিক ধর্ম নয়। আবার স্বাভাবিক ধর্ম বলতে যদি মনে করা হয়, মানব জীবনের কোন স্বাভাবিক বৃত্তির অনুশীলন, সে অর্থেও ইসলাম স্বাভাবিক ধর্ম নয়। ইসলাম বলতে মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পথে সহায়ক ধর্মই বুঝতে হয়। তিনি আরও মনে করেন, ইসলাম স্বাভাবিক ধর্ম এতেও ভুল ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে । তিনি এখানে স্বভাবকে গড্ডলিকা প্রবাহে বা নানাবিধ আমোদ-প্রমোদে বা উৎসবের আয়োজন অর্থে ব্যবহার করতে রাজী নন। আবার স্বাভাবিক ধর্ম বলার অর্থ যদি প্রবৃত্তির অবাধ সন্তুষ্টির বিধান বুঝায়-এরূপ বিধান ইসলামে অনুমোদিত নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলাম এদের বিকাশও কামনা করে, যেমন, কাম, ক্রোধ. লোভ-এগুলো মানুষের রিপু। এগুলির পূর্ণ বিকাশ ইসলামের কাম্য নয়। কামকে সুপথে পরিচালিত না করলে তা যেমন শরীরের বা মনের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে, তেমনি ক্রোধ বা লোভের কারণেও মানব জীবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অপরদিকে, বৈধ উপায়ে পরিচালিত কাম থেকেই হয় বংশবৃদ্ধি। নিয়ন্ত্রিত ক্রোধ বা লোভ রিপু নয় বরং জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক প্রবৃত্তি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রোধ অনেক ভাল ভুমিকা রাখতে পারে। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে লোভ মানুষকে অনেক উপরে নিয়ে যায়। ইসলামকে স্বাভাবিক ধর্ম বলতে তাই সহজাত প্রবৃত্তিগুলির সুনিয়ন্ত্রিত বিকাশকেই বুঝায়।

ইসলাম শুরু থেকেই মানব জীবনকে দেখেছে পূর্ণাঙ্গরূপে। সে জন্য বিভিন্ন প্রবৃত্তি বা জ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে তারতম্য করলেও কোনটিকে অস্বীকার করেননি। মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশের পথ সুগম করার জন্য এ জীবন দর্শনে মানব জীবনের বৈচিত্র্য পূর্বেই

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃত হয়েছে। ইসলামে জগৎ ও মানুষের পূর্ণ পরিচয় লাভের জন্য জ্ঞানের সবগুলো পদ্ধতিই গৃহীত হয়েছে। তাই আজরফের মতে, ইসলামকে স্বাভাবিক ধর্ম বলতে মানব–প্রবৃত্তির কোন বিশেষ দিক বা মানব-জ্ঞানের কোন বিশেষ পদ্ধতির এক-চোখা অনুশীলন বুঝায় না বরং ইসলাম মানুষের প্রবৃত্তিকে ধ্বংস না করে তার বিকাশের পথে সহায়ক বলেই স্বাভাবিক অর্থে ব্যবহৃত হয় ।

ইসলাম গোঁড়াতেই মানব জীবনের সবগুলো দিককে স্বীকার করে নিয়েছে বলে ইসলামকে বলা হয়েছে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। মানব প্রকৃতির অনুকুলেই তার ভিত্তি গড়ে উঠেছে বলে আমাদের প্রিয় নবী হযরত (সা:) বলেছেন: "সদ্যজাত শিশু সত্য ধর্মেই জন্ম নেয়– তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নি উপাসক করে তোলে"। [১১]

সার্বজনীন ধর্ম ইসলামের একনিষ্ঠ অনুরাগী মোহাম্মদ আজরফ ইসলাম ধর্মকে মানব জীবনের অপ্রতিহত অগ্রযাত্রায় চালিকা শক্তিরূপে গ্রহণ করেছেন । তাঁর মতে, ইসলাম তাই বিশ্বের মূল কারণের মধ্যে স্বীকার করে নিয়েছে অসংখ্য গুণাবলী এবং সেগুলোর মধ্যে স্থাপিত এক মহাসংহতি। ইসলাম ধর্মে আল্লাহকে ধারণা করা হয় অসংখ্য গুণাবলীর ধারক হিসাবে; যাত এর দিক থেকে তিনি যেমন এক, তেমনি বহুবিধ গুণাবলী তাঁর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তিনি এক । এটি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে তাঁর অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে সমন্বয় স্থাপনে কৃতিত্ব থেকে। আল্লাহকে এভাবে ধারণা করার ফলে মানুষ তাঁরই আদেশে বিভিন্ন গুণাবলীর পারস্পরিক ভিন্নতা ও সংঘর্ষের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনে সমর্থ হয় বলেই তাঁর সমন্ধে এ ধারণা মানব জীবনের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজন। আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলীর মধ্যে সৎপথ প্রদর্শক, ন্যায় বিচারক প্রভৃতি গুণগুলোই প্রধান।

[১১] বোখারী শরীফ, হাদীস নং ২৬২৮

Dhaka University Institutional Repository

সৎভাবে জীবন যাপনের জন্য মানুষ আল্লাহর এ গুণ থেকেই প্রেরণা পায় এবং তার নিজের জীবনে ও সামাজিক জীবনে ভারসাম্য রক্ষার জন্য তাঁকে ন্যায় বিচারক বলে ধারণা করা তার পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে দেওয়ান আজরফ বলেন:

> বিশ্বের মূল কারণকে একক বলে স্বীকার করে না নিলে এ দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার কোন নৈতিক মূল্য থাকে না। মানুষের মত স্রষ্টাগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন বর্ণের ও রক্তের হিংসাপরায়ণ এবং কলহপ্রিয় হলে মানুষের মধ্যে হিংসা- বিদ্বেষ, মারামারি, হানাহানিরও ন্যায়সংগত যুক্তি উপস্থিত করা যেতে পারে । এ বিশ্বের মূলধারাকে তাই ধারণা করা হয় একক হিসাবে। আবার তিনি এক হলেও বিশ্বের সঙ্গে যদি তার যোগ না থাকে , তা হলে সৃষ্টির বা বিবর্তনের পরে তিনি এ দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যেতে পারেন । এ দুনিয়ার মূল কারণ তিনি হলেও তাকে তিনি মানুষের অধিকারে ছেড়ে দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রেও মানুষের মধ্যে এ দুনিয়ায় অধিকার নিয়ে জ্বলে উঠে যুদ্ধের দাবানল। [১২]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মনে করেন, আমাদের মনে প্রাণে একটা কথা বিশ্বাস করে নিতে হবে যে আল্লাহ এক। তিনি সৎ পথ প্রদর্শক এবং ন্যায় বিচারক। আর যদি আমরা তা স্বীকার বা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস না করে, আল্লাহর একাধিক অস্তিত্বকে স্বীকার করি এবং এটা মনে করি যে আল্লাহ তাঁর অধিকার মানুষের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন তাহলে মানুষের মধ্যে দুনিয়া ভোগের অধিকার নিয়ে শুরু হবে মারামারি কাটাকাটি। তাছাড়া আমরা যদি পৃথিবীর দিকে তাকাই তাহলে দেখব আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী দুই পক্ষের মধ্যে বিশেষ দেশের অধিকার নিয়ে কলহ ও সংঘর্ষের ভুরি-ভুরি প্রমাণ পৃথিবীতে ইতিহাসে রয়েছে।

দেওয়ান আজরফ এর মতে, ইসলাম তাই আল্লাহকে কেবল স্রষ্টা, পালনকর্তা, বিবর্তনকারী রূপে মেনে নেয়নি বরং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে পৃথিবীর বুকে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিলে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকে না এবং একে অপরকে সমান মনে করে।

[১২] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, **ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে**, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৮০, পৃ. ১০

তখন দুনিয়ার বুকে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যের সঙ্গে মারামারি কাটাকাটির কোন কারণ থাকে না। তাই আমাদেরকে আল্লাহর জমিনে বাস করে, সকলেই সাধ্যমত শারীরিক ও মানসিক শ্রম দিয়ে প্রত্যেকের চাহিদামত ভোগ করার পক্ষে কাজ করে আদর্শিক রাষ্ট্র গঠন করতে হবে।

ইসলাম মানব জীবনকে অখন্ড হিসেবে ধারণা করে; বস্তুত মানব জীবনে বৈচিত্র্য থাকলেও এর মধ্যে ঐক্যও পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ বা রাষ্ট্র হচ্ছে জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়। তাই এখানে মানব জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে সমাজনীতি ও রাজনীতির সংযোগ রয়েছে। দেওয়ান আজরফের মতে, ইসলাম মানবজীবনের সমন্বিত শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য শুরু থেকেই এমন কতগুলো ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছে যাতে তার জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমন্বয়ের সৃষ্টি হতে পারে। এগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রেই আসে মানবতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। ইসলাম ব্যক্তিকে কখনো সমাজ জীবন হতে স্বতন্ত্রভাবে কল্পনা করেনি; দেহের এক অঙ্গের সাথে যেমন অপর অঙ্গের সমন্ধ বর্তমান, তেমনি বিভিন্ন মানুষের মধ্যেও একই স্বভাব বর্তমান। এ সত্যটি ইসলাম স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে: ''নিশ্চয়ই মানুষের ভ্রাতৃত্ব একই ভ্রাতৃত্ব'' [১৩]

মানবিক অখন্ডতা সম্পর্কে অন্য এক জায়গায় জোরালোভাবে ঘোষণা হয়েছে ঃ ''মানুষেরা একই জাতি ছিলো কিন্ত পরবর্তীকালে তাঁরা তাতে নানা বিভিন্নতা সৃষ্টি করেছে।'' [১৪]

আজরফের মতে, ইসলামের মধ্যে জীবন দর্শনের সুত্রগুলো পাওয়া যায়, এ জন্যই ইসলামকে মানবতার ধর্ম বলা যায়।

[১৩] আল কুরআন, ৬:৯২
[১৪] ঐ, ১০:১৯

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, কেবল বিমূর্ত তত্ত্বালোচনা করা বা উচ্চাঙ্গের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উদাহরণের মাধ্যমেই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না । এজন্য বাস্তবে দরকার এমন সব রক্তমাংসের মানুষের, যাঁরা নিজেদের জীবনে এ আদর্শকে বাস্তবায়ন করবেন । ইসলাম ধর্মের আর্দশকে যাঁরা জীবনে বাস্তবায়ন করেন তাঁদের বলা হয় মুসলমান। অনেক সাধারণ মুসলমান এক ধরনের হতাশায় ভোগে, তারা ভাবে যে, রাসুলুল্লাহ (সা:) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের পর এমন মানুষ আর পাওয়া যাবেনা; অর্থাৎ তাদের মতো ধর্মীয় জীবন যাপন সম্ভব নয়।

দেওয়ান আজরফ এ ধরনের চিন্তা ধারাকে সঠিক মনে করেন না। তিনি বিভিন্ন যুগের ইসলামী কর্মতৎপরতার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ইসলামের মধ্যে এমন শক্তি রয়েছে যা, যে কোন যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করতে ও চাহিদা মেটাতে সক্ষম। তিনি তার 'Islamic Movment' ও 'ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে' গ্রন্থ দুটিতে দেখিয়েছেন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কিভাবে অসংখ্য মানুষ সংগ্রাম করেছে । এ বই দুটিতে তিনি এসব আন্দোলনের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ইসলামী ভাবাদর্শ তথা তাদের কর্মসূচী ও নেতৃত্বের গুণাবলীর মুল্যায়ন করেছেন, তাদের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং সফলতার লক্ষ্যে ইসলামের মর্মবাণী ও প্রাণসম্পদ থেকে আহরিত পথ নির্দেশ করেছেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মতে, মানবজীবনের বিভিন্ন বৃত্তি ও প্রবৃত্তির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন; তবে এ বিচার বুদ্ধি নিছক মানবীয় ব্যাপার নয়, এটা স্রষ্টা আমাদের দান করেছেন। কাজেই এটাকে শুধু আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই ব্যবহার না করে, অন্যের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে ব্যবহার করতে হবে। যারা ভালোভাবে অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, তাদের জন্য বিচার বুদ্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; আর যারা শুধুমাত্র টিকে থাকতে চায় তাদের জন্য বিচার বুদ্ধির তেমন গুরুত্ব নেই। কাজেই বিচার বুদ্ধির প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং আল্লাহর অসংখ্য

Dhaka University Institutional Repository

গুণাবলিকে সমন্বয় করে তাঁর একত্ব উপলব্ধি করতে হবে। অন্যকথায়, আমাদেরকে আল্লাহর গুণাবলি আলাদাভাবে না দেখে বরং তাঁর গুণাবলিকে সমন্বিতভাবে দেখতে হবে; তাহলেই মানুষ তার জীবনে সংহতি খুঁজে পাবে।

দেওয়ান আজরফের মতে , মানব জীবনে বুদ্ধির সঙ্গে বোধি, বোধির সঙ্গে বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। তাই মানুষ কোন বিশেষ মাধ্যমের দ্বারা প্রাপ্ত বিষয়কে অন্য বিষয়ের মাপকাঠিতে বিচার করতে অধিক প্রয়াসী হয়। এজন্য ধর্মীয় জগতে বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন প্রশ্ন তুলেছেন। দেওয়ান আজরফ বলেন:

> জীবনের সঙ্গে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তবে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিই কি জীবনের একমাত্র জ্ঞানের মাধ্যম? তার বাইরে কি অন্য কোনো জ্ঞানের মাধ্যম থাকতে পারে না? বিজ্ঞানের জগতে দেখা যায়, প্রকল্প গঠনের প্রাক্কালে স্বজ্ঞা নামক অপর এক মাধ্যমের আশ্রয় নিতে হয়। গাছ থেকে ফলটিকে মাটিতে পড়ে যেতে নিউটন স্বচক্ষে দেখেছিলেন ; তবে মাটি যে ফলটিকে তার কেন্দ্রের পানে আকর্ষণ করেছে তা তিনি চাক্ষুষ দেখেননি । সেটা হচ্ছে তার অর্ন্তদৃষ্টি বা স্বজ্ঞাজাত জ্ঞানের ফল। তবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবার বুদ্ধিকে প্রয়োগ করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে ধর্মের রাজ্যে যে প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে, তাও এরূপ কোনো জ্ঞানের মাধ্যমেই সম্ভবপর বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার পরীক্ষা যেভাবে বুদ্ধির দ্বারা সম্ভবপর, ধর্মীয় প্রকল্পের পরীক্ষা সেরূপভাবে সম্ভবপর নয়। তবে জীবনের উন্নতিকল্পে তার কতটুকু দান রয়েছে তা পরীক্ষা করা যেতে পারে । তার প্রায়োগিক মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব। [১৫]

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, ইসলাম মানুষের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলোর কথা বলেছে এগুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিচার বুদ্ধির দরকার। মানুষ অনেক কাজ কেবল নিজের জন্যই করতে চায়, কারণ মানুষের ভিতরে রয়েছে হিংসা বা অহংকার এবং স্বার্থপরতা।

[১৫] মোহাম্মদ আজরফ, 'ধর্ম জগতে বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ', ঢাকা: দর্শন, ৮ম বর্ষ:১ম সংখ্যা, জুন ১৯৮৩, পৃ. ৭৫-৭৬

Dhaka University Institutional Repository

সে নিজে সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতে চায়, এর জন্য তার ভালো ঘরবাড়ি, ভালো খানাপিনা এবং ভালো পোশাক দরকার। এগুলো কেবল ব্যক্তি নিজের জন্য কামনা করলে অন্যান্য ব্যক্তির সাথে তার দ্বন্দ্ব লেগে যায়। কারণ, প্রত্যেকেই তার নিজের ইচ্ছা বা খেয়াল খুশি মত সবকিছু পেতে চাইলে একে অপরের সাথে সংঘাত বাঁধা অবশ্যম্ভাবী। এটা গেল মানবজীবনের স্বার্থপরতার দিক। অপরদিকে, মানুষ কেবল নিজের জন্যই ভাবে না, পাশাপাশি সে পরিবার-পরিজন বা সমাজের অন্য সদস্যেদের জন্যও চিন্তা করে। তাই মানবজীবনে জন্মলগ্ন থেকেই অর্ন্তনিহিতভাবে পরার্থপরতার বীজও নিহিত রয়েছে। মানুষ কেবল নিজেই সমস্ত কিছু হস্তগত করতে চায় না। সে তার পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, পরিবার-পরিজনের সুখ সমৃদ্ধির জন্যও ব্যস্ত থাকে। কাজেই মানব প্রবৃত্তির মধ্যে আত্মসুখ ও আত্মীয় স্বজনের সুখ দু'টোই সমানভাবে রয়েছে। মানুষের ভিতরের আত্মসুখ ও পরসুখ এগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিহার করে শান্তি সহকারে বসবাস করাই হয়ে দাঁড়ায় মুখ্য বিষয়। আর এর জন্য দরকার মানুষের বিচারবুদ্ধির। সুতরাং দেওয়ান আজরফের মতে, ধর্মের সাথে যদি বিচার বুদ্ধির সংযোগ স্থাপন করা যায় তাহলে মানব জীবন অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবন শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত হবে।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ যুক্তি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং অভিজ্ঞতা ও স্বজ্ঞার সাহায্য নিয়ে, ঐশী জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে ইসলামের এ ব্যাপক ও কল্যাণধর্মী রূপ উদ্ভাবন করেন এবং সমকালীন মানুষের সামনে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে তা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। তাঁর রচিত বিপ্লবী গ্রন্থ 'জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম' নামক পুস্তকে তা সহজেই লক্ষণীয়। এ প্রবৃত্তিগুলো কিভাবে একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষ পরিহার করে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে, সেটিই হয়ে দাঁড়ায় এ ক্ষেত্রে ভাবার বিষয় এবং সে সমস্যার সমাধান হয় মানুষের বিচার বুদ্ধির দ্বারা। বিভিন্ন ব্যক্তির নানাবিধ সম্বন্ধের ভিত্তিতেই গড়ে উঠে মানুষের সমাজ। সমাজের পূর্ণ পরিণতিই রাষ্ট্র। তাই মানুষের বিকাশ যাতে সব ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়, সেজন্য মানুষের প্রবৃত্তিগুলোর সন্তোষবিধান এমনভাবে করা দরকার, যাতে তাদের কোন একটির

Dhaka University Institutional Repository

সন্তোষ বিধানের ফলে মানব জীবনে নৈরাজ্য দেখা না দেয়। তাই মানুষের প্রবৃত্তিগুলোর সন্তোষ বিধানের ক্ষেত্রেও বিচার-বুদ্ধির কার্যকারিতা, মূল্যবোধ বিচার ও বাস্তবে তাদের রূপায়ন করা হয়ে পড়ে অপরিহার্য।

এ সম্পর্কে দেওয়ান আজরফ বলেন:

> মানুষকে যদি আল্লাহরই এক প্রতিনিধি হিসেবে ধারণা করা যায়, তা হলেই মানুষের উল্লিখিত কাজে আত্মনিয়োগ হয়ে পড়া অবশ্য কর্তব্য। তাই ইসলাম আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত ও সার্বভৌমত্বের সঙ্গে মানুষের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করে নিয়ে এ দুনিয়ার নানাদিকে প্রগতির প্রেরণা দান করেছে । আল্লাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও জ্ঞানদাতা বলে স্বীকার করে নিয়ে নানা পদ্ধতিজাত জ্ঞানকে স্বীকার করে নিয়েছে । মানুষের জীবনে জ্ঞানের অনন্ত সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে। ইসলামের (স্বেচ্ছালব্ধ জ্ঞানের) সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা হিক্‌মতকে স্বীকার করে নিয়ে জ্ঞানের রাজ্যে মানব জীবনের বিকাশের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। [১৬]

তাই বলা যায়, মানুষের স্বরূপ সম্পর্কে দেওয়ান আজরফের বক্তব্য বেশ জোরালো ও তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ মানুষকে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তাঁর খলিফা হিসেবে এবং একটি বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে। এ দায়িত্ব হলো তাঁর সৃষ্টিকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করা। মানবসত্তাও পৃথিবীর অন্যান্য সত্তার মতো ক্রমবিকাশমান; আর তাই ক্রমিক উন্নতির মাধ্যমেই মানুষ অগ্রসর হতে পারে পরমসত্তার দিকে। এ মতের পক্ষে কুরআন ও হাদিসের সমর্থন রয়েছে এবং আল-গাযালী ও আল্লামা ইকবালসহ মুসলিম ধর্মবিদ ও দার্শনিকদের অনেকেই অনুরূপ মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। গভীর থেকে গভীরতর ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অর্জনের চেষ্টা মানুষের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শুধু মানুষ কেন, সব জীবের মধ্যেই এ প্রবণতা বিদ্যমান, যদিও মানুষ এ ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানের অধিকারী। এই ক্ষমতা মানুষকে অনন্ত সম্ভাবনা ও অসীম স্বাধীনতা প্রদান করেছে। প্রাণীকূলের মধ্যে মানুষই লাভ করেছে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য; এবং কেবল মানুষই পরিপূর্ণ চেতনা অর্জন করতে পেরেছে তার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে। এ সম্পর্কে দেওয়ান

---

[১৬] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, **ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে**, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ আজরফ বলেন:

> ক্রমবিকাশের মাধ্যমে মানুষের পরিণতি ঘটে 'ইনসান-ই-কামেল' বা পূর্ণাঙ্গ মানুষে। এ ধরনের পূর্ণবিকশিত মানুষের জীবনেই রূপায়িত হয় আল্লাহর গুণাবলী। ঐশী গুণের রূপায়নই মানুষকে পরিণত করে বজ্রের মত কঠোর এবং কুসুমের মত কোমল সত্তায় । আর এ থেকে যে মানবতার বিকাশ ঘটে তা যথার্থই পূর্ণাঙ্গ মানবতা। এহেন মানবতাবাদের বিকাশ ব্যতিরেকে মানুষের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ রচনার প্রশ্ন তো উঠেই না, বরং মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখাই অসম্ভব ।[১৭]

আজরফের মতে, মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী। শৈশব থেকেই সে চিন্তা করে তার জীবনের উৎস কোথায় এবং পরিণতিতে সে কোথায় যাবে ? তার জীবনের উদ্দেশ্য কী ? আর এটা কোনো অজ্ঞতা প্রসূত চিন্তা নয় বরং এটা হচ্ছে সুস্থ সচেতন মানুষের মননের বিকশিত রূপ। মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে পর্যালোচনা করলে যা আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে মানবেতর প্রাণীর জীবন থেকে মানুষের পার্থক্য। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, যে সব জিজ্ঞাসা অন্যান্য প্রাণীর জীবনে দেখা দেয় না, তা মানব-জীবনে অতি শৈশবেই দেখা দেয়। জীবনের প্রারম্ভেই মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে: আমি কোথা হতে এলাম ? কোথায় ছিল আমার পূর্বের বাসস্থান ? কোথায়- ই- বা আমি ফিরে যাবো ? আমার চারদিকে যে সব বস্তু রয়েছে, ওরা আমার শত্রু না মিত্র ? আমার সম্মুখে যে সব লোক মৃত্যুমুখে পতিত হলো, ওরা কোথায় গেলো ? মানব প্রকৃতির ব্যাপক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধ্যক্ষ আজরফ আবিষ্কার করেন যে প্রকৃত ধর্মীয়বোধ অজ্ঞতা প্রসূত নয় অথবা সরল, ধনীক ও শোষক-শাসক কতৃক দুর্বল বা শোষিতদের জন্য সান্তনা স্বরূপ সৃষ্ট কিছু নয় বরং যথার্থ ধর্মীয় চেতনা আত্মসচেতন ও শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ মানুষের মধ্যেই অধিক বিকশিত হয়।

[১৭] আমিনুল ইসলাম, **মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ৩৮৩-৮৪

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মনে করেন, ধর্ম মানুষের কল্যাণের জন্য এসেছে। ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়া মানুষ প্রকৃত বা পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারে না। কিন্তু এই ধর্মের দ্বারাই আবার যুগে যুগে মানুষ শোষিত , বঞ্চিত ও প্রতারিত হয়েছে। মানুষের শোষিত ও বঞ্চিত হবার কারণের ব্যাখ্যায় ড: আনিসুজ্জামান বলেন:

> . . . শোষণের কারণ প্রকৃত ধর্মীয় চেতনা নয়; বরং তার অভাব। তবে একথা সত্য যে বিভিন্ন যুগে ধর্মের নামে শোষণ-শাসন করা হয়েছে। এর কারণ হলো মানুষকে অন্যায় ও অসত্যের নামে শোষণ করা সহজ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব, নয়। সেজন্য স্থান- কাল- পাত্র ভেদে ভাল কিছুর আড়ালেই অন্যায় ও অশুভ কিছু অর্জন করতে হয়। মানব মানসে ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে বলেই এ নাম ভাঙ্গিয়ে মানুষের প্রতারণা করা যায়। এতে প্রকৃত ধর্মের দুর্বলতা নয় বরং শক্তিমত্তাই প্রমাণিত হয়। রাজনীতি ও শোষণ মুক্তির নামে যে প্রচুর অপকর্ম হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, তা আজ আর চোখ-কান খোলা মানুষদের বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা। রাজনৈতিক দল, অর্থনৈতিক কর্মসূচি ও সংস্কৃতিক চেতনা ও স্ফূর্তির নামে মানুষে মানুষে বিভিন্ন দেশে ও সময়ে কম বিভেদের সৃষ্টি হয়নি। সাম্প্রদায়িকতা কেবল ধর্মীয় পরিচয়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি- ভাষা অঞ্চল, গোত্র, বর্ণ ও নারী-পুরুষ বিচারে মানুষকে বিভিন্ন সময়ে খন্ডিতভাবে দেখা হয়েছে এবং তাকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সেজন্য অধ্যক্ষ আজরফ মনে করেন যে ধর্মের বিপক্ষে যে শোষণ ও বিভেদের কথা বলা হয়, তার কারণ প্রকৃত ধর্মীয় চেতনা নয় বা এজন্য দায়ী সত্যিকার ধর্মীয় ব্যক্তিরা নয় বরং একশ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী ও ধর্মের মুখোশ পরা স্বার্থান্বেষী মহল। সব ঐশী ও বড় ধর্মগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সেখানে মানবতার একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। অন্যায়, অসত্য এ শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিটি ধর্মের সত্যিকার বীরেরা যুগে যুগে সংগ্রাম করে গেছেন। [১৮]

[১৮] আনিসুজ্জামান, 'দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ', **দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সম্বর্ধনা গ্রন্থ**, প্রকাশ: ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ.৩৬

উল্লিখিত ধরনের একজন বীর হলেন হযরত আবু জর গিফারী (রা:)। তিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে শোষণ-মুক্তির লক্ষ্যে একজন নিবেদিত প্রাণ বীর সৈনিক। তাঁর সম্পর্কে দেওয়ার মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন, 'বীর সৈনিক আবুজর', 'ইতিহাসে উপেক্ষিত একটি চরিত্র', 'Abu Dhar Gifari' গ্রন্থত্রয়। এই সব গ্রন্থে তিনি

দেখিয়েছেন কেন এবং কিভাবে মদীনার সেই সাম্যবাদী ইসলামী সমাজের মধ্যে সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের বীজ সংক্রমিত হয় এবং আস্তে আস্তে ইসলামী বিপ্লব বিশ্ববিপ্লবের পরিণতি লাভ করার আ্যাগেই মাঝপথে হারিয়ে যায়।

আমাদের জাতীয় জীবনে মোহাম্মদ আজরফের ভাবনা ও ধর্মীয় চিন্তা সত্যিকার অর্থে অনুকরণীয়। তাঁর ধর্মীয় জ্ঞান আমাদের সমাজ জীবনকে করেছে গতিশীল। আর এ কারণেই আত্ম-উপলব্ধির সাথে বাস্তবতার মিলন স্থাপনে তাঁর রচনাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি মহাকবি ইকবালের ভাবশিষ্য। দার্শনিক কবি হিসেবে ইকবাল যেমন স্বীয় অহংবোধ অতিক্রম করেছেন এবং তা তাঁর মরমী কবিতায় স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন, ঠিক তেমনি আজরফও রোমান্টিক আবেগে প্রবহমান জীবন ও জগতের মধ্যে পরম অসীমতায় নিজেকে বিলীন করতে চেয়েছেন। অবশেষে বলা যায় তিনি সর্বদা মানুষের জন্য পারলৌকিক জীবনে পূর্ণমুক্তি কামনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্দেশিত এবং নবী করিম (সা:) কর্তৃক প্রদর্শিত জীবন বিধানের মাধ্যমেই তিনি মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের কথা ভেবেছেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মতে, হযরত রাসূলে আকরাম (সা:) এর মানবতাবাদ ছিল বাস্তবধর্মী। আজকের পৃথিবী তাঁর সে মানবতাবাদ গ্রহণ করলে অধিকাংশ দ্বন্দ্বেরই আবসান হতো। মানবতাবাদের দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দার্শনিক আজরফ জীবনব্যাপী সেই সত্যের সন্ধান করেছেন যা মানুষের মাঝে কোন প্রভেদ সৃষ্টি করেনি। মানুষের মুক্তি ছিল তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য, আর এ ধরনের মতবাদের মাধ্যমেই তা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তিনি বিশ্বাস

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। ধর্মকে বাদ দিয়ে তিনি কোনো মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে, পৃথিবীর প্রতিটা ধর্মই মানুষের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ, কোন হিন্দু যদি তার সনাতন ধর্মকে পালন করে তাহলে সে একজন ভাল মানুষ হবে, একজন খ্রিষ্টান বা ইহুদি যদি তার ধর্মকে পালন করে তাহলে একজন ভাল মানুষ হবে, তেমনিভাবে একজন মুসলমান যদি তার ধর্মকে পালন করে, তাহলে সেও একজন ভাল মানুষ হবে। আর এ পৃথিবীকে পরিচালনার জন্য দরকার ভাল মানুষের।

দেওয়ান আজরফের মতে, প্রত্যেকেই তার নিজের ধর্মপালন করবে, এক ধর্মাবলম্বী অন্য ধর্মাবলম্বীর উপর আঘাত করবে না। যদি তা করে তাহলে তা হবে মানবতাবিরোধী। এ প্রসঙ্গে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেছেন: ''মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেছি। আমি ইসলাম ধর্মাবলম্বী। আমি মনে করি, ইসলাম ধর্ম মানবতা প্রসারের জন্য যে মর্মবাণী প্রচার করেছে তা অনুসরণ করলে একজন মানুষ মুসলিম হয়ে প্রচন্ড মানব দরদী হতে পারে। নিজের সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন, মানুষের দ্বারা মানুষের যাতে কোন অপকার না হয়, সে জন্য আমি যতদিন বেঁচে আছি চেষ্টা করে যাব।'' [১৯]

অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জীবন-যাপন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি তাঁর কথা বাস্তবে পরিণত করেছেন। সারা জীবন তিনি মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন। ১৯৮৫ সালে অক্টোবর মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে 'God: The Contemporary Discussion' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ড: কাজী নুরুল ইসলাম এবং দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ একসাথে উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

[১৯] হাসান শাহরিয়ার, 'দেওয়ান আজরফ: একটি নক্ষত্রের পতন,' ঢাকা: **দৈনিক ইত্তেফাক**, ৫ নভেম্বর ১৯৯৯, ২১ কার্তিক ১৪০৬, পৃ. ১৯

সেখানে একরাত্রে ড. কাজী নুরুল ইসলাম, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করার পর খুব বেশি কান্না করতে দেখে, কারণ জিজ্ঞাসা করলে দেওয়ান আজরফ কাজী নুরুল ইসলামের নিকট তার পরিবারের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যা পরবর্তীতে কাজী নুরুল ইসলাম প্রকাশ করেন এভাবে :

> দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের বাবা এক সুন্দরী যুবতীকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের সময় কথা ছিল কয়েক একর জমি এবং কয়েক হাজার টাকা দেবেন। কিছুদিন পরে ভদ্রমহিলাকে ভাল না লাগায়, তাঁকে তালাক দিলেন। কিন্তু ওয়াদা পালন করলেন না। সামান্য কিছু জমি ও সামান্য কিছু টাকা দিয়ে তাঁকে বিদায় করলেন। এ ব্যাপারে কোন লিখিত প্রমাণ না থাকায় ভদ্রমহিলাও তাঁর নায্য অধিকার আদায় করতে পারলেন না। পুরো বিষয়টি দেওয়ান আজরফ স্যার জানতেন। তাই তাঁর বাবাকে ওয়াদা পূরণের জন্য একাধিকবার তাগিদ দিলেন। পরে একদিন ভদ্রমহিলা নিজেই স্যারের কাছে এসে বিচার চাইলেন। স্যার তাঁকে আদালতে মামলা করার পরামর্শ দিলেন এবং তিনি যে ঘটনা সম্পর্কে অবগত, তা লিখতে অর্থাৎ তাকেই বাপের বিরুদ্ধে সাক্ষী মানার কথা বললেন। আদালতে মামলা ওঠলো। আজরফ স্যার সাক্ষীর কাঠগড়ায় দায়ী বাপের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিলেন। মামলায় তাঁর পিতা হেরে গেলেন। অনেক একর জমি, অনেক টাকা এবং সর্বোপরি জরিমানা দিতে হলো তাঁকে। মামলার রায়ের পরে তাঁর বাবা তাঁকে বাড়িতে এসে প্রশ্ন করলেন, 'আমাকে হারিয়ে তোমার কি লাভ হলো ? স্যার জবাব দিলেন, ''আপনার বিরুদ্ধে আমি সাক্ষ্য দিইনি, সাক্ষ্য দিয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে। [২০]

দেওয়ান আজরফ ধর্মকে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। তাই উপার্জন থেকে শুরু করে খানা-পিনা পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই হারাম-হালাল, জায়েজ- নাজায়েজ ইত্যাদি চিন্তা ভাবনা করে জীবন যাপন করতেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন:

[২০] ড. কাজী নুরুল ইসলাম, 'দেশের বাইরে আজরফ সাহেবেকে যেভাবে দেখেছি,' প্রাগুক্ত, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ **সম্বর্ধনা গ্রন্থ**, পৃ. ২৭-২৮

Dhaka University Institutional Repository

. . . জন্ম নিয়েছিলাম জমিদার বংশে। তবে ছেলেবেলা থেকেই এ ব্যবসাটি আমার মন:পুত ছিলো না। একদল মানুষ বসে বসে আরাম করে খাবে এবং অপর দল সারা বৎসরের পরিশ্রমের ফল সে দলের লোহার সিন্দুকে এনে তুল দেবে, এটা আল্লাহর বিচার নয়- কোন সুস্থ মস্তিস্কের বিচারও নয়। তবে একে অস্বীকার করলেও এটাই ছিল জীবিকার একমাত্র উপায়। একে মহামানব তলস্তয়ের মত লাঙল যার মাটি তার, এ নীতির আলোকে লাঙলের মালিকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার উপায় ছিলো না। কারণ যে সম্পত্তি ভোগ করতাম, তা ছিলো বাবা-মায়ের ওয়াকফ করা। তবে জ্ঞান বিশ্বাস মতে খাজনা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে কারো কাছ থেকে কানাকড়িও আদায় করি নি। [২১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইসলাম ধর্ম মানবতা প্রসারের জন্য যে মর্মবাণী প্রচার করেছে তিনি তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। ইসলামকে তিনি যে পুরোপুরি নিজের জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন তার প্রমাণ আমরা তাঁর জীবনের অন্যান্য ঘটনাবলীর মধ্যেও লক্ষ করি। ভারত পাকিস্থান বিভাগোত্তর কালে (১৯৪৮) নিজে জমিদার পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও নানকারদের পক্ষাবলম্বন করে তিনি জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, এ আন্দোলনকে সংঘটিত করেছেন এবং সর্বদা নেতৃত্ব দিয়েছেন। শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধের কারণেই তিনি তৎকালে অভিজাত ও ধনী পরিবারে প্রচলিত অনেক রকম রেওয়াজ ও সাধারণ মানুষের প্রতি অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তিনি সব সময়ই সামন্ত প্রভু ও জমিদারদের বিরোধিতা করে প্রজা-সাধারণের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। আপন পারিবারিক স্বার্থ ও কোন প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বন্ধনও তাঁর এ মনোভাব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কোন বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় নি। তিনি নিজ পিতা ও মাতামহের অনেক কাজের, যেগুলো তাঁর কাছে প্রজাদের জন্য কল্যাণকর বলে মনে হয়নি সেগুলোর, প্রতিবাদ করেছেন। যথাসময়ে খাজনা দিতে না পেরে খাজনা দেওয়ার সময়সীমা বর্ধিত করার জন্য প্রজা-সাধারণ তাঁর কাছে আসলে তিনি তাদের পক্ষে সুপারিশ করতেন।

[২১] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, **সোনা ঝরা দিনগুলি,** ঢাকা: উৎস প্রকাশন, পৃ. ২২২

তিনি কেবল খাজনা দেয়ার সময় বাড়ানোর জন্যই সুপারিশ করেননি, যাদের তাঁর কাছে খাজনা দিতে অসমর্থ বলে মনে হয়েছে, তাদের অনেকের আংশিক এমনকি পূর্ণ খাজনা মওকুফ করার জন্য পর্যন্ত সুপারিশ, এমন কি নিজে যেয়ে তাদের পক্ষে আবেদন করেছেন। সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন কী করে এ বিপন্ন প্রজা- সাধারণকে জমিদারদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, অধ্যক্ষ আজরফ ইসলাম ধর্মকে নিজের জীবনে ধারন করেছেন এবং তদানুযায়ী জীবন-যাপন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কাছে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের কোনো ভেদাভেদ ছিল না। তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবেই তাঁর হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ধর্মীয় গোড়ামীকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। তার প্রমাণ স্বরূপ আমরা সন্তোষ গুপ্তের আজরফ সম্পর্কে লেখা একটি প্রবন্ধে লক্ষ করি:

> শৈশবে সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেও চারপাশের সাধারণ মানুষের সাথে অবস্থানের ব্যবধান তাঁকে পীড়া দিতো। ধর্মের শিক্ষার সাথে এই অসংগতি জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁকে আরো জিজ্ঞাসু করে তোলে। কোনরূপ ধর্মীয় গোঁড়ামী তাঁকে আশ্রয় করেনি। উপলব্ধির পূর্ণতা প্রাপ্তির বয়সে পৌছার আগেই বিভিন্ন ধর্মের মর্মবাণীকে জানার আগ্রহ তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশনে এক আলোচনা সভায় তিনি প্রধান অতিথি হয়ে গেছেন। আলোচনা সভা শুরুর আগে তাঁর সাথে কথা বলছিলাম । অধ্যক্ষ দেওয়ান আজরফ বলেন, ছোট বয়সেই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে যেতেন। এ কথাটির মধ্য দিয়েই স্পষ্ট যে, জিজ্ঞাসু মনের অধিকারী হিসেবে তিনি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি এই আকর্ষণ অনুভব করতেন। [২২]

[২২] সন্তোষ গুপ্ত, 'দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ আমার চোখে', প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত কথাটির প্রমাণ আমরা তাঁর নিজের মেয়ের লেখনীর মাধ্যমেও পাই। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর মেয়ে সাদিয়া চৌধুরী পরাগ বলেন:

> নরসিংদীতে আসার ক'মাস পর শুনতে পেলাম হিন্দুস্তানে রায়ট লেগেছে। সম্ভবত উনিশশো তেষট্টি-চৌষট্টি সালের কথা। এবং এর ফলস্বরূপ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কোনও কোনও স্থানে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ছিল। সে সময় নরসিংদীর অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা ভয় বিহবল অবস্থায় কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ অর্থাৎ আমার বাবা দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে থাকে। তিনি পরিস্থিতি বুঝে তাৎক্ষণিকভাবে কলেজের ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে মিটিং করে কার্যকরী কমিটি গঠন করেন। হিন্দুধর্মীয় যুবতী কন্যা - বধূ এবং শিশু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষে এনে আশ্রয় দিতে থাকেন এবং তাদের ধন-সম্পদ আমানত রাখার উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রেরণ করতে থাকেন। সেদিন অশিতিপর একবৃদ্ধা বাবাকে দোয়া করেছিলেন, তুমি জন্মে জন্মে এভাবে মহামানব হয়ে ফিরে এসো, বাবা। [২৩]

দেওয়ান আজরফও প্রিয় নবীর সেই সুমহান আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে মানুষকে ভালোবাসার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মাদ (সা:) এর একটি হাদীস প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। তিনি বলেন:

> যে লোক কোনো জিম্মিকে (ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিক) কষ্ট বা জালাযন্ত্রণা দিলো, সে যেন আমাকে কষ্ট ও জালাযন্ত্রণা দিলো। আর যে লোক আমাকে জালাযন্ত্রণা ও কষ্ট দিলো, সে মহান আল্লাহকে কষ্ট দিলো। যে লোক কোনো জিম্মিকে কষ্ট দিলো আমি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী। আর আমি যার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী, তার বিরুদ্ধে আমি কেয়ামতের দিন মামলা লড়ব। [২৪]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মানুষের প্রতি দরদ ও মমত্ব বোধের প্রমাণ আমরা অন্য একটি ঘটনা থেকেও পাই। ঘটনাটি বর্ণনা করেন তাঁর ছোট ছেলে আবু সাইদ জুবেরী:

[২৩] ঐ, সাদিয়া চৌধুরী পরাগ, 'বিপন্ন হেমন্ত দিন', পৃ. ৭৮-৭৯
[২৪] আবু দাউদ থেকে উদ্ধৃত, আতিকুর রহমান নগরী,' অমুসলিমদের অধিকার', নয়াদিগন্ত, ঢাকা: প্রকাশ , শুক্রবার, ২২ ফাল্গুন, ১৪২১, ৬ ই মার্চ, ২০১৫, পৃ. ১০

আমাদের গ্রামের একজন লোকের নাম ছিল আজর আলী। সে ছিল কুষ্ঠ রোগী। দুই হাতের কিছু অংশ পঁচে গিয়েছিল। তিনি আমাদের ঢাকার বাসায় আসতেন। আমরা দুই ভাই যে রুমে পড়াশোনা করতাম আব্বা তাকে সেই রুমে থাকতে দিতেন। তার সাথে বসে গল্প করতেন। আমরা কিছু বললে বলতেন কুষ্ঠরোগ ছোঁয়াছে নয়। পড়শোনার অসুবিধার কথা বললে, বলতেন তোমরা একটু কষ্ট কর। তিন দিন পরই সে চলে যাবে। পরে লোকটাকে টাকা- পয়সা দিয়ে বিদায় করে দিলেন। [২৫]

উপরের আলোচনায় দেখা যায়, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা:) জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে ভালোবেসেছেন। তাঁর আনীত দ্বীন, তথা ইসলামি আদর্শকে গ্রহণ করে অধ্যক্ষ আজরফ দাঙ্গার সময় হিন্দুদের তাঁর কলেজে আশ্রয় দিয়ে এবং কুষ্ঠ রোগীকে নিজের ভাড়াটে বাসায় আশ্রয় দিয়ে প্রকৃত ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি শুধু তাত্বিক ধর্মের কথাই বলেননি, নিজের জীবনে ধর্মকে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন যে, আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে এ যুগেও প্রকৃত ধর্মীয় জীবন যাপন করা যায়। আর ইসলাম ধর্ম জীবনে ধারন করলে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকেনা।

আমাদের সমাজে বর্তমানে অনেক কিছুর মতো, ধর্মকে নিয়ে ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা কম হচ্ছে না। কিন্তু মোহাম্মদ আজরফ এই সব ব্যক্তি স্বার্থের দ্বারা প্ররোচিত হন নাই বরং ইসলামের সুমহান আদর্শ, অকৃত্রিম বিশ্বাস ও নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে কাজ করেছেন। আমাদের সমাজে অনেকে স্কুল,কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে অনেক সম্পদের মালিক হয়েছেন, আনন্দ ও বিত্ত বৈভবের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে মোহাম্মদ আজরফ স্বাতন্ত্র্য আদর্শের অনুসারী ছিলেন। তিনি আমাদের প্রিয় নবীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত সাহাবী আবুজর গিফারী (রা:) এর নামে ঢাকায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

---

[২৫] আবু সাইদ জুবেরী, দেওয়ান আজরফের ছোট ছেলে; তাঁর কাছ থেকে আমি নিজেই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি, স্থান: দোহালিয়া, সুনামগঞ্জ, তারিখ: ১৪-০৫-২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে এটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপলাভ করেছে। ইসলামের ইতিহাসে গুণী ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন হযরত আবু জর গিফারীর নামে কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন ? এর উত্তর একটাই হযরত আবু জর গিফারী ছিলেন প্রতিবাদী, শোষণহীন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এক নিবেদিতপ্রাণ পুরুষ। তাই দেওয়ান আজরফ, তাঁর নামে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত আবু জর (রা:)- এর মত সাহাবীর অনুপ্রেরণা ও অনুসরণের ফলেই ব্যক্তি জীবনে মোহাম্মদ আজরফও ছিলেন অত্যন্ত সংযমী।

তারুণ্যের মোহ তাঁকে বিপথে পরিচালিত করতে পারেনি। তিনি নিষ্কলঙ্ক চারিত্রিক মাধুর্যের এক অপূর্ব সমাবেশে বেড়ে উঠেছিলেন। তাঁর কথাতেই এর প্রমাণ মিলে। তিনি বলেন:

> আমার অনেক দোষ থাকতে পারে; কিন্তু ঐ দোষ আমাকে স্পর্শ করেনি কখনো। অনেক সুযোগ ছিল, Offer ছিল, কিন্তু আমাকে দুর্বল করতে পারেনি। অন্য জায়গায় তিনি বলেন, আমি কঠোর সংযমী ছিলাম। যৌবনে কখনও বিচলিত হয়নি এবং সেজন্য কোন কিছু হারাইনি। আমি মনে করি, যৌবনের সংযম মানুষকে অলৌকিকের কাছে পৌঁছে দেয়। কিন্তু আমি বোধ হয় লৌকিক অলৌকিক কোন কিছুই স্পর্শ করতে পারিনি।[২৬]

মোহাম্মদ আজরফ উপলব্ধি করেন যে, ধর্মীয় জীবন ছাড়া মানুষ কখনও পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনা। তাঁর মতে, পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে এমনভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে, সমাজের সবাই যেন কোন না কোন ধরনের হতাশায় নিমজ্জিত। অন্ধ ইহজাগতিকতা, স্বার্থসবর্স্ব বস্তুবাদী চিন্তাধারা গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে পক্ষাঘাতগ্রস্থ করে তুলেছে। আদর্শের সংকটে আমারা সকলেই হতাশাগ্রস্ত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় স্বরূপ তিনি ইসলাম ধর্ম তথা আদি যুগের ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার অনুসরণ করা জরুরি বলে মনে করেন।

---

[২৬] সৈয়দ আলী আহসান, 'দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ একজন পরিচ্ছন্ন মানুষ', দৈনিক ইনকিলাব , ১২ নভেম্বর, ১৯৯৯,ঢাকা, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স:)-এর জীবদ্দশা থেকে হযরত উমরের জীবনকাল ও পরবর্তী কিছু সময় পর্যন্ত ইসলামি সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার কতিপয় উদাহরণ দিয়ে ইসলাম ধর্মের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, নবী করিম (স:)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে আরবের সমাজ-জীবনে দেখা দিয়েছিল নানাবিধ পরস্পর বিরোধী লক্ষণ। অপেক্ষাকৃত উন্নত কেন্দ্র মক্কায় ছিল বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা। তাদের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য সম্প্রসারণের তীব্র আকাঙ্খা মরুর বুকে আরব বেদুঈনগণ ছিলো পশুচারী। সেখানে দাস প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। নারীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আরবদের- জীবনে ছিল একটা অত্যন্ত মামুলি বিষয়। মানব- জীবনকে পূর্ণ বিকশিত ও এহেন অবস্থা থেকে মুক্ত করতে হলে এসব প্রতিবন্ধকের সমূল উৎখাত প্রয়োজন; কিন্তু মানষিক বিকারগ্রস্থ আরব- জীবনে তখন তা গ্রহণযোগ্য নয় বলে আল্লাহর রাসূল (সা:) সে প্রথাগুলোর সবক'টিকেই হঠাৎ নির্মূল করেননি। যে প্রথাগুলো সে সমাজে বিষের মতো মারাত্মক ছিল, সে দিকে ইঙ্গিত করে এবং পূর্ণ বিকশিত সমাজ- জীবনে ও রাষ্ট্রে তাদের বিলোপ যে অবশ্যম্ভাবী, সে আশা পোষণ করে তিনি ইন্তেকাল করেন। তবুও মদীনা সনদের মধ্যে ধর্ম ও ব্যক্তিস্বাধীনতার যে বীজ তিনি বপন করেছিলেন, পরবর্তীকালে তারই আলোকে ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

ইসলামি সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের পরিপূর্ণতা পায় হযরত উমর (রা) এর শাসন আমলে। হযরত উমর (রা:) এর লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের সমস্ত মুসলিম অধিবাসীদিগকে রাষ্ট্রের অঙ্গ জ্ঞান করে রাষ্ট্রগত প্রাণ করে তোলা। সেজন্য তিনি তাদের প্রত্যেকের বৃত্তি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যাতে করে তারা জীবিকার সংস্থানের জন্য অন্য কোনো কাজে লিপ্ত না হয়। তাঁর খেলাফতের সময় কোনো অ-মুসলিম, মুসলমান হয়ে গেলে তার সম্পত্তি তার পূর্বতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হত।

এ রাষ্ট্রে যাতে কোন অবস্থায় কোন লোকের হাতে অতিরিক্ত পুঁজি সঞ্চিত না হয় সে জন্য পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: ''এবং যারা সোনা-রূপা সঞ্চয় করে, আল্লাহর পথে (মানবতার কল্যাণের জন্য) ব্যয় করেনা, তাদের নিকট এক কষ্টদায়ক শাস্তি ঘোষণা করে দাও।'' [২৭]

উমাইয়াদের আধিপত্য বিস্তারের সূচনায় এবং সিরিয়াতে আমির মুয়াবিয়া গর্ভণর থাকাকালে এ আয়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করে হযরতের প্রিয় সাহাবী আবুজর গিফারী (রা:) এক বিপ্লবের সূচনা করেন। তাঁর সুদৃঢ় অভিমত ছিল 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন বিত্তই কেউ রাখতে পারে না'।

সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনে হাজম জাহেরীর 'মহল্লী'তে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বর্ণনা করেছেন: ''আল্লাহর রাসূল (স:) বলেছেন: যে ব্যক্তির কাছে শক্তি ও সামর্থের সরঞ্জাম নিজ আবশ্যকের অতিরিক্ত রয়েছে, তার উচিত যে, অতিরিক্ত সামান-সরঞ্জাম দুর্বলকে দান করা।'' [২৮]

হযরত রাসূল করিম (স:) এর প্রধান সাহাবী ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হযরত আলী (ক:) বলেছেন : ''আল্লাহ তায়ালা গরিবদের আবশ্যকীয় জীবিকা পরিপূর্ণভাবে সরবরাহ করা ধনীদের উপর ফরজ করেছেন। যদি তারা (গরিবেরা) ভুখা ও নগ্ন থাকে, অথবা জীবিকার জন্য বিপদগ্রস্ত হয়, তাহলে ধনীরা দায়িত্বশীল নয় বলেই বুঝতে হবে। এ জন্যেই আল্লাহ্র কাছে তাদের কিয়ামতের দিন জবাবদিহি হতে হবে এবং সংকীর্ণতার শাস্তি ভোগ করতে হবে।'' [২৯]

---

[২৭] **আল-কুরআন, ৯:৫**

[২৮] দেখুন, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, **ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে,** প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[২৯] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, **জীবন দর্শনের পুনর্গঠন,** চট্টগ্রাম: ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

Dhaka University Institutional Repository

আরও অনেক হাদীস ও কুরআনে দলিলের দ্বারা মুহাদ্দিস ইবনে হাজম এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করে বলেছেন:

> প্রত্যেক মহল্লার ধনীদের উপর গরীব- দু:খীদের জীবিকার জন্য জামিন হওয়া ফরজ (আবশ্য কর্তব্য)। যদি বায়তুল-মালের আমদানি ঐ গরীবদের জীবিকা সরবরাহের জন্য যথেষ্ট না হয়, তা'হলে সুলতান বা আমির ধনীদেরকে এ কাজের জন্য বাধ্য করতে পারেন। অর্থাৎ তাদের মাল বলপূর্বক গরিবদের প্রয়োজনে খরচ করতে পারেন। তাদের জীবিকার সংস্থানের জন্য কমপক্ষে অত্যাবশ্যক হচ্ছে প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষুধায় অন্ন, পরিধানের বস্ত্র এবং ঝড়, বৃষ্টি, গরম ও প্লাবন থেকে রক্ষা করতে পারে এমন বাসগৃহ। [৩০]

দেওয়ান আজরফের মতে, ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধানগুলো মানুষের মধ্যে শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে । বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে তার মধ্যে ইসলাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ সম্পর্কে নিম্নে বিভিন্ন ধর্মীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মতামত পেশ করা হলো।

মিষ্টার জিব তাঁর 'Whither Islam' নামক পুস্তকে মন্তব্য করেছেন, '' ইসলামের মধ্যে এখনও আপাতত: পরস্পর বিরোধী জাতিও ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধনের শক্তি রয়েছে। যদি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রধান সমাজগুলোর বিরোধিতার স্থলে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, তাহলে ইসলামের মধ্যবর্তিতা অনিবার্য কারণ হয়ে দেখা দেবে।''[৩১]

---

[৩০] ঐ, পৃ.৪০
[৩১] ঐ, পৃ.৪০

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপন সম্পর্কে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান তাঁর 'East and West in Religion' গ্রন্থে বলেছেন: ''আমরা একথা অস্বীকার করতে পারিনে যে, ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধের যে ধারণা রয়েছে তাতে জাতি ও জাতীয়তার সকল প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য কোন ধর্মে এ গুণটি নেই। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত বিভিন্ন জাতি ও ভৌগলিক পরিবেশে গঠিত জাতীয়তার সংকীর্ণ পরিসর থেকে ইসলামের মাধ্যমেই মানুষ ভ্রাতৃত্ববোধের একতা সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে।'' [৩২]

অধ্যাপক Snouck Hurgrowje তাঁর 'The Moslem World of Today' পুস্তকে বলেছেন: ''মানব জাতির জন্য একটি আদর্শ লীগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইসলামই অন্যান্য ধর্মের চেয়ে অধিকতর অগ্রসর হয়েছে।

কেননা মোহাম্মদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত মানব জাতির লীগের মৌলিক নীতি হচ্ছে দুনিয়ার সকল মানুষের ঐক্যের নীতির স্বীকৃতি, এ নীতি এক্ষেত্রে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তাতে লজ্জিত হয়।'' [৩৩]

উপরের চিন্তাবিদদের সাথে একমত পোষণ করে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন ঃ

> ইসলাম তার সূচনা থেকেই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনকে গ্রহণ করে মুসলিমদের জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছিলো। মুসলিমেরা ভুল করেছে সত্যি, অপরাপর জাতির মত ভ্রান্তি ও সংশোধনের মাধ্যমে তারাও সেই একই লক্ষ্যের পানে তাদের অজ্ঞাতসারেই ছুটে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়টির প্রতি মুসলিমেরা এতদিনই উদাসীন ছিল। মরহুম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী এ বিষয়ে অন্যদিক থেকে মুসলিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ।

[৩২] ঐ, পৃ.৪০
[৩৩] ঐ পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

> মানব জীবন সম্বন্ধে বর্তমানকালে যে সব আবিষ্কার হয়েছে - তাতে অদূর ভবিষ্যতে যে জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে তার ভিত্তি ইসলামি জীবন দর্শন হওয়ার খুবই সম্ভবনা রয়েছে। মরহুম মাওলানা উবায়েদ উল্লাহ সিন্ধীও এই মত পোষণ করতেন । কাজেই মুসলিমদের নানা যুগের ভুল ভ্রান্তি এবং তৎকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা পোষণ করার সঙ্গত কারণ রয়েছে।[৩৪]

প্রকৃত ধর্মীয় আদর্শ গ্রহণ করলে মানুষ সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ থেকে মুক্ত হয়ে সমস্ত বিশ্বজুড়ে একরাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হবে। এ প্রসংগে দেওয়ান আজরফ বলেনঃ

> ধর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের সামগ্রিক জীবনের সন্তোষ বিধান করা। এ সন্তোষ বিধানের ব্যাপারে কোনো ধর্মই মানুষ থেকে মানুষের পার্থক্য স্বীকার করে নেয়নি। কাজেই ধর্মের শাসন বা অনুশাসনের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তাকে ধর্মের সার বলে ভুল না করে বরং ধর্ম যে মানবতাবোধ জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সে দিকেই গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। এভাবে আদর্শ গ্রহণ করার ফলে সংকীর্ণ জাতীয়তা থেকে মানুষ মুক্ত হয়ে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে এক রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হবে। সজ্ঞান মানুষের চরিত্রের বিকাশে এ মনোভাব দ্বারাই পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।[৩৫]

উপরের আলোচনা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, বিশ্বনবী (স:) এবং সাহাবীরা তদানিন্তন আরবের অধ:পতিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে প্রকৃত ইসলামের আলোকে একটি সুন্দর ও শান্তিময় সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরাও যদি ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণভাবে মনে প্রাণে গ্রহণ করি এবং জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করি তাহলে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হবে, সমাজ ও রাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে মারামারি

---

[৩৪] মোহাম্মদ আজরফ, 'ইসলাম ও মুসলিম, মাসিক মোহাম্মাদী, বর্ষ; ৩৩, ১১ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬৯, ঢাকা, পৃ. ৯১
[৩৫] দেওয়ান আজরফ, মাহে নও, ১ম বর্ষ: ১২ সংখ্যা চৈত্র ১৭৪, প্রকাশকাল ১৯৬৮, ঢাকা, পৃ. ৮৮

হানাহানি দু:খ কষ্ট থাকবে না বরং একজন অন্য জনের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকবে এ রকম একটা সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য ধর্মের অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে। দার্শনিক আজরফ ইসলাম ধর্মকে মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন, কারণ তাঁর ধারণা এই ধর্মীয় আদর্শের বলয় থেকেই মানুষ সত্যিকার জীবন বোধের সন্ধান পাবে।

বর্তমান যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে ধর্মীয় জিন্দেগী সম্পর্কে দিনে দিনে আমাদের মধ্যে অনীহা দেখা যাচ্ছে। কারণ আমরা আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছি । তাই মানব জীবন সম্পর্কে অনেকের উদাসীনতার কারণে মোহাম্মদ আজরফ এ ধারণা পোষণ করেন যে, মানব জীবনে জ্ঞান বিজ্ঞানের যতই উন্নতি দেখা দিচ্ছে ততই একটি মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে আমরা যেন ক্রমেই অনবহিত থেকে যাচ্ছি। জীবন যে এক এবং অখন্ড সে বিষয়টি আমরা যেন ক্রমেই ভুলে যাচ্ছি। এজন্য আমাদের জীবনের অগ্রগতি বা পশ্চাৎপদতার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সব কিছুর যে পরিবর্তন হচেছ সে সম্পর্কে আমরা উদাসীন থেকে যাচ্ছি।

সুতরাং উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের চিন্তায় মানব জীবনে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ (ইনসানে কামেল) হতে হলে পরিপূর্ণ ধর্মীয় জিন্দেগী অবশ্যই পালন করতে হবে। তাছাড়া আমাদের সন্তানদেরও ছোট সময় থেকে অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হবে।

ধর্ম শিক্ষা না দিলে তাদের জীবন অপূর্ণ রয়ে যাবে। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে অনেকেই মনে করেন, ধর্মের কোন দরকার নেই। এজন্য ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি তাদের অনীহা। কিন্তু দেওয়ান আজরফের মতে, বিজ্ঞানমুখী শিক্ষার পাশাপাশি আমাদের ধর্মীয় শিক্ষাও গ্রহণ করতে হবে; কারণ বৈজ্ঞানিকভাবে উন্নত অনেক দেশেও দেখা যায় যে, সেখানকার মানুষ অনেক সময়

Dhaka University Institutional Repository

মানবীয় গুণাবলি হারিয়ে ফেলে, আত্ম হত্যার মত পথ পর্যন্ত বেছে নেয়। আল্লাহ মানুষকে প্রবৃত্তি নামক একটা জিনিস দান করেছেন, এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে অবশ্যই ধর্মীয় জীবন যাপন করতে হবে। তাই বলা যায় যে, আধুনিকতা বা বিজ্ঞানকে আমরা গ্রহণ করব কিন্তু সেটা অবশ্যই ধর্মের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমেদ; এটা হলেই আমাদের জীবনের পরিপূর্ণতা আসবে।

সমালোচনা: দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হিসেবে জীবন-যাপন করেছেন। তাঁর জীবন-যাপন পদ্ধতি দেখে অনেকে তাঁকে মৌলবাদী হিসেবে ধারণা করেছেন। তাঁরা ঢাকা বিশ্ববদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার সময় তাঁর বিরোধিতা পর্যন্ত করেছেন; শেষ পর্যন্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হস্তক্ষেপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে চাকরিতে যোগদানের সুযোগ দেন। বঙ্গবন্ধুর হস্তক্ষেপের কারণ হলো ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে দাঙ্গাদমন এবং ভাষা-আন্দোলনের সময় তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে একসাথে কাজ করেছেন। ভাষা-আন্দোলনে শরীক হওয়ার কারণে দেওয়ান আজরফকে অধ্যক্ষ পদ থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়। যাঁরা দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন তাঁদের জানা উচিত মোহাম্মদ আজরফ প্রথম জীবনে কমিউনিস্ট রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন এবং তাঁর নানা ছিলেন বিশিষ্ট সূফী হাছন রাজা। তাই তাঁর ভিতরে কমিউনিস্টের সাম্যবাদী চিন্তাভাবনা এবং সুফী আদর্শ মানবতাবাদ কাজ করত। তিনি জমিদারের নাতি ও জমিদারের সন্তান এবং নিজে জমিদার হওয়ার পরও নানকারদের পক্ষাবলম্বন করে জমিদারদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মধ্যে মানবতাবাদী বোধ জাগ্রত হবার ফলে নিজের জায়গার নিজের টাকা দিয়ে তিনি নানকারদের জন্য ঘর-বাড়ি তুলে দিয়েছেন এবং এক একজন নানকারদের এক কোয়া (এক বিঘা) বা দুই কোয়া করে জমি দান করেছেন। উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ একজন সাম্যবাদী ও অসম্প্রদায়িক মুসলমান ছিলেন; তিনি ধর্মের ব্যাপারে কারোও উপর জোর-জবরদস্তি করা পছন্দ করতেন না।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের চিন্তাধারার সামগ্রিক বিচার মূল্যায়ন ও প্রভাব নির্ণয়:

শতাব্দীর সাক্ষী দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন জমিদার পরিবারের সদস্য। তাঁর বাবা এবং নানা উভয়ই ছিলেন জমিদার। তিনি নিজেও ছিলেন বংশানুক্রমিকভাবে জমিদার। কিন্তু জমিদারী জীবন তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তিনি অতি অল্প বয়স থেকেই মানুষের দু:খ-দুর্দশা খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাঁর নানা ও বাবার প্রজারা বিভিন্ন সময়ে খাজনা দিতে না পারলে বা অন্যান্য সমস্যা জানাতে আসলে তিনি তাদের দু:খ-কষ্ট অভাব-অনটন এর কথা শুনেছেন এবং হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। কখনও কখনও তাদের (প্রজাদের) পক্ষে সুপারিশ করেছেন।

ছাত্র জীবনেই পড়াশোনার পাশাপাশি মানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে দেওয়ান আজরফ চিন্তা ভাবনা করতেন। পরে শিক্ষা জীবন শেষে কর্ম জীবনে এসে মানুষের এসব সমস্যা নিয়ে অনেক লেখালেখি করেন। কিছুদিন পর দেখলেন এসব লেখালেখি এবং বক্তব্য বিবৃতি দিয়ে তেমন কোন লাভ হচ্ছে না । এর ফলশ্রুতিতে তিনি রাজনীতির প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি শুরু করেন। তিনি নানকারদের আন্দোলন, বঙ্গাল খেদা আন্দোলন থেকে শুরু করে আমাদের ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত সকল আন্দোলনেই স্বশরীরে আবার কখনও কখনও লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে জনমত সংগঠন করেছেন। এসব কিছু করতে গিয়ে তিনি জেল খেটেছেন, অনেক জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন এবং তাঁর চাকুরীও হারাতে হয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরও তিনি মানুষের কথা ভেবেছেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানুষের কল্যাণ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন অর্থাৎ মানব কল্যাণই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তাঁর চিন্তাভাবনায় হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ বা মুসলমানকে আলাদাভাবে না দেখে মানুষ হিসেবে দেখার চেষ্টা করেছেন। তাই এ ধরাধামে মানুষ কিভাবে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে তিনি তার দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তাঁর দর্শন চিন্তা ছিল জীবন ঘনিষ্ঠ। তাঁর মতে, যে দর্শন মানুষের জীবনে কোন কাজে আসবে না সে দর্শন পড়ে কোন লাভ নেই। তাই তাঁর দর্শন চিন্তার মধ্যে আমরা জীবনমুখী ও সমন্বয়ী চিন্তাধারা দেখতে পাই। তাছাড়া অনেকের ধারণা খাঁটি মুসলমান হয়ে অর্থাৎ ধর্মীয় জিন্দেগী যাপন করে দার্শনিক হওয়া যায় না। তিনি ইসলামকে তাঁর জীবনে বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে প্রকৃত ইসলামকে ধারণ করেও দার্শনিক হওয়া যায়।

এছাড়া রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করলে দেশের মানুষের শোষণ-পীড়ন বন্ধ হবে, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের দু:খ-দুর্দশা দূরীভূত হয়ে মানুষের জীবনে শান্তি সমৃদ্ধি আসতে পারে তার জন্য তিনি দিক নির্দেশনা স্বরূপ ইসলামি গণতন্ত্রের কথা বলেছেন । সে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অর্থনীতি কী রকম হবে অর্থাৎ অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অবলম্বনে দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসবে, মানুষ অর্থনৈতিক ভাবে সফলতা অর্জন করবে, শোষণ ও দুর্নীতি মুক্ত জীবন যাপন করতে পারবে, সেদিকেও তিনি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

দেওয়ান আজরফ মনে করেন ধর্ম মানব প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত । মানুষের জন্যই ধর্ম, অন্যান্য প্রাণীর জন্য ধর্মের প্রয়োজন নেই। কারণ অন্য প্রাণীদের জীবনের কোন হিসেব দিতে হবে না । তাই দেওয়ান আজরফ মানুষের জীবন এবং অন্যান্য প্রাণীর জীবনের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী ধর্ম সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন।

দেওয়ান আজরফের চিন্তা-ভাবনা বা দর্শনকে আমার গবেষণায় ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। প্রথম অধ্যায়-দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জীবন, শিক্ষা, পরিবেশ ও চিন্তাধারার

প্রাথমিক স্তরের পরিচয়। দ্বিতীয় অধ্যায়- তাঁর দর্শন ভাবনা ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা। তৃতীয় অধ্যায়- তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। চতুর্থ অধ্যায়- তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তার ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। পঞ্চম অধ্যায়- তাঁর ধর্মীয় চিন্তাধারার ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। ষষ্ঠ অধ্যায়- তাঁর চিন্তাধারার সামগ্রিক বিচার মূল্যায়ন ও প্রভাব নির্ণয়।

আমার আলোচনার প্রথম অধ্যায়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জীবন, শিক্ষা, পরিবেশ ও চিন্তাধারার প্রাথমিক স্তরের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এ অধ্যায়ে তাঁর জন্ম, শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন এবং জীবনের অন্যান্য দিক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ জমিদারের ঘরে সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর জীবনে এর কোন কোন প্রভাব বিস্তার করেনি বরং তিনি সাধারণ মানুষের কাতারে দাঁড়িয়ে তাদের সাথে মেলামেশা করে তাদের খুব নিকট থেকে জীবনকে দেখেছেন। সাধারণ মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলন করেছেন। মানুষ যেন তাদের অধিকারকে পেতে পারে, এজন্য তিনি পূর্বে উল্লেখিত নানকার আন্দোলন, বঙ্গাল খেদা আন্দোলন ও সর্বশেষ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত সংগঠিত করার চেষ্টা করেছেন এবং এসব কিছু করতে গিয়ে তিনি জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন ও জেল পর্যন্ত খেটেছেন এবং চাকুরীচ্যুত হয়েছেন।

অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের দর্শন ভাবনা বাখ্যা ও পর্যালোচনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দার্শনিকদের দর্শন আলোচনা পর্যালোচনার পর নিজস্ব মতবাদ অর্থাৎ তাঁর নিজের দর্শন ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা করেছেন।

আজরফের মতে, মানুষ বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সাধারণ প্রাণীদের মত সে কেবল নিজের অস্তিত্ব রক্ষা ও বংশ বিস্তার করেই ক্ষান্ত হয় না। সে স্থায়িত্ব লাভ করতে চায় কিন্তু এটা সম্ভব নয় দেখে তার মধ্যে অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে। মানুষের মধ্যে ইচ্ছা ও কর্মশক্তি ছাড়াও রয়েছে চিন্তা শক্তি। এ চিন্তা শক্তির মাধ্যমে সে জীবনের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝতে চায়। তার এ প্রয়াস থেকেই দর্শনের উৎপত্তি।

অনেকে মনে করেন দর্শনের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিলো প্রাচীন গ্রীসে। এ সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে, যেহেতু দর্শন মানব জীবনমুখী ও জগৎকেন্দ্রিক, তাই মানব জীবনের প্রয়োজন ও জগৎ জিজ্ঞাসা থেকেই দর্শনের উৎপত্তি। সুতরাং আমাদের এ অঞ্চলেও স্বাভাবিকভাবেই দর্শনের উদ্ভব ঘটেছিলো। আমাদের এ অঞ্চলের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও বিভিন্ন মত, পথ, ও ধর্মের চিন্তাশীল মানুষেরা তাঁদের স্বীয় লেখায় জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। এভাবেই আমাদের এ উপমহাদেশে দার্শনিক সৌধ গড়ে উঠেছে।

আজরফ মনে করেন, জীবন জিজ্ঞাসা ও মানবজীবনের মৌলসমস্যা সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন আদিতে উত্থাপিত হয়েছিলো সে সব প্রশ্নের সমাধানের জন্য এদেশীয় চিন্তাবিদ বা মুনি-ঋষিগণ যে সাধনা করেছেন, তাঁর ফলে তাঁদের জীবনে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, সে সবের সমন্বয়ে আমাদের দর্শন গড়ে উঠেছে। তবে সাধারণভাবে ধারণা করা হয় মানব ইতিহাসের যাত্রা যে দিন শুরু হয়েছিলো সে দিন থেকেই দার্শনিক চিন্তারও উদ্ভব হয়েছিলো।

তাইতো গ্রীক দর্শন থেকে শুরু করে প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের মধ্যযুগের দর্শন তথা মুসলিম দর্শন, ভারতীয় দর্শন, চৈনিক দর্শন, জাপানি দর্শন, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন, ফরাসি দর্শন, জার্মান দর্শন, আমেরিকান দর্শন, নব্য-বাস্তববাদী দর্শন, প্রয়োজনবাদী দর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন

ধরনের দর্শনের বিকাশ হয়েছে। এজন্য বলা হয় দর্শন কোন বিশেষ দেশ ও জাতির একক সম্পত্তি নয়। বস্তুত দার্শনিক চিন্তা সার্বজনীন ও মানব জাতির অখন্ড ও অভিন্ন উত্তরাধিকার।

অধ্যক্ষ আজরফের মতে, জগতের পরিবর্তনের সাথে সাথে দার্শনিক চিন্তাধারারও পরিবর্তন হচ্ছে। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে সমকালীন দার্শনিক চিন্তাধারার দিকে দৃষ্টি দিলে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। বর্তমান সময়ে দার্শনিকেরা কেবল বিশুদ্ধ তত্ত্বালোচনার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেননি, তাঁরা এখন ক্রমাগত নিজেদের মনোযোগ নিয়োজিত করেছেন মানুষের ব্যবহারিক জীবনের দিকে, প্রকৃতি ও পরিবেঁশের প্রতি, এ কারণে এখন দর্শন ও নীতিবিদ্যার অনেক প্রায়োগিক শাখার উদ্ভব ও বিকাশ হচ্ছে। এদিক বিবেচনা করলে বলতে হয়, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ অনেক পূর্বেই দর্শনের এ ব্যবহারিক প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন। তাঁর দর্শন কেবল তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তা ছিল একান্তই জীবনকেন্দ্রিক। তাই তাঁকে ঢালাও ভাবে ভাববাদী দার্শনিক বলা যায় না। বস্তুত তিনি ছিলেন একজন সমন্বয়বাদী দার্শনিক।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ধারণা সুদূর অতীতকাল থেকে সব দেশের চিন্তাশীল মানুষেরা জগৎ ও জীবনের মৌলিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেছেন। আমাদের দেশ্সহ ভারতবর্ষের চিন্তাশীল মানুষেরা জগৎ ও জীবনের রহস্য সম্বন্ধে ভেবেছেন এবং এসব রহস্য বা সমস্যার গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন। এ প্রয়াসে তাঁরা তাঁদের মনন শক্তি ও অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পেয়েছেন। আজরফের মতে, তাই দর্শনের সমস্যা কেবল আধিবিদ্যক নয়, জ্ঞানতাত্ত্বিকও বটে। অধিকন্তু তাঁর মতে দর্শন যেহেতু জীবন থেকেই উদ্ভূত ও জীবনের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত, তাই দর্শন জীবন বর্জিত হতে পারে না বরং দর্শনকে হতে হবে বাস্তবমুখী ও জীবন ঘনিষ্ঠ। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ খন্ডিত বা আংশিক দার্শনিক আলোচনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল একটি পরিপূর্ণ দর্শন পাওয়ার। তাই

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মনে করেন, এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান এবং বুদ্ধিজাত জ্ঞান দিয়ে পূর্ণাঙ্গ দর্শন পাওয়া যাবে না। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির পাশাপাশি আমাদেরকে বোধি বা স্বজ্ঞাপ্রসূত জ্ঞানকে স্থান দিতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, আজরফের মতে কেবল জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানচর্চা অথবা শুধু তত্ত্বালোচনাই দর্শনের সামগ্রিক রূপ নয়। তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের সংযোগেই তৈরী হয় দর্শনের পূর্ণ অবয়ব। এজন্যে মানব সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই দর্শন চর্চার অন্যতম লক্ষ্য। তিনি এ লক্ষ্য অর্জনে ছিলেন উদার ও অন্যের সাথে একসঙ্গে চলার পক্ষপাতি। এ লক্ষেই দেওয়ান আজরফ তাঁর সমগ্র চিন্তা ও কর্মশক্তিকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিয়োজিত রেখেছিলেন।

আমার অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের রাজনৈতিক ভাবনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ একজন বড় মাপের জীবন ঘনিষ্ঠ দার্শনিক, উঁচুস্তরের সূফীসাধক বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও একজন গণমুখী রাজনীতিক ছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ছিল সংগ্রাম ও কর্মমুখর। জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে তিনি সব মানুষের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য চিন্তা ভাবনা করতেন। প্রথম জীবনে তিনি ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, গ্রন্থ সমালোচনা, গল্প, উপন্যাস, কৌতুক, নাটক আত্ম-জীবনীমূলক রচনা এবং রাজনৈতিক বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি করেন। মানুষকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করার জন্য শিক্ষকতা শুরু করেন। তাছাড়া বিভিন্ন সভা সেমিনারে মানুষের কর্তব্য ও অধিকার নিয়ে বক্তৃতা করতেন। তিনি দেখলেন যে, এসব বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে কাজ হচ্ছে না। সে সময়ের ইংরেজ শাসকরা ভারত বর্ষের মানুষের উপর বিভিন্নভাবে শোষণ-নির্যাতন চালাচ্ছিল। তাই তিনি তাঁর চিন্তা ভাবনা বক্তৃতা

Dhaka University Institutional Repository

বিবৃতিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সক্রিয়ভাবে ১৯৪১ সালের রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯৪২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যকরী পরিষদের সদস্য এবং মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসাম আইন সভার উচ্চ পরিষদের সম্মানিত সদস্য (MLC) নির্বাচিত হন। সে সময়ে আসামে বাঙালিদের উপর নির্যাতন তথা 'বঙাল খেদা' আন্দোলন শুরু করলে দেওয়ান আজরফ মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর (১৮৮০-১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ) সাথে বাঙালীদের পক্ষে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। সেই সময়ে তিনি মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান আব্দুল বাসেতকে সাথে নিয়ে আসামের বিভিন্ন এলাকায় আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং সরকার কর্তৃক ১৪৪ ধারা জাড়ি হলে সেটা ভঙ্গ করে আন্দোলন করতে থাকেন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে সেই সময়ের রাইফেলস বাহিনী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে তিনি আল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান এবং পরবর্তীতে 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অপরাধে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ আসামের শিলচরে ১ মাস ৬ দিন কারাভোগ করেন।

পঞ্চাশের দশকে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সিলেটে ভাষা আন্দোলন সংগঠিত করেছেন এবং নেতৃত্বও দিয়েছেন। এজন্য তাঁকে শিক্ষকতার পদ থেকে অপসারিত হতে হয়। এছাড়া স্বদেশী আন্দোলন তথা স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৯৭১-এ তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন । তাঁর দুই ছেলে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তাই সংক্ষেপে বলতে গেলে, নানকার আন্দোলন থেকে শুরু করে আসামের 'লাইন প্রথা' ও 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, সাত চল্লিশের গণভোট, বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের গণসংগ্রাম এবং একাত্তরের মুক্তি সংগ্রাম এই সব ঐতিহাসিক আন্দোলনগুলোতে তিনি সর্বদা অংশ গ্রহণ করে নিজেকে একজন প্রকৃত দেশ প্রেমিক হিসেবে প্রমাণ করেছেন।

উপরিউক্ত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সরাসরি বা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহনের ফলে দেওয়ান আজরফ জীবনে অনেকগুলো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। যেমন- চাকুরিচ্যুতি, জেল-জুলুম, অভাব অনটনসহ, প্রশাসনিক রোষানলে পড়া উত্যাদি। কিন্তু এত কিছুর পরও তিনি তাঁর আদর্শ থেকে পিছপা হননি। তিনি ছিলেন একজন গণমুখী ও সাম্যবাদী রাজনীতিবিদ। রাজনীতিকে তিনি কখনও ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেন নি। অধিকার বঞ্চিত, দুর্দশাগ্রস্থ এবং বিপন্ন মানুষের সেবা করাই ছিল তাঁর রাজনীতির আসল উদ্দেশ্য।

একজন আদর্শবান রাজনীতিবিদ হিসেবে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সাধারণ মানুষের দু:খ-দুর্দশা ও অশান্তি ইত্যাদি অবলোকন করে মনে মনে হতাশ হন এবং উপলব্ধি করেন যে, এ অবস্থায় প্রকৃত গণতন্ত্র বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাঁর মতে, গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির যদি বিকাশ ঘটাতে হয়, তাহলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বা চেতনা দরকার। এর জন্য আরও দরকার উচ্চতর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বা নৈতিকতা। যেমন– প্রেম, দয়া, মায়া প্রভৃতি। এগুলো যদি না থাকে তাহলে এক ব্যক্তির সাথে অপর ব্যক্তির, এক দেশ অন্য দেশের সাথে হিংসা, বিদ্বেষ ও যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিবে। তাই রাষ্ট্র আর স্বাধীনভাবে টিকে থাকতে পারবে না।

তিনি লক্ষ করেন, বর্তমান বিশ্বের মানুষ রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতির ক্ষেত্রে আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা একান্ত জরুরী। এ সম্পর্কে জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিবর্গ সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেন। তবে কোন দেশের মানুষের জীবনে যদি চিন্তা, ধর্ম, কর্ম এবং মতবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকে এবং যদি দেশের মধ্যে একশ্রেণি অপরশ্রেণি দ্বারা শোষিত হয়, তাহলে সে দেশের স্বাধীনতা টিকে থাকতে পারে না। কালক্রমে সে দেশের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত

হবেই। ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটি আমাদের নিকট স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

এজন্য আজরফ মনে করেন, আমাদের দেশে প্রকৃত গণতন্ত্রের চর্চা হওয়া দরকার এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এর মূল্যবোধের প্রতি মানুষের আস্থা ও শ্রদ্ধা থাকা উচিত। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায়ও সে মূল্যবোধগুলির প্রতি দিক নির্দেশনা ও সেগুলিকে বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এজন্য তিনি সব ধরনের শোষণ, বঞ্চনা ও প্রতারণার উর্দ্ধে উঠে চিন্তা করেছেন ও নিজের সুদীর্ঘ জীবনে মানবীয় গুণাবলী প্রতিফলনের চেষ্টা করেছেন। স্বজাতি, স্বদেশ ও নিজ সমাজের উন্নয়নে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। এজন্য সব মানুষের কল্যাণ-কামনার পাশাপাশি তিনি নিজ দেশের শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের কল্যাণ কামনা ও সম্পদের সুষম বন্টনের কথা চিন্তা করে নতুনভাবে রাজনৈতিক শাসন পদ্ধতিকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা করেছেন।

দেওয়ান আজরফ তাঁর রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মতাদর্শ এবং বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি বিচার-বিশ্লেষণ করে তাঁর মতামত পেশ করেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল-রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এমন একটি পদ্ধতি বেছে নেওয়া, যার মাধ্যমে মানুষ সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি সহকারে জীবন যাপন করতে পারে। তাই দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর 'জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম' নামক বই -এ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক পদ্ধতি বা দর্শন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়নি, যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সামাজিক চুক্তিবাদ, ধনতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদ (মার্কস্‌বাদ), লিও টলস্টয় এর নব্য খ্রিষ্টানবাদ, গান্ধীবাদ ও আধুনিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ইত্যাদি মতবাদগুলো পর্যালোচনা করে,

Dhaka University Institutional Repository

এসব মতবাদগুলোর সুবিধা-অসুবিধা তুলে ধরার পর তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, এসব মতবাদের মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এসব প্রত্যেকটি মতবাদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেমন অসুবিধা আবার বাস্তবায়নের কিছুদিন পরই মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়; ফলে মারামারি, হানাহানি শুরু হয় অর্থাৎ রাষ্ট্রের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাই অল্প কিছুদিন পরই প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি ভেঙ্গে পড়ে।

দেওয়ান আজরফ মনে করেন, আলোচ্য রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতির বিশৃঙ্খল অবস্থার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রধান ব্যবস্থা পত্র (প্রেসক্রিপশন) হচ্ছে ইসলামিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় যদি ইসলামি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে মানুষ সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি সহকারে জীবন ধারণ করতে পারবে। তাঁর মতে, রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বাস্তব রূপ দিতে হলে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজ জীবন আগে ভালভাবে গঠন করার জন্য ব্যক্তিকে প্রথমেই ঈমানের পাশাপাশি সালাত, সিয়াম, হজ্জ, কুরবানী ও যাকাত এবং প্রয়োজন বোধে দেশের জন্য যুদ্ধ করতে হবে। এখানে ঈমানের মাধ্যমে ব্যক্তির জীবনে এই বিশ্বাস পুরোপুরি আসে যে দুনিয়ার সব কিছুর মালিক আল্লাহ। মানুষ হচ্ছে আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ তাঁর দেওয়া সমস্ত কিছু শুধুমাত্র ভোগ করবে কিন্তু এর মালিকানা দাবী করতে পারবে না।

আর সালাতের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এক দিকে জীবনকে নানা ধরনের রিপু বা প্রবৃত্তি যথা- লোভ-লালসা ইত্যাদি অসৎ প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গুণাবলী এ জগতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কাজ করা। সিয়াম (সওম) বা রোজা এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে নিবৃত্তি। পাশবিক শক্তির প্রাবল্য তথা উহার উত্তেজনা অর্থাৎ জৈবিক আসক্তির থেকে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে কুপ্রবৃত্তি ও পানাহার। কাজেই রোজার সূক্ষ্মতম তাৎপর্য

হচ্ছে কু প্রবৃত্তিকে পরাভূত করে পাশবিক শক্তিকে আয়ত্ত করা। তাছাড়া মানুষ যখন পানাহার থেকে নিবৃত্ত থাকে তখন সে অন্যের ক্ষুধার যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ভুখা-নাঙ্গা মানুষের প্রতি তার অন্তর আকৃষ্ট হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে 'সওমের' অনুশীলনেরত মানুষ সর্বাবস্থায় বুঝতে পারে, তার অধিকারে ধন-দৌলত থাকলেও সেগুলো যথেচ্ছা ভোগ করার অধিকার তার নেই। তাকে ভোগ করতে হবে এ জগতের মালিক (সার্বভৌম শক্তির) এর নির্দেশ মতো। হজ্জের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, হজ্জের মধ্যে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে। এখানে দেওয়ান আজরফের ধারণা নিশ্চয়ই হজ্জের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। হজ্জব্রত পালন উপলক্ষে দেশ-বিদেশ থেকে নানান ভাষার লোকেরা এসে একত্রিত হয় এবং তাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়। এক দেশের লোকের সঙ্গে অপর দেশের লোকের পরিচয় ঘটে এবং তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠে। হজ্জের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর তাওহীদের প্রতিষ্ঠা। তাওহীদের সার্থকতা হচ্ছে মানুষের সাথে মানুষের ভেদাভেদের বিলোপ সাধন। একই আল্লাহর বান্দা হিসেবে দুনিয়ার সব মানুষই সমান।

আর কুরবানীর মাধ্যমেও দু'টো যোগ্যতা মানুষের মধ্যে আসে,

(১) আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্য;

(২) ত্যাগ স্বীকার;

কুরবানীর মূল তাৎপর্য কুরআনের মধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে " কুরবানী পশুর গোশত অথবা উহাদের রক্ত অল্লাহর নিকট উপনীত হয় না বরং তোমাদের সংযমই উপনীত হয়ে থাকে।" কাজেই আজরফের মতে, কুরবানী শুধু পশু হত্যার নিষ্ঠুরতম অনুষ্ঠান নয়; বরং ইহাতে প্রিয় পশুকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করাতে যে দৃঢ়চিত্ততা, কর্তব্যবোধ ও সংযম বা ত্যাগ স্বীকারের অনুশীলন করা হয়, সেটিই মূল লক্ষ্য।

যাকাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্বত:প্রনোদিত হয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ বা অন্য কোন সম্পদ আত্মার কল্যাণের জন্য দান করা। কুরআন-করীমের নির্দেশ ও আল্লাহর রাসূলের ব্যাখ্যা-

সোনা-রূপা বা টাকা পয়সা যাদের কাছে সঞ্চিত থাকবে তাদের পক্ষে শতকরা আড়াই ভাগ রূহের বিশুদ্ধির জন্য দিতে হবে। অবশ্য আজরফের মতে, কোন অবস্থায়ই দানকে ইনকাম ট্যাক্স্ বলে গণ্য করা যাবে না। এ ট্যাক্স্ হচ্ছে রূহের বা আত্মার বিশুদ্ধির জন্য।

জিহাদের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম বা অবিরাম চেষ্টা বা নিরন্তর সাধন। তবে সাধারণত জিহাদ বলতে ইসলামকে এ বিশ্বে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামকে বুঝায়। তবে ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানবজীবনকে সুন্দর-সরল ও কল্যাণময় পথে পরিচালনার জন্য যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, অবিরাম সংগ্রাম করে সে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করাই হচ্ছে জিহাদের মূল লক্ষ্য। যথাঃ-

(ক) প্রতিকুল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম;

(খ) দৈহিক নিরাপত্তার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম;

(গ) সামাজিক বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম;

(ঘ) মানবজীবনের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং

(ঙ) স্বীয় নফস্ ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

সুতরাং জিহাদ বলতে শুধু এক দেশের বা জাতির বিরুদ্ধে অন্য দেশের বা জাতির যুদ্ধকে বুঝায় না বরং উপরের আলোচ্য বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আদর্শ মানুষ হওয়াকেই ব্যাপক অর্থে জিহাদ বলে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত ও জিহাদ প্রভৃতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে - ব্যক্তিগত জীবনের বিশুদ্ধি এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে - ব্যক্তিজীবনকে সংঘবদ্ধ জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী করে তোলা। দেওয়ান আজরফ মনে করেন, উপরের গুণাবলিগুলো (সালাত, রোজা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ) কোন মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত হলে তার ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবন ভালোভাবে গঠিত হবে এবং সে পরিপূর্ণ মানুষ

হিসেবে পরিগণিত হবে। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ যে ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতির কথা বলেছেন সেটি পরিচালনার জন্য উপরের গুণাবলিসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

ইসলামে রাষ্ট্রকে ধারণা করা হয়, মানুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর বিধান ও শাসনকে বাস্তবায়িত করার এক মাধ্যম হিসেবে। কুরআনুল করিম ও হাদীস শরীফে বর্ণিত নীতিগুলিকে রাষ্ট্রের মাধ্যমে রূপায়িত করাতেই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা নিহিত। এজন্য ইসলামি রাষ্ট্রে মানুষকে সম্মান করা হয়, তবে রাষ্ট্রের অধিকারী মানুষের স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে অবদমিত করে রাষ্ট্রকে সমালোচনার উর্দ্ধে কোন প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করা হয় না। একে একটা মধ্যবর্তী ধারণা বলে অভিহিত করা হয়। মানবজীবনকে পূর্ণরূপে বিকশিত করার জন্য কুরআনুল করিমের সে উপায় ও পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য একে মানব জীবন বিকাশের এক মস্তবড় উপায়ও বলা যায়।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মতে, নবী করিম (সা:) এর জীবনে এ সব বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। হুজুর (সা:) এর জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া অর্থাৎ ইনসান-ই-কামিল বা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়া। এই স্তরে উপনীত হলেই মানুষের পক্ষে আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে, তাঁর জগৎকে শাসন করার যোগ্যতা অর্জিত হয়। এই পন্থা অনুসরণের দ্বারাই মানব সমাজে তথা রাষ্ট্রে প্রজা-সাধারণের মধ্যে সমতা বিদ্যমান হবে বলে দেওয়ান আজরফ মনে করেন। মানবজীবনের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তি এর মধ্যে নিহিত বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

মানুষ যদি আল্লাহর হুকুমকে পুরোপুরি মেনে চলে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে এসব মূলনীতির বাস্তবায়ন ঘটায়, তাহলে একটা সুন্দর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানমূলক পরিবেশ বাস্তবায়ন সম্ভব। দেওয়ান আজরফের একান্ত ইচ্ছে ছিল-বিশ্বের সব মানুষকে ইনসানে কামিল বা মর্দ্দে মুমিন এ উন্নীত করা এবং মানুষের মধ্যে সব ধরনের সদগুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে একটি আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

দেওয়ান আজরফের ভাবনায় যে রাষ্ট্রের রূপরেখা ছিল তা গঠিত হবে মদীনা সনদের আদলে। এ সনদকে পৃথিবীর সর্বপ্রথম সুন্দরভাবে লিখিত কোন রাষ্ট্রীয় সংবিধান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মদিনা সনদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে হুজুর (সা:) এর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সংখ্যালঘু ইহুদি ও পৌত্তলিকদের নামই প্রথমে বলা হয়েছে। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সে সময়ে নানাবিধ অত্যাচার ও অনাচারের যুগেও ইসলামি রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হতো। এখানে দলমত, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সবাই তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারতো, কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতো না। দেওয়ান আজরফ যে ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা বলেছেন এখানে নারীর অধিকারও সমুন্নত ছিল। হুজুর (সা:) এ ধরায় আসার আগে সেখানে নারীর কোনই মর্যাদা ছিলনা, মেয়েদের জীবন্ত কবর দেওয়া হতো, এক কথায় নারীদের মর্যাদা ছিলনা। সেখানে হুজুর (সা:) এসে বললেন 'যার প্রথম সন্তান মেয়ে সেই ভাগ্যবান'। অন্যত্র বলা হয়েছে যদি কেউ তিনটি মেয়েকে লালন-পালন করে সৎপাত্রে দান করতে পারে সেই মেয়ের বাবা-মা এবং আল্লাহর রাসূল (সা:) জান্নাতে কাছাকাছি থাকবেন। আরও বলা হয়েছে, মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত। কোন সাহাবী কার হক আগে আদায় করবো জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহর রাসূল তিনবার বললেন মায়ের কথা তারপর বললেন বাবার কথা।

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত আলোচনা থেকেই বুঝা যায় ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নারীর মর্যাদা কত উর্দ্ধে ছিল। মদীনা সনদের আলোকে যে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিলো, সেখানকার খলিফা বা প্রতিনিধি নির্বাচন করা হতো মুসলিমদের সর্ব সম্মতিক্রমে। যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো এবং যিনি রাষ্ট্রের নিয়ম কানুন মেনে চলবেন (যিনি প্রকৃত মুসলমান) তাকেই খলিফা নির্বাচন করা হতো। এখানে কোন অবস্থাতেই অর্থের বিনিময়ে জনসমর্থন আদায়ের কোন রকম সুযোগ ছিল না। কারণ অর্থের বিনিময়ে জনসমর্থন আদায়ের সুযোগ থাকলে নরপিশাচ, চরিত্রহীন, লম্পট ব্যক্তিগুলোর খলিফা (প্রতিনিধি) নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরাজমান ছিল। যে ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য বর্তমান যুগে সর্বত্রই এত হৈ চৈ শোনা যায়, উহা চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই মানুষের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা:) তাঁর লিখিত সংবিধানে জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকেই দান করেছিলেন। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এমন এক রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন, যেখানে অতিরিক্ত পূঁজি সৃষ্টির কোন সুযোগই থাকবে না। তিনি মনে করেন ইসলামি নীতি অনুযায়ী জীবন-যাপন করলে মানুষের হাতে কখনও অতিরিক্ত পূঁজি সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ যাকাত ব্যতীত আরও অনেক ধরনের দান ব্যক্তিকে করতে হয় যেমন- পিতৃ-মাতৃকুলের নিকট আত্মীয়-স্বজন, অনাথ, এতিম ছেলে-মেয়ে, বিত্তহারা ও সহায় সম্বলহীন পথিকের হক রয়েছে ধনীর মালের উপর। কাজেই কোন ধনবান ব্যক্তি যদি তার উপর অর্পিত হকগুলো আদায় করে তাহলে কখনও তার কোন ধন সম্পদ জমা হবে না। ফলে অতিরিক্ত পূঁজি সৃষ্টি হতে পারে না।

দেওয়ান আজরফের মতে, মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা যাতে স্বেচ্ছাচার বা জুলুমে পরিণত না হয়, তার প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেই মুসলিম রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিলো। সেই আদর্শ ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধিকারের দিক দিয়ে আমির ও ফকিরের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।

সেখানে রাষ্ট্রের বায়তুল মাল বা টাকা পয়সা খলিফার কর্তৃতাধীনে থাকলেও ইচ্ছামত ব্যয় করার অধিকার খলিফার ছিল না। রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও খলিফাগণ সাধারণ-জনগণের নিকট জবাবদিহি করেছেন। রাষ্ট্রের ধনাগার থেকে কোন সম্পদ গ্রহণ তো দুরের কথা বরং নিজের বা অর্জিত ব্যক্তিগত সম্পদও তাঁরা জনসাধারণের জন্য ব্যয় করেছেন। অথচ বর্তমানে আমাদের দেশ থেকে শুরু করে পৃথিবীর অনেক নামিদামি দেশের রাষ্ট্রনায়কের দিকে তাকালে তাদের আসল চরিত্র ফুটে উঠে। জনগণের জন্য তাদের নিজের সম্পদ ব্যয় করা তো দূরের কথা তারা জনগণের সম্পদ কুক্ষিগত করে নিজের জন্য বিলাসবহুল গাড়ি-বাড়ি ও অট্টালিকা তৈরী করে অথচ রাষ্ট্রের কিছু নাগরিক ফুটপাতেও মাথা গুজার ঠাঁই পায় না।

ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভূমি ব্যবহার এবং বন্টনের ক্ষেত্রেও কঠোর নিয়মনীতি বাস্তবায়িত হয়। এখানে খলিফা থেকে শুরু করে কেউ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করতে পারবে না অর্থাৎ যে পরিমাণ ভূমি ব্যক্তি চাষাবাদ করতে পারবে এবং যে পরিমাণ জমির ফসল তার প্রয়োজন মিটবে ঐ পরিমাণ ভূমি তার জন্য বরাদ্দ করা হতো এবং বন্টনের ক্ষেত্রেও কোন ব্যক্তি যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করবে সেই তার মালিক হবে। কিন্তু জনগণের মধ্যে অভাব দেখা দিলে বায়তুল মালের দ্বারা যদি সে অভাব মিটানো না যায়, সেক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের খলিফা (সর্বময় কর্মকর্তা) প্রয়োজনে ব্যক্তির ব্যক্তিগত মাল অভাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার জন্য বাধ্য করতে পারবেন।

সুতরাং ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হচ্ছে প্রকৃত জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। যা হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর ইন্তেকালের পর তাঁর সাহাবাগণ প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন। দেওয়ান আজরফ মনে করেন, আবার যদি মানুষের মধ্যে সেই চেতনাবোধ জাগ্রত করা যায় এবং তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে হযরত সাহাবাদের খেলাফতের অনুসরণীয় নীতিগুলো গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যদি ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হয়, তাহলে আবার মানুষের মধ্যে সুখ-শান্তি, সম্প্রীতি ও সাম্য

ফিরে আসবে এবং একে অপরের প্রতি দরদ-ভালোবাসা ও মায়া-মমত্ববোধ জাগ্রত হবে; এমনকি একভাই অপরভাই এর জন্য জীবন বিসর্জন করতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না।

এক রাষ্ট্রের সাথে অপর রাষ্ট্রের সুসম্পর্ক সৃষ্টি হবে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ থাকবে না। ফলে সমস্ত পৃথিবী শান্তিতে ভরে উঠবে। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সারা পৃথিবীতে সেই রকম একটা সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সারাটা জীবন সচেষ্ট ছিলেন।

অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের অর্থনৈতিক চিন্তার ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ণ করা হয়েছে। আজরফ ছিলেন একজন মানবতাবাদী ও সাম্যবাদী দার্শনিক। তাই তিনি মানবতাবাদ ও সাম্যের আলোকেই তাঁর অর্থনৈতিক ধারণা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের রাজনৈতিক মতবাদ হচ্ছে ইসলামিক গণতন্ত্র যা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেই ইসলামি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যে অর্থনৈতিক পদ্ধতি দরকার সেটা হবে ইসলামিক অর্থনীতি। তিনি তাঁর জীবনের প্রায় শত বৎসরের অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে উপলব্ধি করেছেন যে, প্রচলিত অর্থনৈতিক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ হওয়া সুদূর পরাহত। কারণ, এ অর্থনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে গলদ রয়েছে। সে গলদের সুযোগে সহজেই মানুষ মানুষকে শোষণ করতে পারে। কাজেই পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয়ভাবে মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বাস্তবায়ন করতে হলে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দরকার, যার মাধ্যমে মানুষ সমস্ত শোষণ- বঞ্চনা ও প্রতারণার উর্দ্ধে থাকবে। তিনি অর্থনৈতিক পদ্ধতি হিসেবে ইসলামি অর্থনীতির প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। ইসলাম ধর্মে যেমন আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সব মানুষের সমঅধিকারের কথা বলা হয়েছে, তেমনি ইসলামি অর্থনীতিতেও জনসাধারণের কল্যাণের কথা চিন্তা করে এটি গঠিত হয়েছে। এ অর্থনীতির মূল উৎস হচ্ছে যুদ্ধলব্ধ বিত্ত (আল-গণীমাহ্) যাকাত, সদ্‌কা,

জিযিয়া, খিরাজ, আল-ফায়, আল-উশর প্রভৃতির উপর ধার্য কর । এ অর্থনীতিতে কৃষির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে কৃষির ক্ষেত্রে ভূমির ব্যবহার ও উৎপাদন বন্টনের বেশ কিছু নিয়মনীতিও রয়েছে।

ইসলামের যে কোন নিয়মনীতি এবং অর্থনীতির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত হচ্ছে এ বিশ্বাস যে সমস্ত কিছুর মালিক আল্লাহ। ব্যক্তি-মানুষের কোন মালিকানা থাকবে না। সে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে শুধুমাত্র সম্পদ ভোগ দখল করতে পারবে। তাই ইসলামি সমাজে ব্যক্তির পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু জমি দরকার, ততটুকু জমি সে কেবল রক্ষক হিসেবে ভোগ করতে পারবে। অতিরিক্ত জমি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে অথবা গো-চারণভূমি, কবরস্থান এবং জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে ইসলামি অর্থনীতিতে কৃষির উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই কোন অনাবাদী জমি আবাদ করাকে মৃতের জীবন দান করার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কোন আবাদী জমি যাতে পতিত না থাকে ইসলামি অর্থনীতিতে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় এবং কেউ যদি পর পর তিন বৎসর কোন আবাদী জমি পতিত রাখে তাহলে তার নিকট থেকে উক্ত জমি নিয়ে নেওয়া হয়। কারণ, অনুপযুক্ত জমিকে কৃষি কাজের উপযুক্ত করা এবং কাঁচামাল দ্বারা দেশের সমৃদ্ধি আনয়ন করা ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এ অর্থনীতিতে জমি ভোগ দখলের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মনীতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যতখানি পতিত জমি আবাদযোগ্য বা শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করবে, সেই পরিমাণ জমির উপর তার অধিকার বর্তাবে। আর অনাবাদী জমি আবাদযোগ্য করার ক্ষেত্রে যদি অধিক কষ্ট বা ব্যয় সাপেক্ষ হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে দু'তিন বৎসরের খাজনা মওকুফ করা হবে । এখানে উল্লেখ্য যে, শর্তসাপেক্ষে যে কেউ (মুসলিম/অমুসলিম) পতিত জমি আবাদ করলে তাতে ভোগ

Dhaka University Institutional Repository

দখলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে এক্ষেত্রে অধিক ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে যাতে বড় বড় জোতদারি বা জমিদারের সৃষ্টি না হয়, সে ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রেখে ইসলামি রাষ্ট্রে ভূমি বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। এর কারণ হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে যেন অতিরিক্ত পুঁজির সৃষ্টি না হয় এবং সমতা বজায় থাকে।

এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যার জমি তাকেই চাষাবাদ করতে হবে; কোন অবস্থাতেই অন্যকে দিয়ে চাষাবাদ করিয়ে তা থেকে লভ্যাংশ গ্রহণ করা যাবে না। তবে কোন ব্যক্তি যদি অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে জমি চাষ-করতে না পারে অথচ ঐ জমিতে ফসল উৎপাদন না করলে তার জীবন ধারন কষ্টকর হয়, সেই ক্ষেত্রে প্রতিবেশী অথবা আত্মীয় স্বজন বিনা লাভে উক্ত ব্যক্তির জমি-আবাদ করে দিবে। অর্থনীতিতে উৎপাদন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন আলোচ্য বিষয় হলো উৎপাদিত দ্রব্যের মালিক কে হবে? এ সম্পর্কে প্রাচীন মত হলো উৎপাদকই উৎপাদিত দ্রব্যের মালিক। আধুনিক কালের প্রারম্ভে বলা হয়েছে প্রকৃত মালিক উৎপাদক, তবে বন্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। অতি আধুনিক যুগেও বলা হচ্ছে, উৎপাদন ও বন্টন উভয়ই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হলে কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না।

এ সম্পর্কে দেওয়ান আজরফের মত হচ্ছে, উৎপাদিত দ্রব্যের মালিক যদি ব্যক্তি বা রাষ্ট্র হয়, তবে উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কারণ ব্যক্তি যদি স্বার্থপর হয় তাহলে অতিরিক্ত পুঁজির সৃষ্টি হবে, মানুষ শোষিত হবে আবার রাষ্ট্রের শাসনকর্তা যদি ভাল না হয় রাষ্ট্রের মালিকানার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হবে। কিন্তু যদি ব্যক্তির অন্তরে এই বিশ্বাস জাগ্রত হয় যে, এ সম্পদের মালিক সে নয় তার শুধু প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ করার অধিকার রয়েছে, তাহলে শান্তি আসতে পারে; এছাড়া সমাজে শান্তি আসা সম্ভব নয় আর ব্যক্তি যে, সম্পদের মালিক নয় এই বুঝ আসার জন্য ব্যক্তিকে কিছু গুণাবলী অর্জন করতে হবে। তাই ইসলামি রাষ্ট্রে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে উন্নত করার জন্য বিভিন্ন আমল -যেমন সালাত, সিয়াম, হজ্জ,

Dhaka University Institutional Repository

কুরবানী, যাকাত এবং জিহাদের ব্যবস্থা রয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এসব আমলের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে-

১। ব্যক্তিগত জীবনের বিশুদ্ধি;

২। ব্যক্তি জীবনকে সংঘবদ্ধ জীবনের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী করে তোলা;

ব্যক্তির মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী আসলে ঐ ব্যক্তি নিজের স্বার্থের পাশাপাশি অপরের স্বার্থকে বড় করে দেখবে। কারোর মধ্যে শোষণের মনোবৃত্তি থাকবে না, নিজের প্রয়োজন মিটানোর পর উদ্বৃতাংশ অপরকে দান করার মনোবৃত্তি জাগ্রত হবে। এ গুণগুলো সাহাবীদের মধ্যে ছিল বিধায় তাঁরা শান্তি সহকারে বসবাস করেছেন। কারো সাথে কোন রকম মারামারি হানাহানির ঘটনা ঘটেনি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা:) সবচেয়ে ধনী সাহাবী ছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত আলী (রা:) এবং আবু জর গিফারী (রা:) অনেক গরীব সাহাবী ছিলেন। কিন্তু হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা:)এর জীবনযাত্রার মান উক্ত দুই জনের জীবন যাত্রার মান অপেক্ষা উন্নত ছিল না। তিনি প্রচুর ধন সম্পদের মালিক (অধিকারী) ছিলেন কিন্তু তিনি এগুলো পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যবহার না করে, মানুষের কল্যাণের জন্য সঞ্চয় করেছিলেন। মহামারী ও দুর্ভিক্ষের সময়য় ও ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি তাঁর সম্পদ অকাতরে দান করতেন।

তাই বলা যায় ইসলাম মানুষের জীবন যাপনের জন্য যে নীতিমালা বাতলিয়েছে, সে নীতি অনুসারে জীবন-যাপন করলে কোন অবস্থায়ই মানুষের হাতে অতিরিক্ত পূঁজি সঞ্চিত হতে পারে না। পূর্বের অধ্যায়ে উল্লিখিত যাকাত ছাড়াও আরও অনেক দান করতে হয় যেমন- যাবিল কুরবা (নিকট আত্মীয়) ইয়াতিমা, মাসাকিনা (নি:স্ব) ও ইবনে সাবিল (অসহায় পথিক) অর্থাৎ নিকট আত্মীয়, পিতৃ-মাতৃহীন ছেলেমেয়ে, বিত্তহারা ও সহায়-সম্বলহীন পথিকের অধিকার

রয়েছে ধনীর মালের উপর। আল কুরআনেও তাদের প্রাপ্য প্রদান করার জন্য জোর তাগিদ রয়েছে।

উপরোক্ত নিয়ম কানুন থাকা সত্ত্বেও যদি অযথা কারো মধ্যে মাল সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় এবং মাল সঞ্চয় করে, সেই ক্ষেত্রে খলিফা ধনীদেরকে গরিবদের প্রতি দায়িত্ব পালনে বাধ্য করতে পারেন। কাজেই উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন তা শুধু ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কেন বরং পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রে যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে কেউ কারো দ্বারা শোষিত, বঞ্চিত ও প্রতারিত হবে না। রাষ্ট্রের মধ্যে কোন রকম মারামারি হানাহানি এবং এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের অধিকার প্রশ্নে কোন রকম যুদ্ধ বিগ্রহ এবং দ্বন্দ্ব থাকবে না। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হবে। সারা পৃথিবী শান্তিতে ভরপুর হয়ে উঠবে। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সারা জীবন কাজ করে গেছেন।

আমার অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ধর্মীয় চিন্তাধারার ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা করেছি। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বহু প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর মধ্যে প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি একজন বড় মাপের জীবন ঘনিষ্ঠ দার্শনিক, মানবতাবাদী রাজনীতিবিদ, উচুস্তরের সূফী সাধক এবং বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ছিলেন।

তিনি মানুষ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে গিয়ে উপলব্ধি করেন যে, মানব জীবনের জন্য ধর্ম অপরিহার্য। মানুষের জীবনে ধর্ম না থাকলে মানুষ ও পশুর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য থাকে না। ধর্ম ছাড়া মানুষের জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না। তাই সৃষ্টিকর্তা আগে মানুষ পাঠিয়েছেন এবং মানুষের জীবন সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নবী রাসূলদের মাধ্যমে ধর্মকে

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন। তাই মানুষ যদি তার জীবনে ধর্মকে ধারন করে তাহলে সে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হবে, আর ধারন না করলে সে অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে। তাই দেওয়ান আজরফের ধারণা ধর্ম মানব প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর ধর্মীয় চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মকেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম বা জীবন বিধান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এর কারণ প্রত্যাদিষ্ট যতগুলো ধর্ম আছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ও পূর্ণতম সংস্করণের ধারক ও বাহক হিসেবে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর শিক্ষায় গতিশীলতা ও বাস্তব জীবনাদর্শ হিসেবে ইসলাম আত্মপ্রকাশ করেছে। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মতে, ইসলামকে শুধুমাত্র বলা যায় দ্বীন। অন্য কোন প্রতিশব্দ দিয়ে ইসলামের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না; কারণ ইসলাম অন্য ধর্মের মত কতগুলো আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম মাত্র নয়। ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এটি ইহা এমন এক দ্বীন যার মধ্যে রয়েছে প্রত্যয় (Faith), একটা জীবন পদ্ধতি (Social organasation), অর্থনৈতিক মতবাদ (Economic order), রাজনৈতিক মতবাদ (Political creed) এবং জীবনাদর্শ (Ideal of life) সহজ কথায়, মানব জীবন যাপন করতে হলে যে সব সমস্যা বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তার সমাধান বা ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুস্থ ও সফল জীবন-যাপন পদ্ধতির রূপরেখা এর মধ্যে রয়েছে।

দেওয়ান আজরফ এর মতে, আমরা যারা ইসলাম ধর্মানুসারী আমাদের মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নিতে হবে যে আল্লাহ এক। তিনি সৎপথ প্রদর্শক ও ন্যায় বিচারক। আমরা যদি এটা বিশ্বাস না করে আল্লাহর একাধিক অস্তিত্বকে স্বীকার করি এবং এটা মনে করি যে আল্লাহ তাঁর অধিকার মানুষের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন, তাহলে মানুষের মধ্যে দুনিয়া ভোগের অধিকার নিয়ে মারামারি-কাটাকাটি শুরু হবে। তাছাড়া আমরা যদি পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে

Dhaka University Institutional Repository

দেখব আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী দু'পক্ষের মধ্যে বিশেষ অধিকার নিয়ে মারামারি-কাটাকাটি ও সংঘর্ষের বহু প্রমাণ পৃথিবীতে রয়েছে।

দেওয়ান আজরফের মতে, ইসলাম তাই আল্লাহকে কেবল স্রষ্টা, পালনকর্তা, বিবর্তনকারী রূপে মেনে নেয়নি বরং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে পৃথিবীর বুকে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকে না এবং একে অপরকে সমান মনে করে। তখন দুনিয়ার বুকে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যের সঙ্গে মারামারি-কাটাকাটির কোন কারণ থাকে না। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ যুক্তি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং অভিজ্ঞতা ও স্বজ্ঞার সাহায্য নিয়ে, ঐশী জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে ইসলামের এই ব্যাপক ও কল্যাণধর্মী রূপ উদ্ভাবন করেন এবং সমকালীন মানুষের সামনে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে তা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। তাঁর রচিত বিপ্লবী গ্রন্থ 'জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম' নামক পুস্তকে তা লক্ষণীয়।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বিশ্বাস করেন যে, কেবল বিমূর্ত তত্ত্বালোচনা করা বা উচ্চাঙ্গের নৈতিক আধ্যাত্মিক উদাহরণের মাধ্যমেই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এজন্য দরকার রক্ত মাংসের মানুষের, যাঁরা নিজেদের জীবনে এ আদর্শ বাস্তবায়ন করবেন। ইসলাম ধর্মের আদর্শকে যাঁরা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করেন, তাঁদের বলা হয় মুসলমান। অনেক মুসলমান এক ধরণের হতাশায় ভোগে, তারা ভাবে যে, রাসূল (সা:) ও খুলাফায়-ই-রাশেদীনের পর এমন সব মানুষ আর পাওয়া যাবে না অর্থাৎ তাঁদের মতো ধর্মীয় জীবন যাপন সম্ভব নয়। দেওয়ান আজরফ তাদের এ ধরনের চিন্তা ধারাকে সঠিক মনে করেন না। তিনি বিভিন্ন যুগের ইসলামি কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ইসলামের মধ্যে এমন শক্তি রয়েছে যা, যে কোন যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে ও চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম শুরু থেকেই মানব জীবনকে দেখেছে পূর্ণাঙ্গরূপে। সে জন্য প্রবৃত্তি বা জ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে তারতম্য করলেও কোনটিকে অস্বীকার করেনি। মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশের পথ সুগম করার জন্য এ জীবন দর্শনে মানব জীবনের বৈচিত্র্য পূর্বেই স্বীকৃত হয়েছে। এখানে জগতের ও মানুষের পূর্ণ পরিচয় লাভের জন্য জ্ঞানের সবগুলো পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে যাতে মানব প্রবৃত্তিগুলো কিভাবে একে অপরের সাথে সংঘর্ষ পরিহার করে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে। এ সমস্যার সমাধান হয় মানুষের বিচার বুদ্ধির দ্বারা। বিভিন্ন ব্যক্তির নানাবিধ সমন্ধের ভিত্তিতে গড়ে উঠে মানুষের সমাজ। সমাজের পূর্ণ পরিণতিই রাষ্ট্র। তাই মানুষের বিকাশ যাতে সব ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়, সেজন্য মানুষের সন্তোষ বিধান এমনভাবে করা দরকার যাতে তাদের কোন একটির অতিরিক্ত সন্তোষ বিধানের ফলে মানব জীবনে নৈরাজ্য দেখা না দেয়। তার প্রবৃত্তির সন্তোষ বিধানের ক্ষেত্রে বিচার বুদ্ধির কার্যকারিতা হয়ে পড়ে অনিবার্য।

দেওয়ান আজরফের মতে, ধর্ম বলতে সাধারণত: প্রত্যাদেশ সমৃদ্ধ মানব প্রেমী ধর্মসমূহকেই নির্দেশ করে। ধর্মের সব বিধিবিধান এবং আচার অনুষ্ঠানেও মানুষের কল্যাণের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। বাস্তবে মানুষের মুক্তির পথ প্রদর্শনে নিবেদিত ধর্মকেই দেওয়ান আজরফ গ্রহণ করেছেন, ফলে সব নবী রাসূল, সাধু আল্লাহর প্রতিনিধি, সবাই আল্লাহর বার্তাবাহক ও প্রেরিত পথের দিশারী। তাঁদের প্রচারিত ধর্ম কেবল আল্লাহর একত্ব প্রকাশ কিংবা অন্য কোন উপাসনায় সীমাবদ্ধ নয় বরং নিয়োজিত মানুষের জন্য এক উন্নতর ব্যবস্থা নির্মাণে। তাই বলা হয় ধর্ম মানুষের জন্য, ধর্মের জন্য মানুষ নয়। ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষের স্বরূপ সম্পর্কে দেওয়ান আজরফ বেশ জোরালো ও তাৎপর্যপূর্ণ মত পেশ করেন। তাঁর মতে, আল্লাহ মানুষকে এ ধরায় পাঠিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে এবং মানুষকে দায়িত্ব অর্পণ করছেন তাঁর সৃষ্টিকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্য। মানবসত্তা হচ্ছে ক্রমবিকাশমান, ফলে ক্রম উন্নতির মাধ্যমেই মানুষ অগ্রসর হতে পারে পরমসত্তার (ঐশী) দিকে। এভাবে গভীর থেকে গভীরতম ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অর্জনের প্রয়াস মানুষের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাণীকুলের মধ্যে মানুষই

Dhaka University Institutional Repository

সকলের শীর্ষে। তাই মানুষই অর্জন করেছে সর্বাধিক স্বাতন্ত্র্য এবং মানুষই কেবল তার আপন বাস্তবতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতনতা অর্জন করতে পেরেছে।

আজরফ মনে করেন, ধর্ম মানুষের কল্যাণের জন্য এসেছে। ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়া মানুষ প্রকৃত বা পরিপূর্ণ মানুষ (ইনসান-ই-কামিল) হতে পারে না। কিন্তু এই ধর্মের দ্বারাই আবার যুগে যুগে মানুষ শোষিত, বঞ্চিত ও প্রতারিত হয়েছে। তবে তিনি মনে করেন, ধর্মের নামে শোষণ ও প্রতারণার এর জন্য প্রকৃত ধর্ম বা ধর্মীয় ব্যক্তিরা দায়ী নয় বরং এর জন্য দায়ী ধর্মের মুখোশ পরা স্বার্থান্বেষী মহল, যারা ধর্মের নামে ব্যবসা করে মানুষকে প্রতারিত করে। তাই ধর্মের ব্যাপারে আমাদের সচেতন থাকা উচিত। তাঁর মতে, ধর্মের এই শোষণ, বঞ্চনা ও প্রতারণার বিরুদ্ধে যুগে যুগে প্রতিটি ধর্মের সত্যিকার বীরেরা সংগ্রাম করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন হযরত আবুজর গিফারী (রা:)। তিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে শোষণ-মুক্তির লক্ষ্যে একজন নিবেদিত প্রাণ বীর সৈনিক। আর এ বীর সৈনিকের জীবনের আদর্শ দেওয়ান আজরফ তাঁর বাস্তবজীবনে প্রতিফলনের চেষ্টা করেছিলেন। তাই তিনি সারাজীবন কী করলে সত্যিকারে মানুষের মধ্যে সুখ-শান্তি কল্যাণ ফিরে আসবে, মানুষ পরিপূর্ণ মানুষ (ইনসান-ই-কামিল) হতে পারবে এই চেষ্টা করে গেছেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মতে, ইসলামই হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই ধর্মের মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। তাছাড়া এখানে মানুষের জীবন সুষ্ঠু, সুন্দর, সুখ- শান্তি ও সমৃদ্ধি সহকারে পরিচালনারর জন্য যাবতীয় নিয়ম-কানুন রয়েছে। তিনি তাঁর 'জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম', 'জীবন দর্শনের পূর্ণগঠন', ইসলামি আন্দোলন যুগে যুগে', 'Islamic Movement', 'ইতিহাসে উপেক্ষিত একটি চরিত্র', 'সত্যের সৈনিক আবুজর', 'Abu Dhar Gifari', দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম',

‘সন্ধানী দৃষ্টিতে ইসলাম’, ‘মনীষার আলোকে ইসলাম’, ‘ইসলাম ও মানবতাবাদ’ এবং ‘ধর্ম ও দর্শন’ ইত্যাদি গ্রন্থসমূহে ইসলামের প্রকৃত রূপটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

দেওয়ান আজরফ ইসলামের আদি যুগে হযরত মুহাম্মাদ (সা:) মদীনা সনদের আলোকে যে রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন এবং সে রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের অধিকার কিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিলো, নারীদের অধিকার কিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিলো তা দেখিয়েছেন ইসলামি রাষ্ট্রে কারো হাতে জীবন ধারণের অপরিহার্য সম্পদ ব্যতীত কোন সম্পদ জমা হতে পারবে না, এ সম্পর্কিত আইন, জমিজমা ভোগ দখলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি ভোগ দখল করা যাবে না সে সম্পর্কে তথা ভূমিনীতি, উৎপাদন বন্টন ও সম্পদের মালিকানা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া ইসলাম ধর্মে অর্থের উৎসসমূহ তথা বায়তুল মাল থেকে সম্পদ কিভাবে ব্যয় করা হবে ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়াও তিনি অনেক সুক্ষ্ম কিছু বিষয় যেমন- যাকাত ছাড়াও আরও কিছু দান ধনবান ব্যক্তিদের করতে হয় যেমন- নিকট আত্মীয়দের, পিতৃ-মাতৃহীন ছেলে-মেয়েদের, বিত্তহারা অসহায় ও সম্বলহীন পথিকদের ধনবান ব্যক্তির মালের উপর অধিকার রয়েছে এসব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

কাজেই, আজরফের মতে, ইসলাম একটি সুমহান ধর্ম। এর যে নিয়মনীতি রয়েছে এগুলো মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত হলে, মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে কোন রকম দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ, মারামারি-হানাহানি, শোষণ বঞ্চনা নিপীড়ন কিছু থাকবে না। ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে যেমন এক মানুষের সাথে অপর মানুষের সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে, তেমনি রাষ্ট্রীয় জীবনেও পৃথিবীর এক রাষ্ট্রের সাথে অপর রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য গঠন করা সম্ভব হবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বা বিশ্বসমাজ গঠন করা সম্ভব হবে।
এ সম্পর্কে ইসলামি চিন্তাবিদ ছাড়াও অন্যান্য চিন্তাবিদগণও অভিমত প্রকাশ করেছেন। দেওয়ান আজরফ তাঁর জীবন দর্শনের পুনর্গঠন- বই-এ তিন জন ব্যক্তির বক্তব্য তুলে ধরেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

যেমন- মিষ্টার জিব তাঁর 'Whither Islam' নামক পুস্তকে মন্তব্য করেন, ইসলামের মধ্যে এখনও আপাতত পরস্পর বিরোধী জাতীয় ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধনের শক্তি রয়েছে। যদি প্রাচ্য-প্রতিচ্যের প্রধান সমাজগুলো বিরোধিতার স্থলে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে ইসলামের মধ্যবর্তিতা অনিবার্য ।

তেমনি অধ্যাপক Snouck Hurgrowje তাঁর 'The Muslim world of Today' পুস্তকে বলেছেন:

> মানব জাতির জন্য একটি আদর্শ লীগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইসলামই অন্যান্য ধর্মের চেয়ে অধিকতর অগ্রসর হয়েছে। কেননা মুহাম্মদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত মানবজাতির লীগের মৌলিক নীতি হচ্ছে দুনিয়ার সকল মানুষের ঐক্যের নীতির স্বীকৃতি। এ নীতি এক্ষেত্রে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তাতে লজ্জিত হয়।

বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান তাঁর 'East and West-Religion' গ্রন্থে বলেছেন- 'আমরা একথা অস্বীকার করতে পারিনি যে, ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধের যে ধারণা রয়েছে তাতে জাতি ও জাতীয়তার সকল প্রতিবন্ধকতা উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য কোন ধর্মে এ গুণটি নেই। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত বিভিন্ন জাতি ও ভৌগলিক পরিবেশে গঠিত জাতীয়তার সংকীর্ণ পরিসর থেকে ইসলামের মাধ্যমেই মানুষ ভ্রাতৃত্ববোধের একতা সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে। [১]

---

[১] প্রাগুক্ত, জীবন দর্শনের পূর্নগঠন, পৃ. ৪০

বিশ্ব সমাজ বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব গঠন সম্পর্কে মুসলিম চিন্তাবিদদের মত উল্লেখ করতে গিয়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন:

> মরহুম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী এ বিষয়ে অন্যদিক থেকে মুসলিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। মানব জীবন সম্বন্ধে বর্তমান কালে যে সব আবিষষ্কার হয়েছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে যে জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে তার ভিত্তি ইসলামি জীবন দর্শন হওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। মরহুম মাওলানা উবায়েদ উল্লাহ সিন্ধীও এই মত পোষণ করতেন। কাজেই মুসলিমদের নানা যুগের ভুল-ভ্রান্তি এবং তৎকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা পোষণ করার সঙ্গত কারণ রয়েছে।[২]

এ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন:

> একথা সর্বজনবিদিত যে, মুসলিম সমাজের গৃহবিরোধ ও আত্মকলহের উদাহরণ কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করছে। হযরত উমর ফারুক, হযরত উসমান গনী, হযরত আলী, হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের শাহাদাত বরণ বিশ্ববাসীর কাছে মুসলিম সমাজকে অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন করেছে। উমাইয়া বংশের তথাকথিত খলিফাদের অনাচার এবং আরববাসীদের পাশবিক প্রতিশোধমূলক কার্যকলাপ মুসলিম চরিত্রের কলঙ্ক। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়, মুসলিম সমাজ জীবনে এ অত্যাচার দেখা দিয়েছে ব্যক্তিগত বা বংশগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দুরভিসন্ধির ফলে। বর্ণ ও রক্তের যে প্রতিষ্ঠা ধ্বংস করার জন্য এ জগতে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিলো, সে বর্ণ ও রক্তের পুতুলগুলোর পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম সমাজে আত্ম কলহ দেখা দিয়েছিলো।

[২] দেওয়ার মোহাম্মদ আজরফ, ইসলাম ও মুসলিম; মাসিক মোহাম্মদী, ঢাকা, ৩৩ বর্ষ; ১১ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬৯, পৃ.৭৯

Dhaka University Institutional Repository

তবে সে কোন্দল- কোলাহলের পটভূমিতে ছিল ইসলামের মৌলিক নীতি কার্যকরী। এজন্য এ দুনিয়ার মুসলিমদের মধ্যে তো বটেই, সকল মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টিতে ইসলাম সকল যুগে প্রেরণা দান করেছে, এ জন্যই মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আলী সত্যই মন্তব্য করেছিলেন ''ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যয় হর কারবালাকে বাদ"- ইসলাম প্রত্যেক কারবালার পরেই জিন্দা হয়। অর্থাৎ ইসলাম পরিপন্থী ভাবধারার সংঘর্ষের ফলে মুসলিম সমাজে আবার সত্যিকার ইসলামের প্রভাব দেখা দেয়।[৩]

সুতরাং মুসলমানদের আত্মকলহ ও পরস্পরবিরোধী ক্রিয়াকলাপ ইসলাম নির্দেশিত আচরণ নয়, একথা ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

কাজেই দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের সামগ্রিক চিন্তা- ভাবনা বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করলে আমরা তা থেকে যে দিক নির্দেশনা পাই সেগুলো ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়িত হলে মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত শোষন ও দুর্নীতি দূরীভূত হবে, সমাজে সুখ-শান্তি ,সমৃদ্ধি ও সাম্য কায়েম হবে। ফলে মানুষ সুন্দর ভাবে জীবন যাপন করতে পারবে।

---

[৩] প্রাগুক্ত, জীবন দর্শনের পূর্নগঠন, পৃ.৪১

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থাবলি-ক

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ কর্তৃক লিখিত গ্রন্থাবলি

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ,	:	**জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম**, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯১
----------------	:	**ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে**, ১ম প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল, ১৯৮০
----------------	:	**জীবন দর্শনের পুণর্গঠন**, চট্রগ্রাম: ১ম প্রকাশ, ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, আগস্ট, ১৯৮০
----------------	:	**দর্শনের নানা প্রসঙ্গ**, ১ম প্রকাশ, ঢাকা: মুক্ত ধারা, জুলাই, ১৯৭৭
----------------	:	**অতীত জীবনের স্মৃতি**, ১ম প্রকাশ, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, জুন, ১৯৮৭
----------------	:	**সোনা ঝরা দিনগুলি**, ১ম প্রকাশ, ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ২০০৪
----------------	:	**জীবন নদীর শেষ বাঁকে**, ২য় সংস্করণ, ঢাকা: উৎস প্রকাশন, আগস্ট, ২০১৪
----------------	:	**কবির দর্শন**, ৩য় প্রকাশ, ঢাকা: জিনিয়াস পাবলিকেশন্স, ২০১৪
----------------	:	**ব্যক্তিত্বের বিকাশ**, ২য় সংস্করণ, ঢাকা: ঝিনুক প্রকাশনী, ২০১৩
----------------	:	**নয়া জিন্দেগী**, ১ম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, আগস্ট,১৯৮৭ ইং
----------------	:	**সিলেটে ইসলাম**, ১ম প্রকাশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯৫ ইং
----------------	:	**ভাববাদ যুগে যুগে**, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: হিমি বুকস এন্ড বুকস, মার্চ, ২০০৪
----------------	:	**নির্বাচিত প্রবন্ধ**, ১ম প্রকাশ, ঢাকা: গাউছিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, সেপ্টেম্বর ২০০৪, সংস্করণ ২০১৪
----------------	:	**ইসলাম ও মানবতাবাদ**, ঢাকা: ইসলামীক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ
----------------	:	**ধর্ম ও দর্শন**, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, ঢাকা, বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

		একাডেমী, ১৯৮৫
----------------		**ইসলাম: মণীষার আলোকে,** ঢাকা: ইসলামীক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০
----------------		**মরমি কবি হাসন রাজা,** ১ম প্রকাশ, ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী, ২০১০
----------------	:	**বিশ্ব সভ্যতায় আল্লামা ইকবালের অবদান,** ১ম প্রকাশ, ঢাকা: আল্লামা ইকবাল সংসদ,
----------------	:	**নতুন সূর্য:** প্রথম প্রকাশ, চট্টগ্রাম: ১৯৯৬, ২য় সংস্করণ ২০১১। বাংলাদেশ কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড।
----------------	:	**হাছন রাজা (নাটিকা),** ঢাকা: গাউছিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৪
----------------	:	**Islamic Movement,** Tamuddun Majlise, Dacca: 1955
----------------	:	**Philosphy and Relegion**, Dhaka: Islamic Foundation, 1981

গ্রন্থাবলি-খ

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের উপর লিখিত বা তাঁর দর্শনের সাথে সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি ও প্রবন্ধাবলি

অধ্যাপক শাহেদ আলী (সম্পাদিত)	:	**দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সম্বর্ধনা গ্রন্থ,** ঢাকা: ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭
সাদিয়া চৌধুরী পরাগ	:	**দোহালিয়া থেকে চুরুলিয়া,** প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: যারা প্রকাশন, ২০১৫
সাদিয়া চৌধুরী পরাগ (সম্পাদিত)	:	**প্রাচ্য প্রভা দেওয়ান আজরফ,** ঢাকা: উৎস প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০১৫
এ.জেড এম সামসুল আলম	:	**ইসলামী অর্থনীতির রুপরেখা,** ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৫
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	:	**আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার,** ঢাকা: খায়রুল প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮
ড: আবদুল করিম জায়দান অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	:	**ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা,** ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১১ তম সংস্করণ ২০০৬
এহসান চৌধুরী (সংকলন ও সম্পাদনা)	:	**টলস্টয়ের নীতিগল্প,** দ্বিতীয় মুদ্রন, ঢাকা: ঐশি প্রকাশনী, ১৯৯৪
গোবিন্দ চন্দ্র দেব	:	**তত্ত্ববিদ্যাসার,** ঢাকা: কেন্দ্রিয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬
শরিফ হারুন (সম্পাদিত)	:	**বাংলাদেশে দর্শন: ঐতিহ্য প্রকৃতি অনুসন্ধান,** তিন খন্ড ১ম প্রকাশ বাংলা একাডেমী ঢাকা: ১ম খন্ড ১৯৯৪, ২য় ও ৩য় খন্ড ১৯৯৯
সামারীন দেওয়ান	:	**হাছন রাজার জীবন ও কর্ম,** ১ম প্রকাশ, ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স ঢাকা ২০১৫
ড: আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদিত)	:	**প্রসঙ্গ: হাছন রাজা,** ১ম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮
ড: আমিনুল ইসলাম	:	**বাঙালির দর্শন প্রাচীন কাল থেকে সমকাল,** ১ম প্রকাশ, ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৪
ড: প্রদীপ রায় (অনুবাদ)	:	**বার্ট্রান্ড রাসেল: পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস** (প্রাচীন ও ক্যাথলিক দর্শন নির্বাচিত অংশ), পুনর্মুদ্রণ, ঢাক: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

Abul Hashim	:	**The Creed of Islam or The Revolutionary Character of Kalima,** Fourth edition, Dhaka Islamic Foundation, Bangladesh, 1985
আব্দুল গফুর (সম্পাদনা)	:	**বিপ্লবী উমর,** ইসলামীক ফাউন্ডেশন, ঢাকা: ১৯৮০
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রবন্ধাবলি	:	'ইসলামের সত্যিকার রূপ', মাসিক **মোহাম্মদী,** ২৭ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ঢাকা: ভাদ্র, ১৩৬৩
---------------	:	**মাহে নও,** ১ম বর্ষ, ১২ সংখ্যা ঢাকা: ১৯৬৮
---------------		'দর্শন বিভাগ ও আমার জীবন ভাবনা', **দর্শন বিভাগের ৭৫ বছর স্মারক গ্রন্থ,** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯
---------------	:	'ধর্ম জগতে বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ', **দর্শন,** ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা: জুন ১৯৮৩
---------------	:	'সভাপতির ভাষণ', **বাংলাদেশ দর্শন সমিতি,** অষ্টম সাধারণ সম্মেলন, ১৯৯০
---------------	:	'বাংলাদেশ দর্শন' **কার্যবিবরণী,** বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, ষষ্ঠ সাধারণ সম্মেলন, ঢাকা: ১৯৮৬
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, বাণী	:	জাতীয় অধ্যাপক ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, **জাতীয় দর্শন সেমিনার,** বিএম কলেজ বরিশাল, ১ম প্রকাশ ১৯৯৬
মুকুল চৌধুরী, (সাক্ষাৎকার)	:	'দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের বিশেষ সাক্ষাৎকার', রাগীব রাবেয়া সাহিত্য পুরস্কার, **স্মারক গ্রন্থ,** ঢাকা: প্রকাশকাল, ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯
হাসান শাহরিয়ার	:	'দেওয়ার আজরফ: একটি নক্ষত্রের পতন', **দৈনিক ইত্তেফাক,** ঢাকা: ৫ নভেম্বর ১৯৯৯
আতিকুর রহমান নগরী	:	'অমুসলিমদের অধিকার', **দৈনিক নয়া নিগন্ত,** ঢাকা: শুক্রবার ৬ মার্চ ২০১৫
সৈয়দ আলী আহসান	:	'দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ একজন পরিছন্ন মানুষ', **দৈনিক ইনকিলাব,** ঢাকা: ১২ নভেম্বর, ১৯৯৯
আরশাদ আজিজ	:	'দর্শনের গল্প', ঢাকা: **বাংলাদেশ শিশু একাডেমী,** জানুয়ারী ১৯৮৩
কাজী নুরুল ইসলাম	:	'দেশের বাইরে আজরফ স্যারকে যেভাবে দেখেছি', **দৈনিক ইত্তেফাক** ঢাকা: ৫ নভেম্বর, ১৯৯৯

অধ্যাপক শাহেদ আলী	:	'সবার শ্রদ্ধেয় দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের তিরোধানে', **দৈনিক ইনকিলাব,** ঢাকা: ১২ নভেম্বর, ১৯৯৯
অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান	:	'দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ-কিছু কথা', **ঐতিহ্য,** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১ম বর্ষ, ৭-৯ সংখ্যা
	:	**আল-ইস্‌লাহ্‌,** ৬০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, প্রকাশকাল সিলেট, জুলাই, ১৯৯৬
ফাহমিদ-উর-রহমান	:	'ইকবাল মননে অন্বেষণে', প্রকাশ ঢাকা: **আল্লামা ইকবাল** সংসদ, ১৯৯৫

সমাপ্ত